ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

Recommended as a Text-book by the Calcutta and Patna Universities and the Board of Intermediate and Secondary Education, Dacca, for Matriculation Examination,

AND

Approved by the Director of Public Instruction as a Text-book for Higher Classes of H. E. Schools in Assam.

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত।]

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ., পি-এইচ্. ডি.

প্রণীত

১৯৩৭

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
পাটুয়াটুলী, ঢাকা

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

B23898

প্রিণ্টার
শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র সুর
আশুতোষ প্রেস, ঢাকা

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রয়োজনীয় ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মূল ঐতিহাসিক উপকরণের সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখগুলি যথাযথভাবে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থ নির্ভুল ও শিক্ষার্থিগণের উপযোগী করিতে যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটি করি নাই। তথাপি ইহা যে একেবারে নির্ভুল হইয়াছে, এরূপ আশা করিতে পারি না। শিক্ষকগণ কোন ভ্রম-প্রমাদ দেখিলে সে বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

এই গ্রন্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত নূতন বানানের নিয়ম অনুসরণ করিয়াছি।

রমনা, ঢাকা
বৈশাখ, ১৩৪৪

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

হিন্দু যুগ

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	দেশের কথা	১
২।	ভারতবাসী	১১
৩।	আর্য-সভ্যতা	১৬
৪।	বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম	২৫
৫।	রাজনৈতিক ইতিহাস (আনুমানিক ৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে ৩২১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত) ...	৩২
৬।	মৌর্য-সাম্রাজ্য (আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব ৩২১ অব্দ হইতে খৃষ্ট-পূর্ব ১৮৪ অব্দ পর্যন্ত) ...	৩৯
৭।	মৌর্য-বংশের পতনের পরে ভারতবর্ষের অবস্থা (খৃষ্ট-পূর্ব ১৮৪—খৃষ্টাব্দ ৩১৯) ...	৪৯
৮।	গুপ্ত-সাম্রাজ্য (৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দ)	৫৭
৯।	গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতবর্ষের অবস্থা (খৃঃ ৫০০—৭৫০)	৬৩
১০।	সাম্রাজ্যের জন্য দ্বন্দ্ব—রাষ্ট্রকূট, পাল এবং গুর্জর-প্রতীহার বংশ (৭৫০ হইতে—৯৫০ খৃষ্টাব্দ) ...	৭৭
১১।	সুলতান মামুদ	৮৩
১২।	হিন্দু স্বাধীনতার শেষযুগ	৯০
১৩।	পৌরাণিক যুগে হিন্দু সভ্যতা ...	১০১

দ্বিতীয় খণ্ড

মুসলমান আমল

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	দাস রাজবংশ	১১০
২।	খিল্‌জী বংশ	১২২
৩।	তুঘ্‌লক বংশ	১৩১
৪।	দিল্লীর সুলতানগণের পতনের পর ভারতবর্ষের অবস্থা	১৩৯
৫।	প্রথম মুসলমান যুগে ভারতবর্ষ ...	১৫৮
৬।	মুঘল পাঠান দ্বন্দ্ব	১৬৭
৭।	মুঘল সাম্রাজ্য	১৮৫
৮।	ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইতে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত	২৩৮
৯।	মুঘল যুগে ভারতবর্ষ	২৫৪

তৃতীয় খণ্ড

ইংরাজ আমল

১।	ভারতে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ—ইংরাজ ও ফরাসির দ্বন্দ্ব	২৬০
২।	বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়	২৬৯
৩।	বঙ্গে ও মাদ্রাজে ইংরাজের প্রতিষ্ঠালাভ ...	২৭৩
৪।	ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌	২৮১
৫।	বৃটিশ রাজ্যের বিস্তৃতি (কর্ণওআলিস্‌ হইতে বার্লো পর্যন্ত)	৩০০
৬।	বৃটিশ সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন (মিণ্টো হইতে সার্‌ চার্লস্‌ মেট্‌কাফ্‌ পর্যন্ত)	৩১৭
৭।	বৃটিশ বিজয়ের পরিপূর্ণতা (অক্‌ল্যাণ্ড হইতে ডালহৌসী পর্যন্ত)	৩৩০
৮।	বৃটিশ সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষ ...	৩৪৮
৯।	১৯৩৫ সনের নূতন ভারত শাসন বিধি ...	৩৮২
১০।	উপসংহার	৩৮৭
	পরিশিষ্ট	৩৯৫

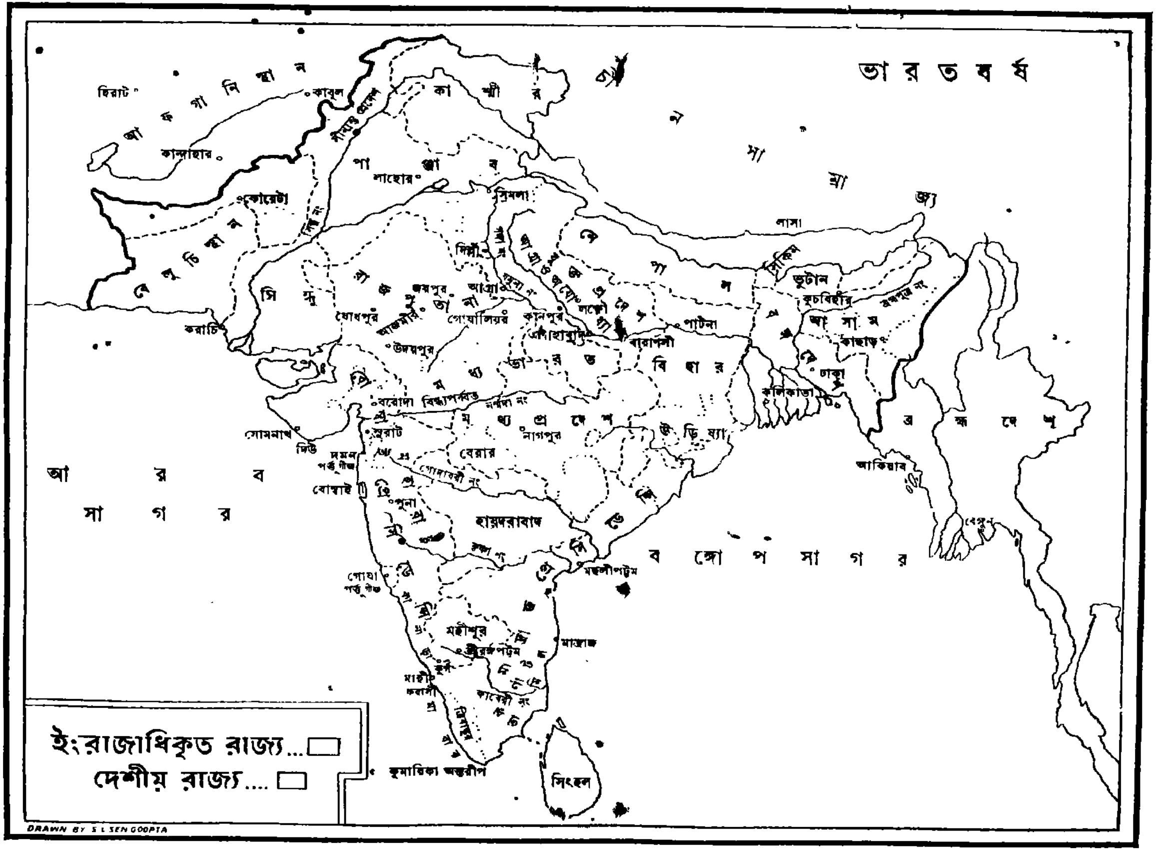
ভারতবর্ষ
ইংরাজাধিকৃত রাজ্য....
দেশীয় রাজ্য....
DRAWN BY S L SEN GOOPTA
আফগানিস্থান
হিরাট
কাবুল
কান্দাহার
কাশ্মীর
পাঞ্জাব
লাহোর
কোয়েটা
বেলুচিস্থান
সিন্ধু
করাচি
রাজপুতানা
জয়পুর
আগ্রা
যোধপুর
আজমীর
গোয়ালিয়র
উদয়পুর
দিল্লী
সিমলা
কানপুর
লক্ষ্ণৌ
এলাহাবাদ
বারাণসী
পাটনা
নেপাল
লাসা
ভুটান
কুচবিহার
আসাম
কাছাড়
ঢাকা
কলিকাতা
বিহার
মধ্য ভারত
মধ্য প্রদেশ
নাগপুর
বরোদা
সুরাট
সোমনাথ
দিউ
বেরার
বোম্বাই
পুনা
হায়দরাবাদ
উড়িষ্যা
মসলীপট্টম
মহীশূর
মাদ্রাজ
শ্রীরঙ্গপট্টম
কাবেরী নং
কুমারিকা অন্তরীপ
সিংহল
আকিয়াব
ব্রহ্মদেশ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

হিন্দু যুগ

প্রথম অধ্যায়

দেশের কথা

কবি গাহিয়াছেন, জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদে অতুলনীয়, শত শত মুনি, ঋষি, বীর ও কবির লীলা-নিকেতন আমাদের এই জন্মভূমির কাহিনী আজ তোমাদিগকে বলিব, শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর।

আমরা আমাদের জন্মভূমিকে বলি **ভারতবর্ষ,** ইউরোপীয়েরা বলেন **ইণ্ডিয়া।** ভারতবর্ষের পশ্চিমে যে বিশাল সিন্ধুনদ আছে, পারসিকেরা তাহার উচ্চারণ করিতেন 'হিন্দু'। ইহা হইতেই জাতিবাচক 'হিন্দু' ও দেশবাচক 'ইণ্ডিয়া' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

মহাদেশ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ একটি বিস্তীর্ণ দেশ। পৃথিবীর অনেক দেশ হইতেই আয়তনে এই দেশ বড়। রাশিয়া দেশ বাদ দিলে ইউরোপ মহাদেশের যতখানি থাকে, ভারতবর্ষ প্রায় তাহার সমান। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ কোটি; ইহাদের মধ্যে কত জাতি, কত ধর্ম, কত ভাষা! ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতই বিভিন্ন! এই দেশে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত হিমালয় বিদ্যমান; আবার সমুদ্র হইতে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উচ্চ বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রেরও এই দেশে অভাব নাই; ইহার একদিকে প্রচুর উর্বরা ভূমি; অন্যদিকে বিশাল মরুভূমি। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক দৃশ্যে এমনি অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সমাবেশ! এই সমস্ত কারণে ভারতবর্ষকে দেশ না বলিয়া, একটি ছোট মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জনসমূহের ও প্রাকৃতিক বিভাগের বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষের সীমা। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র লইয়া ইহার চারিদিকের সীমাগুলি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য কর। উত্তরে সুদীর্ঘ এবং উচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণী কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষা করিতেছে। দক্ষিণে চাহিয়া দেখ, সমুদ্র যেন মাতার মত পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে আমাদের জন্মভূমিকে ক্রোড়ে ধরিয়া আছে। উত্তর-পূর্বে এবং উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়েরই শাখা-পর্বতশ্রেণী সমুদ্র পর্যন্ত নামিয়া ভারতের সীমা গঠন করিয়াছে। এই সকল পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া মাত্র দুই এক স্থানে যাতায়াতের সুগম পথ আছে, তাহাদিগকে গিরিসংকট বা গিরিবর্ত্ম বলে।

প্রাকৃতিক সীমা

তবেই দেখ, প্রকৃতি সযত্নে ভারতের চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়া ভারতকে রক্ষা করিতেছেন, অথচ বহি-

জগতের সহিত ভারতের সমস্ত সম্পর্ক একেবারে রহিত করিয়া দেন নাই; কারণ, উত্তর-পশ্চিমে খাইবার ও বোলান নামক দুইটি গিরিসংকটের মধ্য দিয়া এবং উত্তর-পূর্বের গিরিসংকট ও পূর্বে আরাকান প্রদেশের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। যখন বড বড জাহাজের সৃষ্টি হইয়া সমুদ্রপথ সুগম হয় নাই, তখনও এই সমুদয় গিরিসংকট দিয়া বণিক, ধর্মপ্রচারক, পর্যটক ও সৈন্যদল ভারতবর্ষে আসিত ও ভারতবর্ষ হইতে যাইত।

ভারতের অভ্যন্তর। এইবার একবার ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত কর। চাহিয়া দেখ, মধ্যস্থলে এক দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী পূর্বে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে: ইহার নাম বিন্ধ্যপর্বত। বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরাংশ আর্যাবর্ত নামে বিখ্যাত। দক্ষিণাংশকে সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ বলা হয়। দাক্ষিণাত্য আবার কৃষ্ণা ও তাহার শাখা তুঙ্গভদ্রা নদীকর্তৃক দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিন্ধ্য পর্বত এবং কৃষ্ণা নদীর মধ্যস্থিত দেশের নামই প্রকৃত প্রস্তাবে দাক্ষিণাত্য; তাহার দক্ষিণে ভারতের যে অংশ তাহাকে দক্ষিণ-ভারত বলা হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ-ভারত এই উভয় প্রদেশই উচ্চ মালভূমি, পশ্চিমে সহসা উন্নত হইয়া ধীরে ধীরে পূর্বদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট নামে দুইটি সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী উক্ত মালভূমির পূর্ব ও পশ্চিম সীমা। সমুদ্র এবং এই দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অতিশয় সংকীর্ণ সমভূমি বিদ্যমান আছে।

প্রাকৃতিক বিভাগ

দাক্ষিণাত্য

আর্যাবর্ত। আর্যাবর্তে দুইটি উর্বর সমতল ক্ষেত্র বিদ্যমান; একটি গঙ্গা, যমুনা এবং তাহাদের শাখা নদীগুলির এবং

অপরটি সিন্ধুনদ এবং তাহার শাখাসমূহের জলে পরিপুষ্ট। এই দুইয়ের মধ্যস্থলে রাজপুতানার মরুভূমি। আর্যাবর্তের এই তিনটি স্বাভাবিক বিভাগই উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন হিমালয় প্রদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য দেশগুলি লইয়া একটি এবং বিন্ধ্যের উত্তরে মধ্যভারতের অসমতল গিরিসংকুল প্রদেশ লইয়া আর একটি বিভাগ কল্পিত হইতে পারে।

প্রকৃতির প্রভাব। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা দেশবাসীর ইতিহাস ও স্বভাব গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতে বিস্তৃত উর্বরভূমি আছে। এখানে নানাপ্রকার শস্য ও মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্য অতি সহজে উৎপন্ন হয়। আবার খনিজ সম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ। এই দেশে কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ, মণিমাণিক্য, মুক্তা-হীরকাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারত-সমুদ্রের উপকূলে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বন্দর আছে। ইহাতে জলপথে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা। এই সকল কারণে এককালে ভারতবর্ষ ধনসম্পদে ও ঐশ্বর্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশকে অতিক্রম করিয়াছিল।

ভারতের সমৃদ্ধি

প্রকৃতির এই অপর্যাপ্ত দানে ভারতের ভাগ্যে শুভ ও অশুভ দুই প্রকার ফলই ফলিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য হওয়াতে, ভারতবাসী প্রকৃতির নয়ন-মন-বিমোহন অতুলনীয় সৌন্দর্যে বিভোর হইবার অবসর পাইয়া, কাব্য ও দর্শনের চর্চায় নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছিল, এবং এই জন্যই ভারতে ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন ও সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু এই কারণেই আবার ভারতের জনসাধারণ উত্তরের শীতপ্রধান দেশের পার্বত্য-জাতিসমূহের ন্যায় বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে

নাই; কাজেই ভারতের সমৃদ্ধিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঐ সকল পার্বত্য-জাতি অনায়াসে বার বার ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এদেশের ভূমি ও জলবায়ু সহজ জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল হওয়ায় প্রকৃতির সহিত মানবের সংগ্রাম অন্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে কখনও তীব্র হইয়া উঠে নাই। তাই পদার্থ-বিজ্ঞানের দিকে লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নাই এবং এই বিষয়ের চর্চা ইউরোপের ন্যায় এদেশে তেমন প্রসার লাভ করে নাই।

ভারতবর্ষের আয়তন বিশাল, ইহার পর্বত সমূহ গগনস্পর্শী, ইহার নদীগুলি দৈর্ঘ্যে ও বিস্তৃতিতে অতুলনীয়। এই সকল বাধা থাকায় ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া, এক বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে নাই। অতীত-কালে সমগ্র ভারতবর্ষ অথবা ইহার অধিকাংশ ভাগকে এক রাজশক্তির অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা অনেকবার হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় নাই। বহু আয়াস সহকারে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইত, কালক্রমে তাহা পুনরায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। দেখিতে দেখিতে ভারত বহু ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িত, এবং উহাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের আর অন্ত থাকিত না।

ভারতীয় সভ্যতার মূলগত ঐক্য। ভারতবর্ষের অধিবাসী প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি বিশিষ্ট জাতীয় ঐক্যভাব বিদ্যমান আছে। হিন্দুযুগে আর্যগণের পূর্বে ও পরে বহু জাতি ভারতবর্ষে

স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিল। এখনও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন আছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীর আকৃতি, আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষের হিন্দু অধিবাসীরা কোন একটি বিশিষ্ট জাতি নহে, এবং কেবলমাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমাবেশ মাত্র। কিন্তু এ ধারণা ভুল। ভাষা ভিন্ন হইলেও অধিকাংশ ভাষাই হয় সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অথবা সংস্কৃত ভাষার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইলেও সকলেই হিন্দু অথবা আর্য এই নামে পরিচিত এবং সমস্ত দেশটি ভারতবর্ষ নামে অভিহিত। এই সমগ্র দেশ লইয়া এক রাজ্য স্থাপনের কল্পনা প্রাচীন কাল হইতেই বিদ্যমান এবং সময় সময় বাস্তবেও পরিণত হইয়াছে। বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর সামাজিক নিয়ম প্রণালী এই সমুদয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া সমুদয় ভারতবাসী হিন্দুকে একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত করিয়াছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই বেদ পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পঠিত ও ধর্মের মূলগ্রন্থ স্বরূপে স্বীকৃত হয়। সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর নীতি ও সমাজের আদর্শ গঠন করিয়াছে। বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান প্রাচীন রীতি অনুসারে সম্পন্ন হয় এবং জাতি বিভাগ, ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্রই সমাজের ভিত্তি স্বরূপ গৃহীত হয়। বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দ্বারা হিন্দুর জীবনের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত হয়। দেবদেবীর পূজা ব্রত নিয়ম, এবং প্রাচীন হিন্দুর পারিবারিক প্রথা এখনও সমুদয় ভারতবর্ষে বিদ্যমান।

হিন্দুজাতির ঐক্য

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন মনে হইলেও সমুদয় হিন্দু জাতির মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট ঐক্য আছে তাহা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই। ভারতবর্ষীয় সমুদয় হিন্দুর মধ্যে এই যে ধর্ম ও সমাজের যোগসূত্র ইহাই তাহাদিগের ঐক্য ও জাতীয়তার মূল ভিত্তি। অন্যান্য দেশে যেমন ভাষার ঐক্য অথবা এক রাজ শাসনের অধীনতা হেতু জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষেও তেমনি উপরোক্ত ধর্ম ও সমাজের ঐক্যের উপর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মুসলমান জাতি ঐক্য

মুসলমান যুগে আরব, পারস্য, মঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশ হইতে আগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী বহু জাতি এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছে। এদেশের অনেক লোকও ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু একই ধর্মের ও সামাজিক নীতির প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট জাতীয় ঐক্যভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সর্বত্রই মুসলমানগণের মধ্যে উর্দুভাষার প্রচলন আছে। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান রাজগণ ভারতবর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছেন, এই ঐতিহাসিক স্মৃতিও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়ভাব গঠনের সহায়তা করিয়াছে। ফলে হিন্দুর ন্যায় ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ও একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দু ও মুসলমা[ন] জাতির ঐক্য

হিন্দু ও মুসলমান সাত শত বৎসরের অধিককাল এদেশে একসঙ্গে বসবাস করিয়াছে এবং অল্প অথবা অধিক পরিমাণে পরস্পরের রীতিনীতি আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। অনেক স্থলেই হিন্দু ও মুসলমান একই ভাষা ব্যবহার করেন,

এবং উর্দু ভাষার ব্যাকরণ ও গঠন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে এবং শব্দসমূহ কতক পরিমাণে হিন্দিভাষার তুল্য। ব্রিটিশ যুগে একই রাজার অধীনে বাস করার ফলে, এবং ভবিষ্যতে সম্পদে-বিপদে উভয়েরই অদৃষ্ট একই সূত্রে গ্রথিত—এই অলঙ্ঘণীয় ঐতিহাসিক নীতির প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে হিন্দু ও মুসলমান অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় অধিবাসীর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম জাতীয় ঐক্যভাব বিদ্যমান আছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস—প্রাচীন হিন্দুরা কাব্য নাটক দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি সেরূপ একখানি গ্রন্থও লিখিয়া যান নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী নামে কাশ্মীর দেশের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থ কেবল একটি রাজ্যের ইতিহাস মাত্র—তাহাও হিন্দু যুগের শেষভাগে লিখিত। এই কারণে গ্রীস্, রোম, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় বিস্তৃত বিবরণসহ এদেশের প্রাচীন ইতিহাস লিখিবার উপায় নাই। বহু আয়াস সহকারে পণ্ডিতগণ গত একশত বৎসর যাবৎ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা উপাদান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই সকল উপাদানগুলি মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ প্রাচীন গৃহ, মন্দির, স্তম্ভ, মূর্তি, মুদ্রা, লেখ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে প্রাচীন লেখ—

শিলালিপি, তাম্রলিপি, প্রভৃতি—ইতিহাস রচনার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপকরণ। প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ রাজার নাম ও বিবরণ আমরা এই সমুদয় প্রাচীন লেখ হইতেই জানিতে পারিয়াছি। প্রাচীন মুদ্রা হইতে অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু আর কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন মূর্তি ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে তৎকালের শিল্পের ও সভ্যতার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

২। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য। পুরাণ নামক ধর্ম গ্রন্থাদি ও কোন কোন রাজার জীবন চরিত হইতে রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান্ তথ্য জানা যায়। এতদ্ব্যতীত সমাজ ধর্ম রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা অনেক বিষয় জানিতে পারি।

৩। বৈদেশিক গ্রন্থ। অনেক বিদেশীয় ভ্রমণকারী ভারতে আসিয়াছিলেন এবং এদেশের বিবরণ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গ্রীক্ মেগাস্থিনিস, চীন দেশীয় হিউএনসাং, ফা হিয়ান ও ইৎ সিং এবং আরব দেশীয় আল বেরুণী প্রধান। ইঁহাদের গ্রন্থ হইতে আমরা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারি। বিদেশীয় ইতিহাস ও শিলালেখ হইতেও আমরা অনেক সাহায্য পাই।

এই সমুদয় উপকরণের সাহায্যেই প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস কথঞ্চিৎ উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে। মুসলমান যুগের কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এ যুগের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন যুগের ন্যায় এ যুগের প্রাচীন সৌধ, মুদ্রা, লেখ, সাহিত্য এবং বিদেশীয় ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত

হইতেও আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানিতে পারি। বৃটিশ যুগের সমসাময়িক বহু গ্রন্থ ও দলিল পত্রাদি আছে। সুতরাং এ যুগের ইতিহাস রচনার উপকরণের কোন অভাব নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবাসী

আদিম নিবাসী। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে অনেকগুলি জাতি ভারতের বিভিন্ন অংশে বসবাস করিত। তাহাদের ইতিহাসই ভারতের আদিম ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খবই অল্প।

তবে ভারতের এই আদিমনিবাসীদের সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আদিম অধিবাসীর ন্যায় তাহারাও সর্বপ্রকার সভ্যতাবর্জিত ছিল। অনার্য জাতি

সর্বপ্রাচীন অধিবাসীরা কোন প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিত না, প্রস্তরখণ্ডদ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পশুবধ করিত, এবং এইরূপে তাহাদের আত্মরক্ষা ও জীবিকা-নির্বাহ উভয় কার্যই সম্পন্ন হইত; কৃষিকার্যদ্বারা শস্য উৎপাদন এবং অগ্নির ব্যবহার জানা না থাকায়, নিহত পশুর অসিদ্ধ মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল।

পরবর্তী যুগের অধিবাসীরা তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর আবিষ্কার করিয়া, তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কৃষিকার্য শিক্ষা করিয়া উৎপন্ন শস্য অগ্নিতে রন্ধন করিয়া খাইতে শিখিল, এবং অন্যান্য বিষয়েও তাহারা ক্রমশ সভ্য হইয়া উঠিল।

ভারতের এই সমুদয় অতি প্রাচীন অধিবাসিগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না থাকিলেও, একথা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে

পারে যে, বর্তমানকালের পার্বত্য ও বন্য নাগা, কুকি, খাসি, ভুটিয়া, লেপ্চা, সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা ইত্যাদি জাতি তাহাদেরই বংশধর। ইহাদের মধ্যে কতক মোঙ্গলজাতীয় এবং বর্তমান তিব্বতীয় ও ব্রহ্মদেশবাসিগণের জ্ঞাতি; ইহারা উত্তর ও উত্তর-পূর্ব গিরিসঙ্কটগুলি দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। অবশিষ্ট জাতিগুলি কাম্বোজ, মলয় উপদ্বীপ, এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহের অধিবাসীবর্গের জ্ঞাতি,—তাহারা সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পূর্বদিক হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল।

দ্রাবিড় জাতি। এই সকল জাতির পর ভারতে যে জাতি আগমন করিল, তাহা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। বর্তমানকালে প্রচলিত দক্ষিণ-ভারতের তামিল, তেলেগু, কাণাড়ী এবং অন্যান্য ভাষা দ্রাবিড়দেরই ভাষা। দ্রাবিড় সভ্যতা বিশেষ উন্নত ছিল। দ্রাবিড়গণ দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে জানিত এবং নদী ও সাগর পার হইয়া দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। তাহাদের ভাষা, সাহিত্য এবং ধর্ম উন্নত সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে। বর্তমানে পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এই যে, দ্রাবিড়গণ প্রথমে পশ্চিম-এশিয়ার অধিবাসী ছিল, এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।

মহেঞ্জোদাড়োর প্রাচীন সভ্যতা

সম্প্রতি সিন্ধুদেশের অন্তর্গত মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে ও নিকটবর্তী প্রদেশে এক প্রাচীন সভ্য জাতির বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা দ্রাবিড় জাতি, কিন্তু একথা কতদূর সত্য বলা যায় না। এই জাতি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও বড় বড় অট্টালিকাপূর্ণ নগরীতে বাস করিত। এই সমুদয় নগরীতে বিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথ, সাধারণ স্নানাগার,

পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি ছিল। বস্তুত তাহাদের জীবনযাত্রায় প্রচুর ভোগ ও বিলাসের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি ব্যবহার করিত, কিন্তু লৌহ ধাতু তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এই জাতি দেব দেবীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করিত। যে সকল মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে শিব ও শক্তি অথবা তদনুরূপ মূর্তি আছে ইহা অনেকে বলেন। বস্তুত তাহাদের ধর্মবিশ্বাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে সঠিক ও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ব্যবহারিক সভ্যতার দিক দিয়া বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহারা খুব উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একপ্রকার লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই।

আর্য জাতি। সকলের শেষে আসিলেন আর্যগণ। ইঁহারাই বর্তমান হিন্দুগণের পূর্বপুরুষ। উত্তর-পশ্চিম গিরি-সংকটের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পরে তাঁহারা পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিলেন। ক্রমশ সমস্ত আর্যাবর্তই তাঁহাদের পদানত হইল। পরাজিত আদিম অধিবাসিগণ দাস-রূপে আর্য-সমাজে গৃহীত হইল; কতক আবার বনে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিল। ইহাদের বংশধরগণ যে আজিও বনে-জঙ্গলেই বাস করিতেছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

দ্রাবিড়গণ কিন্তু সহজে আর্যগণের নিকট মস্তক অবনত করে নাই। কঠোর সংগ্রামের পর আর্যাবর্ত হইতে বিতাড়িত হইয়াও তাহারা বহুকাল পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ-ভারতে

আর্য আগমনে দ্রাবিড়গণের অবস্থা

স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আর্যগণ অবশ্য দীর্ঘকাল পরে দ্রাবিড় দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু আর্যাবর্ত জয়ের মত সেই জয় কখনও পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে নাই। আজকাল আর্যাবর্তে আর্যগণের পূর্ববর্তী প্রাচীন অধিবাসিগণের সভ্যতার চিহ্নমাত্র নাই বলিলেই হয়, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা আজিও বিশেষ ভাবে বিদ্যমান।

আর্য জাতির উৎপত্তি

যে আর্য জাতি এইরূপে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া এক নূতন যুগের প্রবর্তন করিলেন, তাঁহাদের পূর্ব ইতিহাস অতি বিচিত্র। মানব জাতির এক অতি প্রাচীন শাখা হইতে এই আর্য জাতির উৎপত্তি হয়। তাঁহারা বহুদিন পর্যন্ত কোন এক সুদূর প্রদেশে গ্রীক্, রোমান্, জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়ান্ ইত্যাদি জাতির পূর্বপুরুষের সহিত একত্র বাস করিতেছিলেন। তারপর কোন এক সময়ে এই সমুদয় জাতি পরস্পরকে ছাড়িয়া বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসবাস স্থাপন করেন। তাহার পর হাজার হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বংশধরগণের বর্তমান বাসস্থানগুলির মধ্যেও হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান। কিন্তু তথাপি এই সমস্ত জাতির ভাষায় আজ পর্যন্তও যে কতকগুলি কথা প্রায় একই আকারে এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাই পুরাকালে তাঁহাদের একত্র বসবাস করার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ (১)। ঠিক কোথায় যে এই সকল বিভিন্ন জাতি একত্র বাস করিতেন এবং তাঁহারা একই আদিম জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কোন

(১) দৃষ্টান্ত যথা—সংস্কৃত 'মাতর্', গ্রীক 'মেতের', ল্যাটিন 'মাতের', জার্মান 'মুতের', ইংরেজী 'মাদার'।

কোন পণ্ডিতের মত এই যে, ইঁহারা মধ্য-এশিয়ার কোন স্থানে ছিলেন ; কেহ কেহ আবার বলেন যে, ইঁহারা উত্তর মেরু প্রদেশে বাস করিতেন ; কাহারও মতে বর্তমান অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী এবং বোহেমিয়াই ইঁহাদের আদিম বাসস্থান।

পারসিক ও আর্যগণ

যাহা হউক, ইঁহাদের এক বা একাধিক শাখা অন্য সমস্ত শাখা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ভারতের দিকে যাত্রা করিল। কালক্রমে এই দলের এক ভাগ পারস্য দেশে প্রবেশ করিল ; অবশিষ্ট আর সকলে হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিল, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। বর্তমান পারসিক এবং হিন্দুগণের পূর্বপুরুষগণ অন্য জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও, এইরূপে আরও অনেক দিন পর্যন্ত একত্র ছিলেন। এই উভয় জাতির মধ্যে যে নানা বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, ইহাই তাহার কারণ।

তৃতীয় অধ্যায়

আর্য-সভ্যতা

বেদ

আর্যগণের ধর্মগ্রন্থ। আর্যগণের সর্ব-প্রাচীন ও সর্ব-প্রধান ধর্ম-সাহিত্যের নাম বেদ। বেদ চারি ভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম যজু এবং অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার তিনটি করিয়া ভাগ আছে; যথা—সংহিতা, ব্রাহ্মণ (আরণ্যক ও উপনিষদসহ) এবং সূত্র অথবা বেদাঙ্গ।

সংহিতা

ব্রাহ্মণ

আরণ্যক ও উপনিষদ

স্তব, স্তুতি এবং যজ্ঞের মন্ত্র—প্রায়শঃ এই সমুদয় বিষয়গুলি লইয়াই বেদের সংহিতাভাগ পদ্যে রচিত হইয়াছে। গদ্যে লিখিত ব্রাহ্মণ অংশে যজ্ঞের বিবিধ অনুষ্ঠানের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা ও মন্তব্য আছে। অরণ্যবাসী ঋষি ও ব্রহ্মচারিগণের দার্শনিক চিন্তার ধারা আরণ্যক ও উপনিষদে স্থান লাভ করিয়াছে।

বেদের অপৌরুষেয়তা

ভগবান স্বয়ং বেদের এই সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং উহা অভ্রান্ত ও বিচারবিতর্কের অতীত, ইহাই হিন্দুদের ধারণা। এই নিমিত্ত বেদকে নিত্য, শাশ্বত ও অপৌরুষেয় বলা হয়। আর্য ঋষিগণকর্তৃক বেদের মন্ত্র সমুদয় জ্ঞাননেত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহাদিগকে "দ্রষ্টা" বলা হয়।

বেদাঙ্গ

বেদের অবশিষ্ট অংশ বেদাঙ্গ মানুষের রচনা বলিয়া স্বীকৃত হয়। বেদাঙ্গের সংখ্যা ছয়টি। কিন্তু ছয়খানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ

বেদাঙ্গ বলিয়া পরিচিত নহে। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ই ছয় বেদাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। বৈদিক যাগযজ্ঞ বিধিমত করিতে হইলে এই ছয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক হইত। শিক্ষা (উচ্চারণ), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের মূলার্থ ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ এবং কল্প (যাগযজ্ঞ বিধান), এই ছয়টি বেদাঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদ শুদ্ধরূপে পাঠ করিবার জন্য প্রথম দুইটির প্রয়োজন, তৃতীয় ও চতুর্থটি তাহার অর্থ বুঝিবার জন্য, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি যাগযজ্ঞে বেদবিদ্যা প্রয়োগের জন্য আবশ্যক ছিল।

লোক-সাহিত্য

এই সকল ধর্মসাহিত্য ছাড়া আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, সঙ্গীত-কলা, স্থাপত্য-বিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ লৌকিক সাহিত্যেও আর্যগণ অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

কোন্ সময়ে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। তবে এই বিশাল ধর্মসাহিত্য সম্পূর্ণ হইতে যে বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈদিক সাহিত্যের সংহিতাভাগই সর্ব-প্রাচীন। আবার ঋক্-সংহিতা অন্যান্য সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন। অনেকের মতে ঋক্-সংহিতা আনুমানিক ২০০০—১৫০০ খৃঃ পূঃ, অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি ১২০০—৮০০ খৃঃ পূঃ, উপনিষৎ ৮০০—৬০০ খৃঃ পূঃ এবং বেদাঙ্গ ও সূত্রগুলি ৬০০—২০০ খৃঃ পূঃ মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্যের কাল

আর্য-নিবেশ। যখন ঋক্-সংহিতা গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন পর্যন্ত আর্যগণ পঞ্চনদেই বাস করিতেছিলেন। পরে অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রচিত হইবার সময়ে আর্যগণ পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য,

কৌশাম্বী, কাশী, কোশল, বিদেহ, চেদী, বিদর্ভ ইত্যাদি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন।*

আর্য-সমাজ। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বে আর্যগণ বেশি দিন কোন স্থানে বসবাস না করিয়া, অনবরত দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পঞ্চনদ অধিকার করিয়া তাঁহারা স্থায়ীভাবে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে পারিবারিক জীবন গঠিত হইয়া উঠিল। গৃহস্বামী ও তাঁহার সন্তানসন্ততি লইয়া এক একটি পরিবার বেশ শান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিল। কালক্রমে একই পূর্বপুরুষের সন্তানেরা অনেক পরিবারের কর্তা হইল। তখন এই সমুদয় পরিবারের মধ্যে গোত্রের বন্ধন স্থাপিত হইল। এইরূপে অনেকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি বিশিষ্ট গোত্র গড়িয়া উঠিল। অবশ্য কখনও কখনও এমন হইত যে, একই গোত্রভুক্ত পরিবারগুলি প্রকৃতপক্ষে একই পূর্বপুরুষের বংশধর নহে, কিন্তু তাহারা ঐরূপ ধারণার বশীভূত হইয়াই কোন একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হইত। এইরূপ কতকগুলি গোত্র মিলিয়া একটি জাতি গঠিত হইত। এক একটি জাতি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিত।

পরিবার

গোত্র

জাতি

প্রাচীন বৈদিক যুগের জাতিসমূহের মধ্যে ভরত, তৃৎসু, যদু এবং পুরু জাতি বিখ্যাত। পরবর্তী যুগে কুরু, পঞ্চাল এবং

---

* ১। **কুরু**—দিল্লীর চারিদিকে অবস্থিত রাজ্য। ২। **পঞ্চাল**—কুরুর উত্তর-পূর্বস্থিত গঙ্গার উপত্যকা-ভূমি। ৩। মৎস্য—জয়পুর রাজ্য। ৪। **কৌশাম্বী**—এলাহাবাদ জেলা। ৫। কোশল—অযোধ্যা। ৬। **বিদেহ**—উত্তর বিহার। ৭। চেদী—বুন্দেলখণ্ড। ৮। **বিদর্ভ**—বেরার।

কোশল জাতি বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। এই সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে কেহ কেহ আর সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিত। ফলে ইহাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইত। যে রাজা অন্য সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিতে পারিতেন, তিনি নিজকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিতেন। রাজচক্রবর্তী বলিয়া গণ্য হইবার দুইটি উপায় ছিল। প্রথম, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান; দ্বিতীয়, রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন। যিনি রাজচক্রবর্তী হইতে অভিলাষ করিতেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার মানসে একটি যজ্ঞীয় অশ্বকে দেশের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন। অশ্বরক্ষার জন্য অশ্বের সহিত একদল সৈন্য থাকিত। অশ্ব নিজের ইচ্ছামত দিগ্‌দিগন্তরে চলিয়া ভিন্ন রাজ্যে উপস্থিত হইলে, সেই দেশের রাজাকে হয় বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত, না হয় অশ্ব ধরিয়া রাখিয়া অশ্বরক্ষক সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। অশ্বরক্ষকগণ যদি এই সমুদয় বিরোধী রাজাকে পরাজিত করিয়া অশ্ব লইয়া রাজধানীতে ফিরিতে পারিত, তবে সেই অশ্ব বলিদান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইত এবং যজ্ঞকারী রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। রাজসূয়-যজ্ঞে যজ্ঞকারী রাজার যজ্ঞস্থলে সমস্ত অধীন রাজাকে আসিয়া ভৃত্যের ন্যায় হীন কর্ম করিতে হইত; যিনি না আসিতেন, তাঁহাকে বলে পরাজিত করিয়া আনা হইত। অশ্বমেধ ও রাজসূয়

আর্যসমাজে রাজা যে সাধারণত স্বেচ্ছাচারী হইতেন, তাহা নহে। সময় সময় প্রজাগণই রাজা নির্বাচন করিত এবং **সভা** ও **সমিতি** নামে জনসাধারণের দুইটি সংঘের মতামত অনুসারে রাজাকে চলিতে হইত। কালক্রমে এই নির্বাচন প্রথা উঠিয়া

গেল এবং রাজার সন্তানেরা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজপদে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। সভা ও সমিতির ক্ষমতাও কমিয়া গেল, এবং রাজার অবাধ প্রভুত্ব ও ক্ষমতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। প্রকৃতপক্ষে রাজা যে সব সময়ে স্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে, কারণ ধর্মগ্রন্থে রাজার কর্তব্য নির্দিষ্ট থাকিত এবং ধর্মভীরু হিন্দুরাজা তাহা লংঘন করিতে সাহস করিতেন না। উপযুক্ত বিচক্ষণ মন্ত্রীরাও রাজাকে সৎপথে চালিত করিতেন। তারপর চিরপ্রচলিত দেশাচার ও প্রথাও রাজাকে মানিয়া চলিতে হইত। অবশ্য দুর্বৃত্ত রাজা সর্বদেশে সর্বকালেই দেখা যায়। ভারতবর্ষেও এইরূপ রাজা ধর্মের অনুশাসন, মন্ত্রীর উপদেশ ও দেশাচার লংঘন করিয়া প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেন। এই অত্যাচারের মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিত, তখন প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত ও কখনও কখনও হত্যা করিত। প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। সাধারণত প্রাচীন ভারতের রাজগণ নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার ও সুশাসনদ্বারা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিতে যত্নবান্ হইতেন।

আর্য-রাজনীতি

আর্যগণের খাদ্য, পানীয় ও বৃত্তি। আর্যগণ আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ খাদ্যই খাইতেন। সোম লতার রস, তাঁহাদের খুব প্রিয় ছিল। ইহা বর্তমান কালের মদের মত, —পান করিলে বিলক্ষণ নেশা হইত। কৃষিকার্যই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি ছিল; কিন্তু বয়নশিল্প, দারুশিল্প, এবং লৌহ, স্বর্ণ ও চর্ম-শিল্পেও তাঁহারা রীতিমত অভ্যস্ত ছিলেন। অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য এ উভয়েরই খুব প্রচলন ছিল। আর্যগণ

পোত নির্মাণে দক্ষ ছিলেন এবং ইহার সাহায্যে সমুদ্রের উপর দিয়া দেশদেশান্তরে যাতায়াত করিতেন।

আর্য-ধর্ম। আর্যগণের ধর্মে প্রথমে কোন জটিলতা ছিল না। তাঁহারা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করিতেন। যে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাঁহারা মুগ্ধ, বিস্মিত অথবা ভীত হইতেন, তাহাতেই তাঁহারা এক দেবতা কল্পনা করিতেন। এইরূপে ইন্দ্র হইলেন ঝড় ও বৃষ্টির দেবতা; উপরে প্রদীপ্ত সূর্য এবং নীচে উজ্জ্বল অগ্নি, সূর্য ও অগ্নি দেবতা নামে পূজা লাভ করিলেন; প্রভাতকালের মনোরম সৌন্দর্য ঊষাদেবীরূপে পূজিতা হইতে লাগিলেন এবং আকাশের অনন্ত বিস্তার দ্যৌসরূপে কল্পিত হইল। কিন্তু এই সমুদয় প্রাকৃতিক দেবদেবী যে একই ঈশ্বরের সৃষ্ট, ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আর্যগণের দেবতা

প্রথম প্রথম আর্যগণের 'পূজা-প্রণালী' অত্যন্ত সরল ছিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দেবতাগণের উদ্দেশ্যে সেই অগ্নিতে দুধ, ঘি, যব প্রভৃতি সাধারণ খাদ্য ও পানীয় আহুতি দেওয়া হইত, সঙ্গে সঙ্গে মনোহর স্তব পাঠ করা হইত। কালক্রমে পূজা ও যজ্ঞপ্রণালী নানারূপ বিধি-বিধানের চাপে বড়ই জটিল হইয়া উঠিল এবং ঐ সকল সম্পাদন করিতে পুরোহিত নামক এক শ্রেণীর লোকের আবশ্যক হইল।

স্ত্রীজাতির অবস্থা। যজ্ঞ এবং দেবপূজা স্ত্রী স্বামীর সহিত একযোগে করিতেন। আর্যসমাজে সাধারণত স্ত্রীজাতি উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ বৈদিক মন্ত্রও রচনা করিয়া গিয়াছেন। নারীগণ ঘরের কাজকর্ম করিতেন, এবং সামাজিক

আমোদ উৎসবেও সর্বদা যোগ দিতেন। আর্যগণের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মোটের উপর খুব শান্তি ও আনন্দ ছিল।

চতুরাশ্রম। প্রাচীনকালে আর্যগণ নানারূপ আমোদ আহ্লাদ করিতেন, যেমন ঘোড়দৌড়, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি ; কিন্তু মানবজীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল এবং তাঁহাদের নীতিজ্ঞান অতি উচ্চ ধরণের ছিল। আর্যগণের জীবন চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। প্রথম আশ্রমের নাম **ব্রহ্মচর্য**। আর্য-শিশু জীবনের এই অবস্থায় গুরুগৃহে থাকিয়া সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ সংযত হইয়া পাঠাভ্যাস ও সদাচার শিক্ষা করিত। পাঠাভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে, সে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইত। ইহাই দ্বিতীয় অথবা **গার্হস্থ্যাশ্রম**। পরিপাটিরূপে গৃহস্থধর্ম পালন করিয়া গৃহের সমস্ত কর্তব্য সমাপনান্তে গৃহস্থ **বানপ্রস্থ** অবলম্বন করিত, অর্থাৎ বনে যাইয়া নির্জনে ধর্মসাধনে রত থাকিত। বানপ্রস্থের পরের আশ্রমের নাম **যতি**। এই অবস্থায় আর্যগণ সংসারের সহিত সমস্ত বন্ধন ঘুচাইয়া সর্বপ্রকার বাহ্য ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া শুধু পরমাত্মার ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিতেন। আর্যসমাজের উচ্চবর্ণের জনসমূহের জন্য এই চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু প্রত্যেকেই যে চতুরাশ্রম অবলম্বন করিত, তাহা নহে, এবং পর পর চতুরাশ্রমের প্রত্যেকটি আশ্রম অবলম্বন করা সকলের পক্ষে সম্ভবও হইত না। তবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ছাত্রজীবন প্রত্যেকের পক্ষেই অবশ্য-প্রতিপাল্য ছিল। পরের আশ্রমগুলি ইচ্ছামত পালন করা চলিত।

ব্রহ্মচর্য
গার্হস্থ্য
বানপ্রস্থ
যতি

জাতি বিভাগ। বর্তমান হিন্দুসমাজ প্রধানত জাতি-বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। জন্মগত জাতির আর পরিবর্তন হয় না, উচ্চজাতি নিম্নজাতির অন্ন গ্রহণ করে না, এই বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ-ক্রিয়া চলে না, এমন কি, এক জাতির মধ্যেও বিবাহ ও খাদ্যাদি বিষয়ে নানা বিধি-নিষেধ আছে। প্রাচীনতম বৈদিক যুগে কিন্তু জাতিবিভাগের এই কঠোরতা ছিল না। তখন মাত্র দুইটি ভাগ ছিল—আর্য ও দাস,—গৌরবর্ণ বিজেতা আর্য এবং কৃষ্ণবর্ণ বিজিত দাস। ক্রমে ক্রমে আর্যগণের মধ্যে চারিটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। বেদের ভাষা যখন অবোধ্য হইয়া পড়িল এবং যাগযজ্ঞের বিধি জটিল হইতে জটিলতর হইতে লাগিল, সাধারণ লোকে তখন আর নিজেদের ধর্মকার্য নিজেরা করিতে পারিত না। যাঁহারা আজীবন ধর্ম-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, ধর্মকার্য সম্পাদনে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইয়া উঠিল। এইরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উদ্ভব হইল। আবার আর্যগণের রাজ্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে একদল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হইল। রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যশাসনই তাঁহাদের একমাত্র কার্য হইয়া দাঁড়াইল। এই শ্রেণীর আর্যগণ ক্ষত্রিয় নামে বিখ্যাত হইলেন। আর্যসমাজের অবশিষ্ট জনসাধারণ বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইলেন, এবং কৃষিকার্য, শিল্প ও বাণিজ্য তাঁহাদের প্রধান করণীয় কর্ম হইল। ভৃত্যের যাবতীয় কর্ম দাসগণ করিত এবং তাহারা শূদ্র নামে খ্যাত হইল। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি শ্রেণীর উৎপত্তি হইল। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে কিন্তু বর্তমানের ন্যায় জাতিভেদের একান্ত কঠোরতা ছিল না। প্রথম প্রথম বৃত্তি অনুসারেই শ্রেণী নির্ধারিত হইত, অর্থাৎ কোন বৈশ্য,

বৈদিক যুগে জাতিবিভাগের অনস্তিত্ব

শ্রেণী বিভাগ

ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়

বৈশ্য

শূদ্র

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐ শ্রেণীতে পরিণত হইতে পারিত, এবং খাদ্য ও বিবাহ বিষয়ে অন্তত প্রথম তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ প্রচলিত ছিল না। এই শ্রেণীবিভাগ কখন যে জন্মগত কঠোর জাতিবিভাগে পরিণত হইয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। মনুসংহিতা বৈদিক যুগের অনেক পরবর্তীকালের শাস্ত্র। কিন্তু মনুসংহিতার আমলের সমাজেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ ও ভোজন প্রচলিত ছিল। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বহুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতেন, এবং দীর্ঘকাল বিরোধের পরই আর্য-সমাজে ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল।

ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়

কিন্তু আর্যগণের মধ্যে একদল লোক বরাবরই এই সমুদয় নূতন সামাজিক নিয়ম ও ধর্মব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ফলে কঠোর জাতিভেদ এবং নিরর্থক দুর্বোধ্য যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটিতে লাগিল। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মাত্র দুইটির বিষয় আমরা আলোচনা করিব। কারণ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দুই সম্প্রদায়ই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়ের নাম বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়। গৌতম বুদ্ধ এবং বর্ধমান মহাবীর যথাক্রমে এই দুই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম

গৌতম বুদ্ধ। গৌতমের পিতা শুদ্ধোদন শাক্যজাতির একজন নায়ক ছিলেন। কপিলবস্তু * নগরে এই শাক্যগণের রাজধানী ছিল। কপিলবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী বনে গৌতমের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। বাল্যকাল হইতেই গৌতম স্বভাবত চিন্তাশীল ও সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, সুতরাং যাহাতে গৌতমের মন সংসারধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহাই তাঁহার পিতার প্রধান চেষ্টার বিষয় হইল। এই উদ্দেশ্যে তিনি গোপা নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু সংসারে জরা, বার্ধক্য ও মৃত্যুজনিত দুঃখ দেখিয়া গৌতমের চিত্ত বড়ই বিচলিত হইয়াছিল, এবং অবশেষে এক যোগীর শান্ত মুখশ্রী দেখিয়া তিনি সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় কোন্ পথে খুঁজিতে হইবে তাহা উপলব্ধি করিলেন। ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। গৌতম দেখিলেন, সংসারে মায়ার বন্ধন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই তিনি অকস্মাৎ একদিন রাত্রিতে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। ছয় বৎসর তিনি নানাস্থানে ঘুরিলেন, অনেক গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ

বাল্যজীবন

গৌতমের গৃহত্যাগ

* বর্তমান বস্তি জেলার উত্তরে নেপাল তরাইয়ে প্রাচীন কপিলবস্তু নগর অবস্থিত ছিল।

করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিল না। অবশেষে তিনি গয়াতে নির্জন সাধনে রত হইয়া দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গয়ার বিখ্যাত বোধিদ্রুম-মূলে উপবেশন করিয়া গভীর ধ্যানের পর তিনি দুঃখময় জীবনের সমস্যা সমাধান করিয়া প্রকৃত মুক্তি বা নির্বাণ লাভের পথ আবিষ্কার করিলেন এবং "বুদ্ধ" অর্থাৎ জ্ঞানী নামে বিখ্যাত হইলেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি নানাস্থানে তাঁহার ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়াইলেন। ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে * তাঁহার মৃত্যু হয় (আঃ খৃষ্ট পূর্ব ৪৮৭ অব্দ)।

গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ

বুদ্ধের বাণী। উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের উপর বুদ্ধের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে ইহার অনেক প্রভেদ ছিল। বেদের অপৌরুষেয়তা বা অবিসংবাদিত্ব (১৬ পৃঃ) এবং জন্মগত জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। বেদোক্ত যাগযজ্ঞে নির্বাণ বা মুক্তিলাভ হইতে পারে ইহাও বুদ্ধ মানিতেন না। বুদ্ধের ধর্মমত অত্যন্ত সরল। তাঁহার মতে মানুষ স্বীয় কর্মের দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেই গড়িয়া তোলে; কোন দেবদেবীর ইহাতে হাত নাই। এজন্মে যদি কেহ ভাল কাজ করে, তবে পরজন্মে সে উন্নততর জীবন লাভ করিবে, এবং ক্রমান্বয়ে ভাল কাজ করিতে থাকিলে, এইরূপে উন্নতি লাভ করিতে করিতে অবশেষে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিবে। তাহার পর আর তাহার জন্মও হইবে না, সুতরাং সংসারের দুঃখও ভোগ

বুদ্ধের ধর্মমত

* গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান কাশিয়া নামক স্থানে প্রাচীন কুশীনগর অবস্থিত ছিল।

করিতে হইবে না। মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং মন্দ কাজে রত থাকিলে মানুষ জন্মজন্মান্তরে ক্রমশই নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে পতিত হইবে। সুতরাং সত্য কথন, জীবে দয়া, আত্মসংযম, কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা ইত্যাদি ধর্ম-নীতিসমূহের পালন মুক্তিলাভের পক্ষে বুদ্ধ একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। "অহিংসা পরম ধর্ম" এই নীতি বুদ্ধ সমস্ত নীতির উপরে স্থান দিতেন, এবং ইহা তাঁহার ধর্মের একটি মূল সূত্র। বুদ্ধ জাতিভেদ-প্রথা অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন, এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ তিনি স্বীকার করেন নাই।

নীতিধর্ম পালন ও অহিংসা

জাতিভেদ অস্বীকার

বর্ধমান মহাবীর। বর্ধমান মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ একই সময়ের লোক। প্রাচীন বৈশালী নগরের * উপকণ্ঠে কুণ্ডগ্রামে সিদ্ধার্থ নামে একজন ক্ষত্রিয় নায়ক ছিলেন। তাঁহার ঔরসে এবং ত্রিশলা নাম্নী এক লিচ্ছবি রাজকন্যার গর্ভে বর্ধমানের জন্ম হয় (আঃ খৃষ্ট পূর্ব ৫৪০ অব্দ)। যথাকালে বর্ধমানের বিবাহ হয় এবং পত্নী যশোদার গর্ভে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। কিন্তু ৩০ বৎসর বয়সে গৌতম বুদ্ধের মত তিনিও সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন, এবং দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর সংসারের দুঃখরাশি হইতে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। ইহার পর হইতে তিনি মহাবীর ও জিন (অর্থাৎ বিজয়ী) বলিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার 'জিন' নাম হইতেই তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্প্রদায় **জৈন** নামে পরিচিত। গৌতম বুদ্ধ যে সময়ে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, মহাবীরও সেই সময়েই তাঁহার নবধর্ম

জীবনী

জৈনধর্ম প্রচার

* বর্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বসার নামক গ্রাম।

প্রচার করেন এবং বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তিনি পাটনা জেলার পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।

জৈনদিগের কিন্তু বিশ্বাস যে, মহাবীরই তাহাদের ধর্মের আদি প্রবর্তক নহেন, তাঁহার পূর্বে আরও ২৩ জন তীর্থংকর (ধর্ম-প্রবর্তক) জৈন-ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই মতে তীর্থংকর-গণের পর্যায়ে মহাবীর চতুর্বিংশতিতম এবং সর্বশেষ, এবং তিনি পূর্ববর্তীদের ধর্মমতই বিস্তৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য তীর্থংকরগণ সম্বন্ধে যাহাই হউক, মহাবীরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তীর্থংকর পার্শ্বনাথ প্রকৃতপক্ষেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। বলিতে গেলে তিনিই জৈন-ধর্মের গোড়াপত্তন করেন। মহাবীর তাঁহারই মূলনীতিগুলি পরিবর্ধিত করিয়া এই ধর্মমতকে নূতন আকারে জনসমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান।

পার্শ্বনাথ

বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম। বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মে সাদৃশ্যও খুব বেশী, আবার বৈসাদৃশ্যও কম নহে। উভয় ধর্মেরই মূল সূত্রগুলি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমূহ হইতে গৃহীত/কিন্তু উভয়ই বেদের অপৌরুষেয়তা ও অবিসংবাদিত্ব এবং যাগযজ্ঞের বিরোধী। মানুষ যে নিজের কর্মফল বশতই সংসারে দুঃখ ভোগ করে এবং সর্বজীবে অহিংসা ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন পালনই যে মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায় এ সম্বন্ধে উভয়েই একমত। উভয় ধর্মই ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্বাক্। জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধেও উভয়ের এক মত। উভয় ধর্মেই গৃহীকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সকল সাদৃশ্য সত্ত্বেও দার্শনিক মতবাদে এবং ধর্মানুশীলন-প্রণালীতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা রহিয়াছে। জৈন-ধর্ম কঠোর তপস্যার

সাদৃশ্য

পক্ষপাতী, কিন্তু ধর্মানুশীলনে বুদ্ধ বিলাসিতা ও কঠোরতা এই দুইটিই পরিত্যাগ করিয়া মধ্য-পথ অবলম্বনেরই অনুরাগী। অহিংসা মতবাদটিও জৈন-ধর্মে যতদূর কঠোরতার সহিত প্রতিপালিত হয়, বৌদ্ধ-ধর্মে কখনও ততদূর হয় নাই। জৈনদের দিগম্বর সম্প্রদায় বস্ত্র পরিধানেরও বিরোধী, কিন্তু বৌদ্ধেরা উলঙ্গ থাকা অত্যন্ত হীন মনে করিতেন। আবার বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হইতে একেবারেই দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু জৈনগণের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজের সহিত চিরদিনই কিছু কিছু সম্পর্ক ছিল।

গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীর একই সময়ে, একই প্রদেশে তাঁহাদের ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের নির্বাণকালে (অর্থাৎ মৃত্যুকালে) উভয় ধর্মের প্রায় একই রকম প্রতিপত্তি ছিল। এই দুই ধর্মের পরিণাম কিন্তু একেবারে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাঁচশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম এশিয়া মহাদেশের সর্বস্থানে, এমন কি, আফ্রিকা ও ইউরোপের কোন কোন স্থানেও ছড়াইয়া পড়িয়া একটি মহাধর্মে পরিণত হয়। জৈন-ধর্ম কিন্তু ভারতের বাহিরে কোন দেশে প্রসার লাভ করে নাই। অপর পক্ষে, বৌদ্ধ-ধর্ম আজ পাঁচশত বৎসর হয় ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু জৈন-ধর্ম এখনও সগৌরবে ভারতবর্ষে টিকিয়া আছে, এবং জৈনধর্মাবলম্বিগণ সংখ্যায় ও বৈভবে এখনও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী।

আর্য সভ্যতার বিস্তার। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও আর্যসভ্যতা ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে আর্য সভ্যতার কিরূপ বিস্তৃতি হইয়াছিল তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (১৭

পৃষ্ঠা দেখ)। তৎপরে বেদাঙ্গগুলি রচিত হইবার সময়ে আর্যগণ সমগ্র আর্যাবর্তে এবং বিন্ধ্যপর্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণভারতে বাসস্থাপন ও আর্যসভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেন। এমন কি ভারতবর্ষের বাহিরে সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপও তাঁহারা জয় করেন এবং সেখানেও আর্যসভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত। বেদাঙ্গ ব্যতীত এই যুগে রামায়ণ ও মহাভারত নামক দুইখানি মহাকাব্য রচিত হয়। ক্ষত্রিয় রাজা ও বীরগণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা বহুকাল পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। এই উপাদান হইতেই ক্রমশ এই দুইখানি বিপুল মহাকাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। মহাকাব্য হইলেও রামায়ণ ও মহাভারত চিরকাল ধর্মগ্রন্থের ন্যায়ই হিন্দুদের নিকট আদৃত ও পূজিত হইয়াছে। বর্তমান কালেও সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ হিন্দুমাত্রেই ভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া থাকে। রামায়ণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পূর্বে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে অনেক অনার্যজাতি বাস করিত, আর্যগণ ইহাদিগকে রাক্ষস, বানর প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিরূপে আর্য-বীরগণ ক্রমে এই সমুদয় দেশ জয় করেন এবং আর্য-ঋষিগণ ইহাদিগের মধ্যে আর্য-ধর্ম ও আর্য সামাজিক নিয়ম প্রচলিত করেন রামায়ণের আখ্যায়িকায় তাহার একটি স্পষ্ট চিত্র আমরা দেখিতে পাই।

আর্যগণ

পৌরাণিক যুগের যত ধর্মগ্রন্থ আছে, তাহাদের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত নামক সংস্কৃত মহাকাব্য দুইখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ। কোশলের ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা রামচন্দ্রের

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব

জীবনী ও আদর্শ চরিত্র বর্ণনই রামায়ণের বিষয়। মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডব রাজগণের পরস্পর দ্বন্দ্ব এবং হিন্দুগণ যাঁহাকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই কৃষ্ণের আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই মহাকাব্যের আখ্যানভাগ অতি বিচিত্র এবং ইহাতে মানব-জীবনের কি কি আদর্শ হওয়া উচিত, বহুসংখ্যক চমৎকার দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তৎকালীন ধর্ম-নীতি ও সমাজ-নীতির মূল সূত্রগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের ভারতীয় সভ্যতা যে বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থদ্বয়দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। রামের পিতৃভক্তি, ভরত, লক্ষ্মণ ও পাণ্ডবগণের ভ্রাতৃভক্তি, সীতার পতিভক্তি, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, কর্ণের দানশীলতা প্রভৃতি আজ পর্যন্তও হিন্দু সমাজের আদর্শরূপে পরিগণিত। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এই দুইখানি গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং এই দুই গ্রন্থের আখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় যে কত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনৈতিক ইতিহাস

(আনুমানিক ৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে ৩২১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত)

গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক রাজ্য ও সাধারণ-তন্ত্রসমূহ। বুদ্ধ যখন মগধে তাঁহার নবধর্ম প্রচার করিতে-ছিলেন, তখন উত্তর ভারতে কোন বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল না; সমস্ত দেশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উহাদের কোন কোনটি রাজার অধীনে ছিল, আবার কোন কোনটিতে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। শেষোক্ত দেশসমূহে কোন রাজবংশ বংশপরম্পরায় রাজত্ব করিত না; প্রজাগণ সকলে মিলিয়া অথবা তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রতিপত্তিশালী তাহারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিত, এবং ঐ প্রতিনিধিগণের উপর রাজ্যশাসনের ভার ন্যস্ত থাকিত। রাজার অধীন দেশসমূহের মধ্যে কোশল (অযোধ্যা), মগধ (দক্ষিণ বিহার), বৎস (এলাহাবাদ) এবং অবন্তী (মালব) রাজ্য বড় ছিল। বৈশালীর লিচ্ছবি, পাবা ও কুশীনগরের মল্ল এবং কপিলবস্তুর শাক্যগণের মধ্যে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল।

কোশল ও মগধ রাজ্য। এই সময় প্রত্যেক রাজাই নিকটবর্তী অপর রাজ্যসমূহ অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেন;

কাজেই এই সকল রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের আর অন্ত ছিল না। কোশল কাশীরাজ্য এবং শাক্যদের দেশ জয় করিয়া নিজের সীমা বাড়াইয়া লইল। মগধ আবার অঙ্গ (ভাগলপুর জেলা) এবং লিচ্ছবিদের দেশ জয় করিয়া বড় হইল। কোশল এবং মগধের ক্ষমতা বাড়িয়া গেল, তাহাদের মধ্যে যুদ্ধও আসন্ন হইয়া উঠিল; অবশেষে নিম্নলিখিত ঘটনায় প্রকৃতই যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

মগধে শৈশুনাগ বংশ

কোশল ও মগধে যুদ্ধ। খৃষ্ট-পূর্ব প্রায় ৬০০ অব্দে মগধে শিশুনাগ এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের পঞ্চম রাজা বিম্বিসার। বিম্বিসার বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কোশলের রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী কোশল-দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অন্য এক রাণীর গর্ভে বিম্বিসারের অজাতশত্রু নামক এক পুত্র জন্মে। বিম্বিসার যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন অজাতশত্রুর হাতেই তিনি রাজ্য শাসন ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলেন। অজাতশত্রু কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাইয়াই বিম্বিসারকে হত্যা করিলেন। কোশলদেবী স্বামীর শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রসেনজিৎ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগিনীর বিবাহে কাশীরাজ্যের অন্তর্গত যে একখানি গ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় অধিকার করিলেন। ইহার ফলে মগধ ও কোশল রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। অনেকদিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। বহু যুদ্ধের পর অবশেষে দুই রাজ্যের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। প্রসেনজিৎ নিজ কন্যার সহিত অজাতশত্রুর বিবাহ দিয়া সন্ধি করিলেন, এবং যৌতুকস্বরূপ পূর্বোক্ত কাশীরাজ্যের অন্তর্গত গ্রামখানি ফিরাইয়া দিলেন। এই

বিম্বিসার

অজাতশত্রু

সময় হইতেই মগধের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল এবং কোশল রাজ্যের প্রতিপত্তি কমিয়া গেল।

শৈশুনাগ বংশ। অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এই ভয়ংকর পাপের জন্য বিষম অনুতাপ উপস্থিত হইল, এবং তিনি বুদ্ধের একজন বিশেষ ভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনিই নানাদেশ জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার যখন মৃত্যু হইল, তখন মগধের অপ্রতিহত প্রতাপ। উহার সমকক্ষ রাজ্য আর তখন ছিল না।

মগধের অধিরাজত্ব

অজাতশত্রুর পরে শৈশুনাগ বংশের চারিজন রাজা পর পর রাজত্ব লাভ করেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় রাজা উদয় রাজগৃহ হইতে গঙ্গাতীরে পাটলিপুত্রে (বর্তমান পাটনায়) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শেষ দুইজন রাজা নন্দিবর্ধন এবং মহানন্দী নানা দেশ জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের আয়তন আরও বাড়াইয়া তোলেন। শৈশুনাগ বংশের দশজন রাজা রাজত্ব করিলে পর, মহাপদ্ম নন্দ নামক একজন শূদ্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

পাটলিপুত্র

শৈশুনাগ বংশের পতন

নন্দ বংশ। শূদ্র ভূপতি মহাপদ্ম নন্দ একজন অসাধারণ বীর ছিলেন। আর্যাবর্তে তখন যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, মহাপদ্ম উহার অধিকাংশ জয় করেন। তিনি এইরূপে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগের একচ্ছত্র সম্রাট হন। ঐতিহাসিক যুগে ইহাই আর্যাবর্তের প্রথম সাম্রাজ্য। মহাপদ্ম নন্দের পরে তাঁহার আটজন পুত্র রাজত্ব লাভ করেন। তাঁহারা হয় একযোগে রাজক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিলেন, নচেৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যে পর পর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

মহাপদ্ম নন্দ

তাঁহাদের শাসনকালের শেষভাগে বিখ্যাত গ্রীক্ রাজা আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ। বহু প্রাচীনকাল হইতেই পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতবর্ষের বিষয় অবগত ছিল এবং ইহার অতুলনীয় ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির লোভে ইহার আক্রমণে সচেষ্ট ছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আঃ ৫১৮ খৃঃ পূর্বে পারস্যের বিখ্যাত সম্রাট্ দারায়ুস্ ভারত আক্রমণ করিয়া পঞ্চনদের কতকাংশ অধিকার করেন, এবং এইরূপে ভারতের এক সীমান্তপ্রদেশ কিছুকাল পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন হয়। কিন্তু ভারতে পারসিক অধিকার বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই।

দারায়ুসের ভারত আক্রমণ

ইহার দুইশত বৎসর পরে, আর এক পাশ্চাত্য রাজাকর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইল। ইউরোপের মেসিডোনিয়া প্রদেশের রাজা ফিলিপ পরাক্রান্ত হইয়া সমগ্র গ্রীস দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলেকজাণ্ডার অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবী জয়ের এক অদ্ভুত কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। তিনি প্রথম উদ্যমেই পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন এবং পরে ভারতবর্ষ জয় করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ৩২৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিলেন। পথে বর্তমান আফগানিস্থান এবং কাফিরীস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যগুলি জয় করিয়া ৩২৬ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের প্রথমভাগে তিনি সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইলেন। তক্ষশীলার (রাওলপিণ্ডির নিকট) রাজা যুদ্ধ না করিয়াই আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু ঝিলাম্ এবং চিনাব নদীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ভূভাগের অধিপতি পুরু নামে এক রাজা

বীরবর পুরু

সদর্পে আলেকজাণ্ডারের অগ্রসরে বাধা প্রদান করিলেন। যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু বীরবর পুরুর সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, যে, পুরুকে যখন বন্দী অবস্থায় আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল, তখন আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বন্দী, তুমি এখন কিরূপ ব্যবহার পাইতে চাহ ?" পুরু সগর্বে উত্তর করিলেন,—"রাজার মত !" শত্রুপক্ষের প্রতি কঠোরতম শাস্তি বিধানই আলেকজাণ্ডারের বাঁধা নিয়ম ছিল, কিন্তু পুরুর উত্তরে প্রীত হইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহার প্রতি অসামান্য উদারতাপূর্ণ ব্যবহার না করিয়া পারিলেন না ; তিনি পুরুর রাজ্য পুরুকে ফিরাইয়া দিয়া, তাঁহার সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অসম্ভব নহে যে, কূট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি পুরুর সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অতঃপর আলেকজাণ্ডার আবার সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন। পঞ্চনদ প্রদেশ তখন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল ; সেইগুলি খণ্ডভাবে জয় করিতে আলেকজাণ্ডারের বেশি বেগ পাইতে হইল না। বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছিলে তাঁহার সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে স্বীকার করিল না। আলেকজাণ্ডার অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সৈন্যগণের মত ফিরাইতে পারিলেন না ; তাই অবশেষে তিনি বিপাশার তীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ঝিলামের তীর পর্যন্ত স্থলপথে ফিরিয়া তিনি বৃহৎ বৃহৎ নৌকার এক বহর নির্মাণ করিয়া ঝিলাম নদী বাহিয়া সমুদ্রের দিকে চলিলেন। রাস্তায় তিনি নানাস্থানে নামিয়া মালব, ক্ষুদ্রক, শিবি ইত্যাদি বিবিধ জাতিকে যুদ্ধে হারাইয়া

বিপাশা পর্যন্ত গমন

আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তন

অবশেষে সিন্ধু নদের সমুদ্র-সঙ্গমে পৌছিলেন। বর্তমান করাচীর নিকটস্থ এই স্থান হইতে তিনি সৈন্যগণের একভাগ সমুদ্রপথে নৌকায় পাঠাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি বেলুচিস্থানের মরুভূমির উপর দিয়া দেশে ফিরিয়া চলিলেন (অক্টোবর, ৩২৫ খৃঃ পূঃ)। পথে অনেক কষ্ট পাইয়া তিনি অবশেষে পারস্যের সুসা নগরে পৌছিলেন (মে, ৩২৪ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু পর বৎসরই ব্যাবিলন নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলাফল।

কুক্ষণে এক দুর্গ্রহের মত ভারতের ভাগ্যাকাশে আলেকজাণ্ডার উদিত হইয়াছিলেন। মাত্র দুই বৎসর কাল তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার হস্তে সিন্ধু ও পঞ্চনদের অধিবাসিগণ যে দুঃখ ও দুর্দশা ভোগ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ধনে জনে পরিপূর্ণ কত জনপদ ও নগর যে তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন, ভারতের কত অধিবাসী, এমন কি, কত অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশু পর্যন্ত যে, তাঁহার নিষ্ঠুর সৈন্যগণের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল, কত শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র যে তাঁহার পশুপ্রকৃতি সৈন্যগণ বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গ্রীক্‌দের বিবরণ মতে কেবলমাত্র সিন্ধুদেশেই ৮০,০০০ ভারতবাসী আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি লোক যে বন্দী এবং দাস-দাসীরূপে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই দুঃখ ও ধ্বংস-লীলার বিষয় বিবেচনা করিলে, ইহার অনুপাতে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের স্থায়ী ফল অতি সামান্যই হইয়াছিল বলিতে হইবে। এই অভিযানের ফলে

ভারত ও গ্রীক্ সভ্যতার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ-সূত্র স্থাপিত হয় তাহাই ইহার একমাত্র সুফল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কারণ ভারতে আলেকজাণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত রাজত্ব অতি অল্পকালই স্থায়ী হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিলুপ্ত হয়। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ ভারতে পৌছিবামাত্র পঞ্চনদের গ্রীক্-বিজিত রাজ্য-সমূহ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং গ্রীক্গণকে সিন্ধুনদের অপর পারে তাড়াইয়া ভারতবাসী নিশ্চিন্ত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌর্য-সাম্রাজ্য

(আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব ৩২১ অব্দ হইতে খৃষ্ট-পূর্ব
১৮৪ অব্দ পর্যন্ত)

গ্রীকবিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্ত। গ্রীক্‌গণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অভিযানের যিনি নায়ক ছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ্রগুপ্ত। কথিত আছে, যে, চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশেই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু নন্দরাজের বিরাগ-ভাজন হওয়ায় মগধ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু-সংবাদ ভারতে পৌঁছিবামাত্র তিনি গ্রীক্‌দিগকে বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন (আঃ ৩২১ খৃঃ পূঃ)। ক্রমে তিনি মগধেশ্বর নন্দরাজকে পরাভূত করিয়া সমস্ত আর্যাবর্তের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া পড়েন। এই সাম্রাজ্য লাভে কৌটিল্য বা চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন।

চাণক্য

অনতিবিলম্বেই চন্দ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্যের এক বিষম পরীক্ষা উপস্থিত হইল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি সেলিউকস্ তাঁহার এশিয়া মহাদেশস্থ বিজিত রাজ্যসমূহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজ্যে শান্তিস্থাপনের পর সেলিউকস্ পুনরায় পঞ্জাব বিজয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে যুদ্ধে এমন গুরুতররূপে পরাভূত করিলেন যে, সেলিউকস্

সেলিউকসের পরাজয়

পঞ্জাবের উপর সমস্ত দাবী ত পরিত্যাগ করিলেনই, অধিকন্তু কাবুল, কান্দাহার এবং হিরাট এই তিনটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য এইরূপে পারস্যের সীমান্ত হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চন্দ্রগুপ্ত যে কেবল একজন বড় যোদ্ধাই ছিলেন, তাহা নহে, রাজ্যশাসন এবং পরিচালনেও তিনি যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের সর্ববিধ শাসন-সংরক্ষণের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং দেশ ধন-সম্পদে ভরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বয়সে চন্দ্রগুপ্ত রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া জৈন সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি জৈনপদ্ধতি মতে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত শ্রবণ-বেলগোলা নামক স্থানে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য

চন্দ্রগুপ্তের শেষ জীবন

মৌর্য-বংশ। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম মৌর্য-বংশ। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরার নাম হইতেই এই বংশের নাম মৌর্য-বংশ হইয়াছে, ইহাই সাধারণত কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু মৌর্য একটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির নাম, এবং সম্ভবত চন্দ্রগুপ্ত সেই জাতীয় বলিয়াই তাঁহার বংশের নাম মৌর্য-বংশ হইয়াছে।

প্রাচীন মৌর্য-কুল

মেগাস্থিনিসের বিবরণ। সেলিউকস্ এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে গ্রীক্-রাজ মেগাস্থিনিস্ নামক একজন দূতকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দূত বহুদিন পর্যন্ত পাটলিপুত্র নগরে বাস করিয়া ভারতবাসীদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে

একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মৌর্য-যুগের অনেক তথ্য মেগাস্থিনিসের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস্ বলেন যে, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা ভারতবাসীর প্রচুর পরিমাণেই ছিল, এবং এদেশে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত না। খনিজ সম্পদ এবং রত্নাদিও ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, এবং ভারতবাসিগণ মূল্যবান্ বস্ত্র ও অলংকার পরিতে ভালবাসিত। কিন্তু অন্য সব বিষয়ে ভারতবাসীর জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ও সাধারণ রকমেরই ছিল। তাহাদের নৈতিক জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। ভারতবাসীরা সৎস্বভাব ও সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এবং দেশে চুরি ডাকাতি বা মামলা মোকদ্দমা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদের নীতি-ধর্মপালনের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল এবং যজ্ঞ-কাল ভিন্ন অন্য সময়ে মদ্যপান করা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল, স্ত্রীলোকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিত, এবং দাসত্ব-প্রথা মোটেই ছিল না। মেগাস্থিনিস্ এদেশের লোকদিগকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—দার্শনিক (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ আচার্য), কৃষক, পশুপালক, শিল্পী, সৈনিক, অমাত্য ও মন্ত্রী। তিনি বলেন ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশই কঠোর হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মেগাস্থিনিস্ যে ভাবে সাতটি জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন উহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

ভারতবাসীর প্রশংসা

মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন প্রণালীর অনেক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। দেশের শাসন সংরক্ষণ উৎকৃষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত এবং সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। রাজকার্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত হইত। অপরাধীর প্রতি কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা ছিল এবং হস্তপদাদি অঙ্গ-ছেদন সাধারণ দণ্ড-প্রণালীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। শস্যক্ষেত্রে জল সরবরাহের এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাটের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। পঞ্জাব হইতে রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল। পাটলিপুত্র নগর প্রাচীর, পরিখা প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ইহার শাসনভার বর্তমানকালের মিউনিসিপালিটির ন্যায় ত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সভার হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রতি পাঁচজন মিলিয়া একটি ক্ষুদ্র সমিতি গঠন করিতেন, এবং এই প্রকারে যে ছয়টি সমিতি গঠিত হইত, তাহারা প্রত্যেকে এক একটি পৃথক্ বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিত। একটি সমিতির কার্য ছিল নগরে বিদেশীয় আগন্তুকগণের তত্ত্বাবধান করা। অন্য একটি সমিতি নগরের জন্ম, মৃত্যু, লোকসংখ্যা প্রভৃতির সংবাদ লইত। অপর সমিতিগুলি বাজার-শুল্ক আদায়, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিত।

শাসন-প্রণালী

চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বিভাগও এইরূপ ত্রিশ জন সদস্য ও ছয়টি সমিতির অধীনে উৎকৃষ্ট শৃংখলার সহিত পরিচালিত হইত। ইহার মধ্যে পাঁচটি সমিতি যথাক্রমে রণতরী, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তী—এই পাঁচটি সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধান করিত। অবশিষ্ট সমিতির প্রতি রসদ ও যানবাহন প্রভৃতি সরবরাহের

সামরিক বিভাগ

ভার ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদলে ছয় লক্ষ পদাতিক, নয় হাজার হস্তী এবং ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ছিল। রথের সংখ্যা জানা যায় না—তবে মোট সৈন্যসংখ্যা সাত লক্ষের কম ছিল না। এই সমুদয় সৈন্যের বেতন রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত।

উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ মাত্র রাজস্ব-স্বরূপ গৃহীত হইত। প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা ছিল। গুপ্তচরগণ রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া দেশের অবস্থা ও রাজ-কর্মচারিগণের কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে রাজার নিকট নিবেদন করিত।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্য বা চাণক্যের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজনীতি বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন—তাহার নাম অর্থশাস্ত্র। এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং রাজনীতি বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। কয়েক বৎসর পূর্বে একখানি সংস্কৃত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাই কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র; কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই এই মতের বিরোধী; তাঁহারা বলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরবর্তী কালের লেখা। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালীর বিস্তৃত ও পুংখানুপুংখ বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতেই জানা যায় যে, বর্তমানকালের ন্যায় তখনও সমুদয় রাজকার্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন। তৎকালে

কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইত, ভিন্ন ভিন্ন রাজার সহিত সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতি কি কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহা কিরূপ কূটনীতি সহকারে পরিচালিত হইত, রাজস্ব আদায়ের নিয়ম, গুপ্তচর নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রী

অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, মন্ত্রিগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং রাজকার্যের অধিকাংশ বিষয়েই রাজা তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে চলিতেন; গুরুতর বিষয়ের বিচারের জন্য আর একটি পরিষদ ছিল। বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে রাজা মন্ত্রিগণ ও উক্ত পরিষদ্‌কে একত্র আহ্বান করিয়া তাহাদের পরামর্শমত কার্য করিতেন। সুতরাং কার্যত রাজা স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। অর্থশাস্ত্র হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সেকালে রাজা জনসাধারণের মতামতকে বিশেষ ভয় করিয়া চলিতেন, এবং অনেক সময়ে প্রজার বিরাগ-ভাজন হইলে রাজার পদ-চ্যুতি, এমন কি, প্রাণ-নাশ পর্যন্ত ঘটিত। রাজা নিজকে রাজ্যের বেতনভোগী কর্মচারী বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং প্রজার নিকট রাজস্ব-গ্রহণের বিনিময়ে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান অবশ্যকর্তব্য মনে করিতেন।

জনমতের প্রভাব

বিন্দুসার। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই সঠিক জানা যায় না। সম্ভবত তিনি দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও গ্রীক্‌রাজগণের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার রাজসভায় দুইজন গ্রীক্ রাজদূত ছিল।

অশোক। বিন্দুসারের পরে ২৭৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে তাঁহার পুত্র অশোকবর্ধন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু

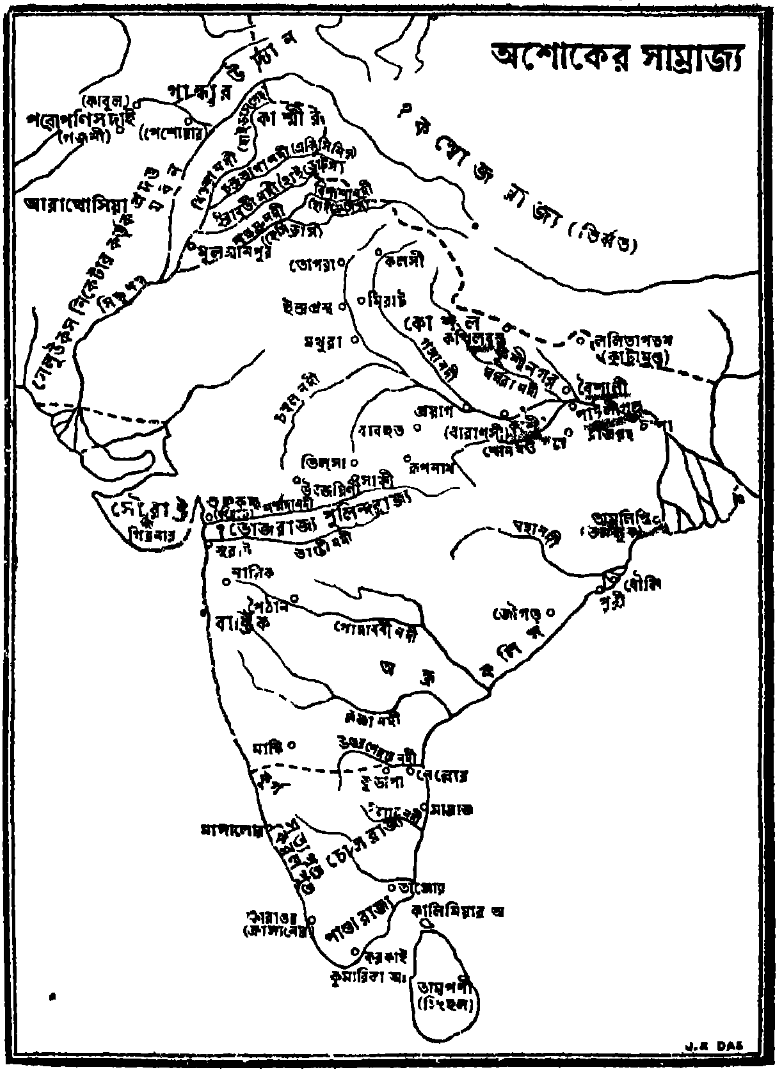
অশোকের সাম্রাজ্য
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
আরাখোসিয়া
তোপরা
কলসী
ইন্দ্রপ্রস্থ
মথুরা
ললিতাপত্তন
বৈশালী
প্রয়াগ
বারাণসী
ভিলসা
রূপনাথ
উজ্জয়িনী
সোপারা
ভোজরাজ্য
পুলিন্দরাজ্য
তাপ্তী নদী
নাসিক
পৈঠান
গোদাবরী নদী
জৌগড়
পুরী
মাস্কি
নেলোর
মাদ্রাজ
চোলরাজ্য
তাঞ্জোর
পাণ্ড্যরাজ্য
কুমারিকা অ
তাম্রপর্ণী
(সিংহল)
J.K DAS

তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্ভবত চারিবৎসর পরে সম্পন্ন হইয়াছিল। সিংহাসনারোহণের অল্পকাল পরেই অশোক কলিঙ্গ (বর্ত্তমান উড়িষ্যা) দেশ জয় করিতে অগ্রসর হন। কলিঙ্গ-বীরগণ প্রাণপণে অশোককে বাধা প্রদান করিলেন। শতসহস্র কলিঙ্গ-বীরের শোণিতে যুদ্ধক্ষেত্র প্লাবিত হইল, কিন্তু তথাপি অশোক জয় লাভ করিলেন। অশোক সম্ভবত স্বয়ং এই মহাযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই বিষম হত্যাকাণ্ড এবং আহত ও শোকার্ত্তগণের দুঃখ ও দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না, এবং বুদ্ধের প্রচারিত "অহিংসা পরম ধর্ম" এই মহাসত্যকে জীবনের সারধর্মরূপে বরণ করিয়া লইলেন।

অশোকের অভিষেক

কলিঙ্গ যুদ্ধ

তাহার ফল

অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও ধর্ম প্রচার—অতঃপর অশোক উপগুপ্ত নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষার পরেই তিনি বৌদ্ধ তীর্থগুলি দর্শন এবং বুদ্ধের বাণী দেশময় প্রচার করিবার জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। জীবনের অবশিষ্টকাল বুদ্ধের বাণী পৃথিবীময় প্রচার করাই তাঁহার ব্রত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক একদল ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত করেন। ইঁহারা ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এবং এমন কি, পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ অবধি গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা পর্য্যন্ত সিংহলে গিয়া এই নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধের সরল উদার ধর্মমত ভারতবর্ষের সকলের নিকট সুপরিচিত করিবার জন্য অশোক উহা অতিশয় সহজ ভাষায় সারা দেশময় পর্বতগাত্রে বা

অশোকের তীর্থযাত্রা

ধর্মপ্রচার

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম

প্রস্তর ও স্তম্ভলিপি

প্রস্তরস্তম্ভে খুদিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মে ইতিমধ্যেই নানা মতের আবির্ভাব হইয়াছিল; এই সমস্ত বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিবার জন্য অশোক বৃদ্ধ বৌদ্ধাচার্যগণকে লইয়া পাটলিপুত্রে এক মহাসভার অধিবেশন করেন। জনসাধারণ যাহাতে নীতিধর্মের শাসন মানিয়া চলে, তাহা দেখিবার জন্য অশোক ধর্ম-মহামাত্র নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় উপায় অবলম্বন করার ফলে ভারত-বর্ষে ও তাহার বাহিরে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা

অশোকের বৌদ্ধধর্মানুসরণ। অশোক নিজের জীবনে বৌদ্ধধর্মের নীতিগুলি সম্যক পালন করায় প্রজাসাধারণও ঐরূপ ধর্মপালনে বিশেষভাবে উৎসাহিত হইত। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ এবং পশুর জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন, এবং সর্বত্র নানাপ্রকার ঔষধার্থে ব্যবহৃত লতাগুল্মাদি রোপণ করিলেন। রাজার ভোজনালয়ে পূর্বে বহুশত পশু ও পক্ষী প্রত্যহ হত্যা করা হইত; অশোক নিরামিষ আহার গ্রহণ করিয়া এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড রহিত করেন। তিনি রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, অনর্থক কেহ প্রাণী হত্যা করিতে পারিবে না। ভিক্ষাজীবিগণ যাহাতে প্রচুর ভিক্ষা লাভ করিয়া অনায়াসে জীবন-ধারণ করিতে পারে, অশোক তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রাজপথের দুইধারে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ করিয়া এবং কূপ খনন ও বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি পথিকের দুঃখ মোচন করিলেন। অশোক নির্মিত স্তম্ভ ও স্তূপ শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। উহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে এখনও দর্শকের মন সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে পূর্ণ হয়।

অশোকের ধর্মানুশীলন

নিরামিষ আহার

জনহিতকর কার্য

শিল্পের চরমোৎকর্ষ

অশোক জনসাধারণের মনে ধর্মভাব জাগাইবার জন্য ধর্মোৎসব উপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া অশোক প্রচার করিতেন, এবং তিনি নিজ জীবনেও তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন ; কারণ যদিও তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণও তাঁহার নিকট সদয় ও সহৃদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইত এবং তাহাদের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধেও তাঁহার তুল্য দৃষ্টি ছিল। পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

আদর্শ রাজা অশোক। অশোক আদর্শ রাজা ছিলেন। তিনি বার বার ঘোষণা করেন যে, তিনি প্রজাদিগকে সন্তানতুল্য জ্ঞান করেন, এবং তাহাদের সুখ ও সুবিধার জন্য অক্লান্তভাবে নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। তিনি রাজকার্যে কঠোর পরিশ্রম করিতেন, এবং ন্যায় ও উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার ধর্মরাজ্যের সমস্ত বিভাগের সামান্য ব্যাপারও তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। এই আদর্শচরিত্র রাজা আজীবন সামান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর মত কাটাইয়া বৃদ্ধ বয়সে সমস্ত প্রজাগণকে কাঁদাইয়া পরলোক গমন করেন (২৩২ খৃঃ পূঃ)।

অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব। সমস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের মধ্যে অশোকের স্থান অতি উচ্চে। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। অশোকের আজীবন চেষ্টায় তাঁহার মৃত্যুকালে সেই ধর্ম দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কোটি কোটি মানবের নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য এমন ঐকান্তিক ও সার্থক চেষ্টার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর খুব কম রাজার জীবন

হইতেই দেখান যাইতে পারে। আজিও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক যে বুদ্ধের ধর্মমত অনুসরণ করে, অশোকের শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতন। অশোকের সাম্রাজ্য অতিশয় বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ-ভারতের চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও মাকরাণ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্য-সাম্রাজ্য আর বেশী দিন টিকিল না। সাতবাহন বংশের

অন্ধ্র ও কলিঙ্গ বিদ্রোহ

নায়কতায় দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া এক বৃহৎ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল। কলিঙ্গেও শীঘ্রই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হিন্দুকুশের অপর পারস্থিত

গ্রীক আক্রমণ

বহ্লীকদেশে (বক্ট্রিয়ায়) প্রতিষ্ঠিত গ্রীকরাজ্যের রাজা এই সুযোগে ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে দলের পর দল সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মৌর্য-সাম্রাজ্যের যখন এইরূপ শোচনীয়

পুষ্যমিত্রের বিদ্রোহ

অবস্থা, তখন মৌর্য-বংশের দশম রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র প্রভুকে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মৌর্য-বংশের মোট দশজন রাজা ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন

মৌর্য-বংশের স্থিতি পরিমাণ

(খৃঃ-পূঃ ৩২১—১৮৪ অব্দ)।

সপ্তম অধ্যায়

মৌর্য-বংশের পতনের পরে ভারতবর্ষের অবস্থা

(খৃঃ পূর্ব ১৮৪—খৃষ্টাব্দ ৩১৯)

পুষ্যমিত্র

সুঙ্গ-বংশ। পুষ্যমিত্রকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম সুঙ্গ-বংশ। পুষ্যমিত্র বহ্লীক রাজ্যের গ্রীক্‌গণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না ; তাহারা আফগানিস্থান ও পঞ্জাব অধিকার করিয়া প্রায় ২৫০ বৎসরকাল সেখানে রাজত্ব করিয়াছিল। গ্রীক্‌রাজ্য পঞ্চনদের বাহিরে কখনও বিস্তৃত হয় নাই ; কিন্তু তথাকার গ্রীক্‌রাজগণ মধ্যে মধ্যে পূর্বদিকে অভিযান করিতেন।

গ্রীক্‌রাজ মিলিন্দ

গ্রীক্‌রাজ মিলিন্দ অযোধ্যা জয় করিয়া পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

কলিঙ্গরাজ খারবেল

এই সময়ে কলিঙ্গদেশের রাজা খারবেলও পুষ্যমিত্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণ সহ্য করিয়াও পুষ্যমিত্রের রাজ্য টিকিয়াছিল, এবং পুষ্যমিত্র সাম্রাজ্যের পূর্বতন গৌরব কতক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ

পুষ্যমিত্র আপনার প্রভুত্ব ও যশের প্রমাণ স্বরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পুষ্যমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক ছিলেন। সিন্ধুনদের তীরে গ্রীক্‌গণ এই অশ্ব অবরোধ করে। বসুমিত্র গ্রীক্‌দিগকে পরাজিত করিয়া বিজয়গর্বে অশ্ব লইয়া পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং সেখানেই মহাসমারোহের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। পুষ্যমিত্রের

বংশধরগণ কিন্তু ক্রমশই হতবল হইয়া পড়েন, এবং ক্রমে সুঙ্গদের প্রতিপত্তি কমিতে থাকে। অবশেষে ৭২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে সুঙ্গ-বংশের দশম রাজা তাঁহার মন্ত্রী বসুদেবকর্তৃক নিহত হন।

কাম্ব-বংশ। বসুদেবকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কাম্ব-বংশ বলিয়া পরিচিত। এই বংশের চারিজন রাজা মোট ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন (৭২—২৭ খৃঃ-পূঃ)।

বৈদেশিক আক্রমণ—গ্রীক্ ও শকগণ। সুঙ্গ ও কাম্ব-বংশের আধিপত্যের সময় পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ বার বার বৈদেশিকগণের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। বহ্লীকরাজ্যের গ্রীক্‌গণের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীকের পরে আসিল শক। এই যাযাবর * জাতি প্রথমে অক্ষুনদীর পারে বাস করিত। পরে ইউচি নামক আর একটি যাযাবর জাতির আক্রমণের ফলে স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্বক হিন্দুকুশ পার হইয়া সিস্তানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাহারা ক্রমশ অগ্রসর হইয়া উত্তরে তক্ষশিলা ও মথুরায় এবং দক্ষিণে মালব ও সৌরাষ্ট্রে (কাঠিয়াবার উপদ্বীপ) ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সৌরাষ্ট্রের শক রাজ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইয়াছিল এবং এই রাজ্যের রাজগণ "পশ্চিম ক্ষত্রপ" বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। এই বংশে বহু রাজা সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনই সর্বপ্রধান। রাজা রুদ্রদামন খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করেন।

শক ও ইউচি

শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামন

---

* যাহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই এবং যাহারা স্ত্রী-পুত্র ও পশু, ধন-ধান্য প্রভৃতি লইয়া দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে যাযাবর জাতি বলে।

তিনি দিগ্বিজয়দ্বারা স্বীয় রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। শক ক্ষত্রপগণ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতকের শেষ হইতে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া সৌরাষ্ট্রে রাজত্ব করেন।

পারদগণ। শকদের পরে আসিল পহ্লব অথবা পারদগণ। পারদগণ কাস্পীয়ান্ হ্রদের দক্ষিণস্থ ভূ-ভাগে আধিপত্য করিত। তাহারা ক্রমশ কান্দাহার জয় করিয়া ভারতে প্রবেশ করিল এবং কাবুল ও সিন্ধুনদের উপত্যকায় নানা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল। যিশুখৃষ্টের মৃত্যুর অল্প পরেই সেণ্ট টমাস্ নামে একজন খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী পারদরাজ গণ্ডোফারেসের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। **খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী সেণ্ট টমাস্**

কুষাণগণ। সর্বশেষে আসিল কুষাণগণ। ইহারা ইউচি জাতির এক শাখা। ইউচি জাতি প্রথমে চীনদেশের সীমান্তে বাস করিত। কিরূপে তাহারা শকগণকে তাড়াইয়া তাহাদের অক্ষুনদীর তীরবর্তী বাসস্থান জয় করিয়া নেয়, ~~তাহা পূর্বে উক্ত~~ হইয়াছে। অতঃপর ইউচিগণ শীঘ্রই বহ্লীক দেশ জয় করিয়া ফেলিল এবং যাযাবর স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থবৃত্তি অবলম্বন করিল। এই সময় ইউচি জাতি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কুষাণ শাখাই ক্রমে সর্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের নায়ক কুজুল কদফিস্ শীঘ্রই সমগ্র ইউচি জাতিকে স্বীয় বশে আনিতে সমর্থ হইলেন। পরে তিনি গ্রীক্ ও পারদগণকে পরাজিত করিয়া আফগানিস্থান অধিকার করিলেন। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে- **কুজুল কদফিস**

ছিলেন, এমন সময় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিম কদফিস্ ভারতবর্ষের কতকাংশ জয় করিয়া পিতার আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি তাঁহার ভারতীয় রাজ্য নিজে কখনও শাসন করেন নাই; তাঁহার প্রতিনিধিগণই উক্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিত।

বিম কদফিস্

মহারাজাধিরাজ কনিষ্ক। বিম কদফিসের পরে কনিষ্ক কুষাণগণের রাজা হইলেন। বিম কদফিসের সঙ্গে কনিষ্কের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানা যায় না; কিন্তু কনিষ্কই যে কুষাণ-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যুদ্ধে চীনরাজকে পরাজিত করিয়া সন্ধির জামিন স্বরূপ কয়েকজন চীন রাজকুমারকে নিজ রাজ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষ তাঁহার সভায় ছিলেন। ইনি বহু দার্শনিক গ্রন্থ ও কাব্য রচনা করিয়া এই যুগের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

কনিষ্কের সাম্রাজ্য

কনিষ্কের বৌদ্ধধর্মের পোষকতা

কনিষ্ক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের এক মহাসভা আহ্বান করিয়া বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বিরোধ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে মহাযান ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করায় বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে মহাবিরোধের সূচনা হয়, এবং ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হয়। বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর পেশবারে কনিষ্ক প্রকাণ্ড এক স্তূপ নির্মাণ করেন। এখন যেমন তাজমহল দেখিতে আগ্রায় দর্শকের ভিড় হয় তখন তেমনি ইহার অপূর্ব গঠন ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখিতে দেশ-বিদেশ হইতে পেশবারে লোক সমাগত হইত। এই

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মহাসভা

কনিষ্কের স্তূপ

স্তূপের ভগ্নাবশেষ ও তাহার অভ্যন্তরে রক্ষিত বুদ্ধের অস্থি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে মথুরায় কনিষ্কের একটি প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কনিষ্কের তুর্কি পোষাক এবং তাঁহার আকৃতি সবিশেষ শক্তিশালী দেখা যায়। — কনিষ্কের প্রতিমূর্তি

কনিষ্কের রাজ্যকাল ঠিকরূপে এখনও নির্ধারিত হয় নাই। সাধারণত এইরূপ ধরা হইয়া থাকে যে, তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং নিজের রাজ্যারোহণ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে একটি সংবৎ প্রচলন করেন, তাহাই বর্তমানে প্রচলিত শকাব্দ। — কনিষ্কের রাজত্বকাল; শকাব্দ

শকাব্দ ব্যতীত প্রাচীন ভারতবর্ষে আরও অনেক অব্দের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কেবলমাত্র বিক্রম সংবৎ এখনও প্রচলিত। খৃষ্ট জন্মের ৫৮ বৎসর পূর্বে এই সংবতের প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে একটি কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, উজ্জয়িনী নগরে বিক্রমাদিত্য নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, এবং তিনিই এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বর্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ ৫৮ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজা ছিলেন একথা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ৫৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দে যে সংবতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা প্রথমে বিক্রম-সংবৎ নামে পরিচিত ছিল না; পরবর্তীকালে বিক্রমাদিত্য নামক অথবা ঐ উপাধিধারী কোন রাজার নামের সহিত জড়িত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহা 'বিক্রম-সংবৎ' এই নূতন নাম ধারণ করিয়াছে।

৫৮ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে কে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করিল এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে কনিষ্কই ঐ সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়া এই সংবতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত খুব কম ঐতিহাসিকই গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে মালব জাতিরা এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আবার কেহ বলেন যে পহ্লব জাতীয় 'অয়' নামক রাজার সিংহাসন লাভ উপলক্ষে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা হয়। আরও নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত না হইলে, কনিষ্কের রাজ্যকাল এবং শকাব্দ ও বিক্রম-সংবতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

সংবৎ

কুষাণ-সাম্রাজ্যের পতন। কনিষ্কের পরে যথাক্রমে বাশিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেব রাজ্যলাভ করেন। এই চারিজন রাজা মোট প্রায় এক শতাব্দীকাল বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পরবর্তী কুষাণ সম্রাট্গণ তেমন প্রবল ছিলেন না, তাই অবিলম্বেই কুষাণ-সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন, এবং সমগ্র উত্তর ভারত জুড়িয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হইল। কুষাণদের রাজ্য শুধু পঞ্চনদ প্রদেশের পশ্চিম ও আফগানিস্থানের পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ রহিল।

কণিষ্কের পরবর্তী কুষাণরাজগণ

অন্ধ্রগণ। উত্তর ভারতে যখন বৈদেশিক জাতিরা প্রতিপত্তি লাভ করিতেছিল, অন্ধ্রগণ তখন দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করে। এই অন্ধ্র রাজ-বংশ সাতবাহন-বংশ বলিয়া খ্যাত। অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সাতবাহন রাজগণ গোদাবরীর উপত্যকায়

সাতবাহন রাজ-বংশ

এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করেন। শীঘ্রই এই রাজ্য এত প্রবল হইয়া উঠে যে, সাতবাহন রাজগণ বার বার উত্তর ভারতে অভিযান করিয়া, মালব রাজ্য এবং সম্ভবত মগধ অধিকার করিয়া বসেন। সৌরাষ্ট্রের শকরাজগণ কিন্তু সাতবাহনগণকে মালব হইতে শীঘ্রই তাড়াইয়া দিলেন এবং উভয় রাজ্যের মধ্যে বহুকালব্যাপী যুদ্ধ চলিল; অবশেষে শকরাজগণ দাক্ষিণাত্যের কতক অংশ অধিকার করিলেন। কিন্তু সাতবাহন-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী শকগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে দূর করিয়া দিলেন, এমন কি শকরাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রবল-প্রতাপ অন্ধ্র রাজ্যের উদ্ভবের জন্যই সেখানে বৈদেশিক বর্বর জাতিগণ স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। গৌতমীপুত্রের পুত্র পুলুমায়ী শক-রাজ রুদ্রদামনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেও উভয় বংশের চিরন্তন বিরোধ নিরস্ত হয় নাই। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় বংশের রাজগণ হতবল হইয়া পড়িলে, এই বিরোধ থামিয়াছিল। সাতবাহন-বংশের ত্রিশজন রাজা প্রায় ৪৫০ বৎসর রাজত্ব করেন (প্রায় খৃঃ-পূঃ ২২০ হইতে খৃষ্টাব্দ ২৩০)। সাতবাহন রাজগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

সাতবাহন ও শকগণের কলহ

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী

পুলুমায়ী

দক্ষিণের তামিল রাজ্যসমূহ। ভারতের সর্ব-দক্ষিণ অংশে এই সময়ে চোল, চের, পাণ্ড্য প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। চোল-রাজ্য পূর্ব উপকূলে উত্তরে পেন্নার নদী হইতে দক্ষিণে ভেল্লার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চের-রাজ্য বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবার প্রদেশে বিস্তৃত ছিল।

চোল, চের এবং পাণ্ড্যরাজ্য

পাণ্ড্য-রাজ্য বর্তমান মাদুরা ও টিনেভিলি জেলায় অবস্থিত ছিল। এই সমুদয় রাজ্য অশোকের যুগেও স্বাধীন ছিল, কিন্তু এই প্রবল প্রতাপশালী সম্রাটের সহিত তাহারা বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াই চলিত। সমুদ্র-কূলে অবস্থান হেতু এই সকল রাজ্য দূর দেশ-দেশান্তরের সহিত সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করিয়া বিভবশালী হইয়াছিল। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লব-বিক্ষোভ এই সকল রাজ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

অষ্টম অধ্যায়

গুপ্ত-সাম্রাজ্য

(৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দ)

চন্দ্রগুপ্ত। খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মগধে এক নূতন রাজবংশের উদ্ভব হইল। এই বংশের প্রথম দুইজন রাজা ক্ষুদ্র ভূ-ভাগের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তৃতীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকুমারী কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া নিজ বংশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াইয়া তুলিলেন। তিনি পশ্চিমে প্রয়াগ পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন, এবং পাটলীপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণের বৎসর স্মরণীয় করিবার জন্য ৩২০ খৃষ্টাব্দে যে সংবতের প্রচলন করেন, তাহাই গুপ্ত সংবৎ নামে পরিচিত। গুপ্ত সংবৎ

সমুদ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। সমুদ্রগুপ্তের অসাধারণ সমর-কৌশল ছিল, এবং তিনি সর্বসম্মতিক্রমে প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্ষুদ্র গুপ্তরাজ্যকে একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। প্রথমে তিনি উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ অধিকার করিয়া উহাদিগকে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এইরূপে আর্যাবর্ত-বিজয় সমাপ্ত করিয়া ভারতের পূর্ব উপকূল ধরিয়া তিনি তাঁহার বিজয়বাহিনী লইয়া দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হন, এবং পথে বহু সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়

রাজাকে পরাভূত করিয়া বর্তমান মাদ্রাজ পর্যন্ত উপনীত হন। এই সকল রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলে, সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদিগকে তাঁহাদের রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের সময়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সীমা

সাম্রাজ্যের যে অংশ সমুদ্রগুপ্তের স্বীয় শাসনাধীন ছিল, তাহার উত্তর সীমা হিমালয়ের পাদদেশ, পূর্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণ সীমা নর্মদা এবং পশ্চিম সীমা যমুনা ও চম্বল নদী। এই সীমার বাহিরে বহু রাজ্য ও সাধারণ-তন্ত্র শাসিত প্রদেশ গুপ্ত-সম্রাট্কে কর প্রদান করিত। এই সমুদয়ের মধ্যে সমতট বা নিম্নবঙ্গ, কামরূপ বা আসাম ও নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের এবং পঞ্জাব ও রাজপুতানাস্থিত মালব, যৌধেয় ও অর্জুনায়ন প্রভৃতি সাধারণ-তন্ত্র শাসিত জাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞ

এইরূপে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যে বহু রাজ্য জয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করিলেন, এবং যথাকালে যথানিয়মে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এতকাল অহিংসামূলক বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান তাহার পুনরভ্যুত্থান সূচনা করিল।

সমুদ্রগুপ্তের অসাধারণত্ব

সমুদ্রগুপ্ত একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি একাধারে বীর, কবি এবং গায়ক ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রায় দেখা যায়, তিনি একখানি আসনে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসরণ করিতেন বটে, কিন্তু অন্য ধর্মকেও অবজ্ঞা করিতেন না। সিংহলের বৌদ্ধ রাজা মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় একটি আশ্রম নির্মাণ করিবার জন্য সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সমুদ্রগুপ্ত সানন্দে ইহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলিয়া বর্ণনা

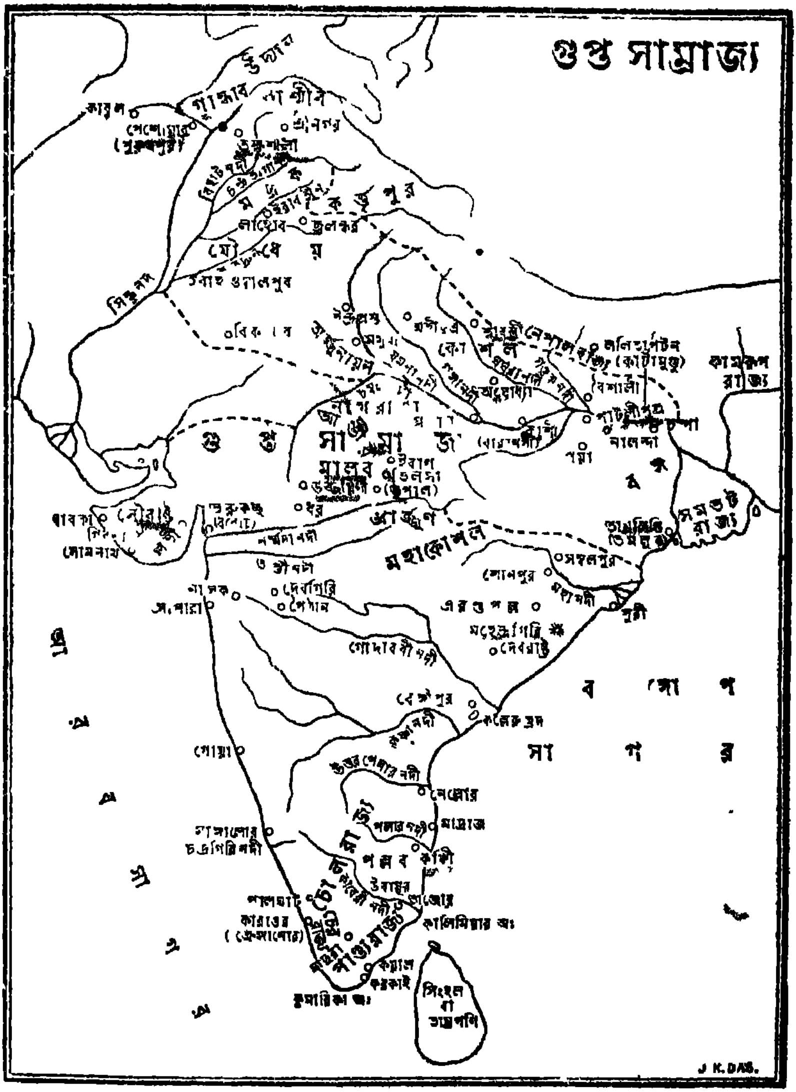

গুপ্ত সাম্রাজ্য
গান্ধার
শ্রীনগর
লাহোর
জলন্ধর
সিন্ধুনদ
নর্ম্মদা নদী
মহাকোশল
মালব
সম্বলপুর
সোনপুর
পুরী
দেবগিরি
পৈঠান
গোদাবরী নদী
দেবরাষ্ট্র
বেঙ্গীপুর
কৃষ্ণা নদী
গোয়া
উত্তর পেন্নার নদী
নেল্লোর
মাদ্রাজ
পল্লব
কাঞ্চী
উরায়ুর
তাঞ্জোর
কালিমিয়ার অঃ
কয়াল
কুমারিকা অঃ
সিংহল
বা
তাম্রপর্ণি
বিশালী
নালন্দা
গয়া
অযোধ্যা
কামরূপ
রাজ্য
সমতট
রাজ্য
সোমনাথ
সাগর
J K. DAS.

করিয়াছেন। ইহা সকলে স্বীকার করুন বা না করুন সমুদ্রগুপ্ত যে প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য)। সমুদ্রগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন (আনুমানিক ৩৭৫ খৃষ্টাব্দ)। তিনি শকক্ষত্রপগণকে পরাভূত করিয়া মালব ও সৌরাষ্ট্র অধিকার করেন। এইরূপে ভারতে বৈদেশিক প্রভুত্বের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করাই তাঁহার রাজত্বকালের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই জয়ের ফলে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সীমা আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত "বিক্রমাদিত্য" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। "বিক্রমাদিত্য" অর্থ সূর্যের মত তেজশালী। এই উপাধিটি একাধিক ভারতীয় রাজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে, উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শকগণকে পরাভূত করেন এবং ৫৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিক্রম-সংবতের প্রতিষ্ঠা করেন। আরও কথিত আছে, যে, তাঁহার সভায় বিখ্যাত 'নবরত্ন' বাস করিতেন এবং এই নবরত্নের এক রত্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, জন-প্রবাদের এই বিক্রমাদিত্য এবং মালব ও সৌরাষ্ট্রের শকরাজ-বিজেতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি। সম্ভবত কালিদাস এই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভায়ই বর্তমান ছিলেন। কিন্তু নবরত্নের সকল পণ্ডিতই যে এই সময়ে বর্তমান ছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে।

উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য

বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব

কুমারগুপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত ৪১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতামহের মত তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে দলে দলে বর্বর হুনগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত হুনদিগকে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তখনকার মত গুপ্ত-সাম্রাজ্য রক্ষা করিলেন।

হুনগণের পরাজয়

স্কন্দগুপ্ত। ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে কুমারগুপ্ত পরলোক গমন করেন, এবং তাঁহার বীরপুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে কাঠিয়াবার উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট সাম্রাজ্য স্কন্দগুপ্ত অতি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। ভারতের সীমান্তে তখনও হুনগণ ঘুরিতেছিল, কিন্তু যতদিন স্কন্দগুপ্ত বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাহারা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সীমা লংঘন করিতে সাহস করে নাই। ৪৬৭ অথবা ৪৬৮ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হইলে ভারতের দুর্দিন উপস্থিত হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনজন গুপ্তসম্রাট—পুরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত (বালাদিত্য) ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত—পর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং হুনগণ ক্রমশই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সীমা লংঘন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। মালব হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অখণ্ড গুপ্ত-সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বুধগুপ্তের মৃত্যুর পরে গুপ্ত-সাম্রাজ্য আর টিকিল না। হুনগণ মালব, রাজপুতানা এবং পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইল।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

হুন-বিজয়

গুপ্তযুগ ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনকাল ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ

গৌরবময় যুগ। এই সময়ে ভারতীয় মনীষা বহুদিকে বিকাশ পাইয়াছিল। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য এই সময়ে গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে এবং অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও অন্যান্য বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হয়। স্থাপত্যবিদ্যা, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার চর্চাও দেশে বহু বিস্তৃত হইয়াছিল এবং আশ্চর্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশেষ উন্নতি হয়, এবং ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমূহও পুনরায় জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করে। রামায়ণ ও মহাভারত এই সময়েই বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয় এবং বহু পুরাণ ও স্মৃতি গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয়।*

গুপ্ত যুগে ভারতীয় সভ্যতার চরমোৎকর্ষ

ফা-হিয়ানের বিবরণ। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারত ভ্রমণে আসিয়া, সেই সময়ের একটি মনোরম বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত অতিশয় ন্যায়পরায়ণ, উদার ও বিচক্ষণ রাজা ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী অনুসারে রাজ-কার্য নির্বাহ করিতেন। সমগ্র দেশ সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। পাটলিপুত্র নগরের তখন পূর্ণ গৌরব। সেখানে বহু সুরম্য প্রাসাদ বর্তমান ছিল। তাহাদের কোন কোনটি অশোকের নির্মিত। উহাদের শিল্প ও গঠন-নৈপুণ্য দেখিয়া ফা-হিয়ান বিস্ময়ে এতদূর অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন যে, উহা মানুষের নির্মিত ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। রোগীর চিকিৎসার জন্য তখন দেশময় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার দেখিয়া ফা-হিয়ান অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাহাদের সংযম, চরিত্র ও রীতি-

সুনিয়ন্ত্রিত শাসন বিধি

পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি

* বিশদ বর্ণনার জন্য ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নীতির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। দেশে প্রচুর ধন-বল ও জন-বল ছিল, এবং দণ্ডবিধি মোটেই কঠোর ছিল না। কিন্তু নীচ অন্ত্যজ জাতির প্রতি ব্যবহারে ভারতবাসী উদারতার পরিচয় দিতে পারে নাই; চণ্ডালগণ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং তাহাদিগকে নগরের বাহিরে বাস করিতে হইত।

চণ্ডালগণের দুরদৃষ্ট

নবম অধ্যায়

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতবর্ষের অবস্থা

(খৃঃ ৫০০—৭৫০)

ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর ২৫০ বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষে আর কোন বৃহৎ স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠিত হইতে পারে নাই। এই সুদীর্ঘ কাল উত্তর ভারত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তবে মাঝে মাঝে অসাধারণ শক্তিশালী কোন রাজা কিয়ৎকালের জন্য দিগ্বিজয় দ্বারা স্বীয় রাজ্যের সীমা অনেক পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছেন। এই সমুদয় রাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

তোরমান ও মিহিরকুল

যশোধর্মন্ কর্তৃক মিহিরকুলের পরাজয়

হূন-রাজ্য। বর্বর হূনগণ প্রথমে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী ছিল। তাহাদের ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং মালব, রাজপুতানা ও পঞ্জাব বিজয়ের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। হূনরাজগণের মধ্যে তোরমান এবং তাঁহার পুত্র মিহিরকুল সবিশেষ খ্যাত। হূনগণ অত্যন্ত নৃশংস ও রক্ত-লোলুপ জাতি ছিল। তাহারা যেখানেই যাইত, সেখানেই সমস্ত ছারখার করিয়া দিত। অবশেষে মহারাজাধিরাজ যশোধর্মন্ মিহিরকুলকে পরাজিত করিলেন এবং ভারতে হূনগণের ক্ষমতা প্রতিহত হইল (আঃ ৫৩০ খৃঃ)।

যশোধর্মন্। অসাধারণ সমর-কুশলী যশোধর্মন্ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের অল্পকাল পরেই মালবে একটি স্বাধীন

যশোধর্মনের সাম্রাজ্য

রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বিজয়-বাহিনী আরব সাগর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত উত্তর ভারতের সমস্ত স্থানে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল। খৃ: ৫৩০ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া হুনগর্ব খর্ব করাই তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। }

মৌখরীগণের হুন দমন

মৌখরী বংশ। যে প্রদেশ বর্তমানে আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত-প্রদেশ নামে খ্যাত, সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া মৌখরীগণ একটি প্রবল রাজ্য গঠিত করিয়া তোলে। {যশোধর্মনের তিরোধানের পর হুন দমনের ভার মৌখরীগণের উপরেই পড়ে, এবং অর্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের এই কর্তব্য উত্তমরূপেই পালন করিয়াছিল। মৌখরী-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ঈশানবর্মন্ আর্যাবর্তের বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।}

মৌখরীরাজ-শ্রেষ্ঠ ঈশানবর্মন্

পরবর্তী যুগের গুপ্ত উপাধিধারী রাজবংশ। গুপ্ত উপাধিধারী এক রাজ-বংশ এই সময়ে মৌখরীদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইরা উঠে। পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত গুপ্তসম্রাটগণের সহিত প্রভেদ রক্ষা করিবার জন্য এই বংশকে "পরবর্তী গুপ্ত-বংশ" বলা হয়। এই গুপ্তরাজগণ মৌখরীরাজগণের সহিত সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। {এই বংশের রাজা কুমারগুপ্ত মৌখরীরাজ ঈশানবর্মনকে পরাজিত করেন, কিন্তু শীঘ্রই আবার মৌখরীগণ গুপ্তরাজকে পরাজিত করিয়া মগধের কিয়দংশ অধিকার করিল।// কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদর গুপ্ত আবার মৌখরীগণকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত যুদ্ধস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন।// দামোদর গুপ্তের পুত্র ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্যন্ত জয় করেন।

মৌখরীদের সহিত যুদ্ধ

কুমারগুপ্ত-

দামোদর গুপ্ত-

এই গুপ্তরাজগণ কিয়ৎকালের জন্য কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে এই বংশের আদিত্যসেন নামক নৃপতি একটি প্রবল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্রাট পদবী গ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলি বিষ্ণু-মন্দির নির্মাণ করেন এবং তাঁহার মাতা ও রাজমহিষী ভাগলপুর জেলায় বিহার ও মন্দির নির্মাণ, কূপ খনন প্রভৃতি অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান করেন। আদিত্যসেনের পর সম্রাট উপাধিধারী আরও তিনজন রাজা রাজত্ব করেন। আদিত্যসেন

বঙ্গদেশ। গুপ্তরাজ্যের পতনের অব্যবহিত পরে বঙ্গদেশে এক স্বাধীন ও প্রবল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। এই রাজগণ প্রথমে পশ্চিমদিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রবল মৌখরী-রাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই আশা ফলবতী হয় নাই। শীঘ্রই বঙ্গদেশে এক বীরপুরুষের আবির্ভাব হওয়ায় বঙ্গদেশ এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্যে পরিণত হইল। এই বীরের নাম শশাঙ্ক। শশাঙ্ক তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে*। শশাঙ্কের পূর্ব-ইতিহাস কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিন্তু তিনি শীঘ্রই প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন এবং বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত জয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয় পশ্চিমদিকে বিজয়যাত্রা করিয়া তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সহায়তায় কান্য-কুব্জের মৌখরীরাজকে পরাজিত করিলেন। ঐতিহাসিক যুগে বাঙালি এই প্রথম আর্যাবর্তে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। প্রথম বঙ্গ-সাম্রাজ্য

হর্ষবর্ধন। কান্যকুব্জ জয় করিতে গিয়া শশাঙ্কের সহিত থানেশ্বররাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। থানেশ্বর রাজ্য প্রথমে থানেশ্বর রাজ্যের অভ্যুত্থান

* বর্তমান মুর্শিদাবাদের নিকট।

ক্ষুদ্র ছিল, কিন্তু রাজা প্রভাকরবর্ধন হূন, গুর্জর ইত্যাদি শক্তিসমূহকে পরাজিত করিয়া ইহাকে একটি প্রবল রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু

রাজ্যবর্ধন

সিংহাসনে বসিবামাত্র তাঁহার নিকট সংবাদ পৌছিল, যে, বঙ্গরাজ শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছেন—যুদ্ধে কান্যকুব্জরাজ হত ও রাজ্যবর্ধনের ভগিনী কান্যকুব্জরাজমহিষী রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হইয়াছেন। রাজ্যবর্ধন তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য লইয়া শশাঙ্ক ও তাঁহার মিত্র মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করিয়া রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যু

তিনি সহজেই দেবগুপ্তকে পরাজিত করিলেন, বটে, কিন্তু শশাঙ্কের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। থানেশ্বরে যখন এই দুঃসংবাদ পৌছিল, তখন প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৬০৬ খৃষ্টাব্দ)। এই সময় হইতেই হর্ষাব্দ নামে এক নূতন অব্দ প্রচলিত হয়।

হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ ও

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধন করিয়া হর্ষবর্ধন স্বকীয় রাজধানী কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত করিলেন, এবং সমস্ত আর্য্যাবর্ত বিজয়ের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শশাঙ্ককে দমন করিবার জন্য তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। শশাঙ্কের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানা যায় না; কিন্তু ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও যে শশাঙ্ক প্রবলপ্রতাপে পূর্বভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন আর্যাবর্তের অধিকাংশ জয় করিয়া এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার

হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয়

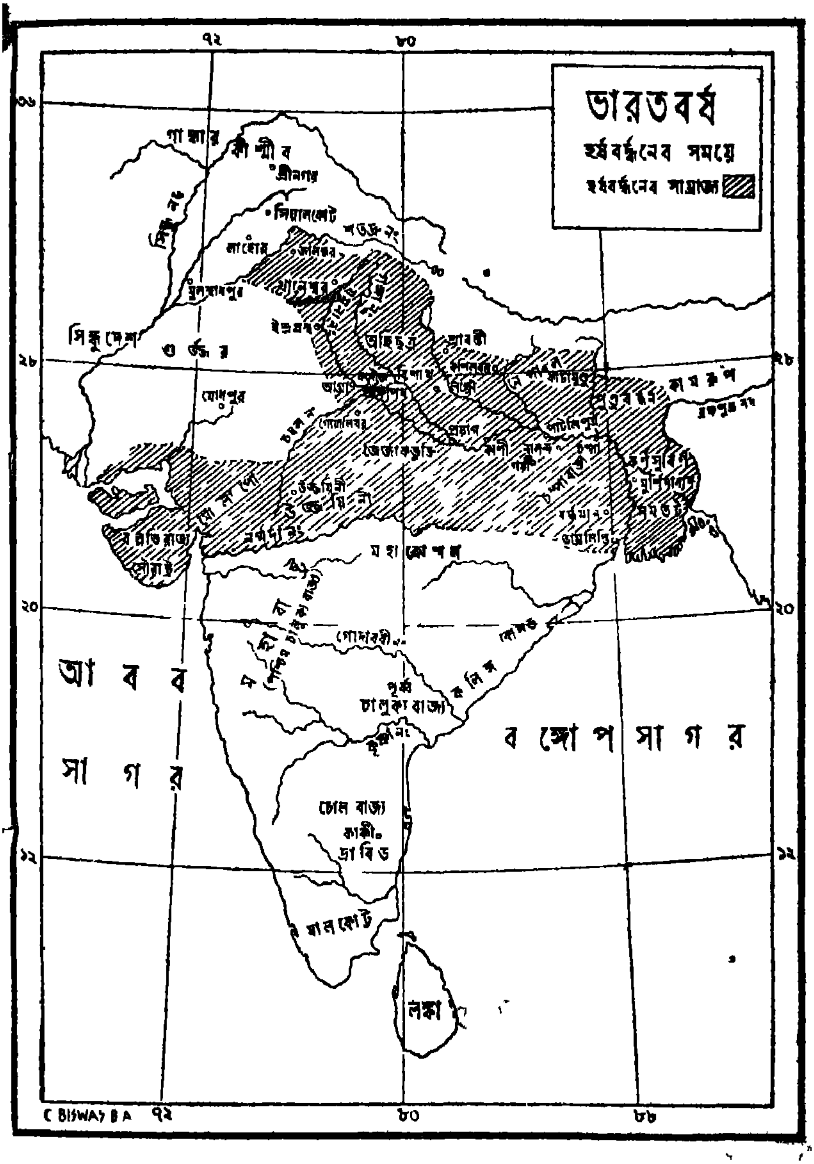

ভারতবর্ষ
হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে
হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য
কাশ্মীর
শ্রীনগর
সিয়ালকোট
লাহোর
সিন্ধুদেশ
গুর্জ্জর
যোধপুর
প্রয়াগ
কামরূপ
সৌরাষ্ট্র
মহাকোশল
গোদাবরী
কলিঙ্গ
পূর্ব্ব
চালুক্য রাজ্য
কৃষ্ণা নং
চোল রাজ্য
কাঞ্চী
দ্রাবিড়
লঙ্কা
আরব
সাগর
বঙ্গোপ সাগর
৭২
৮০
৮৮
৩৬
২৮
২০
১২
C BISWAS B A

হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি নর্মদা অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চালুক্যরাজ পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের সীমা ঠিকরূপে জানা যায় না, তবে কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু ও কামরূপ ব্যতীত সমগ্র আর্যাবর্তই তাঁহার অধীন ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। — হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য

হর্ষবর্ধন কেবল যে বিচক্ষণ রাজা ও শক্তিশালী সম্রাট্ ছিলেন, এমন নহে, তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং স্বয়ং বিশেষভাবে বিদ্যাচর্চা করিতেন। তাঁহার রাজসভায় বহু পণ্ডিত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে হর্ষচরিত ও কাদম্বরী-রচয়িতা বাণভট্টই বিশেষ বিখ্যাত। হর্ষ নিজেও কবি ছিলেন এবং তিনখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। — হর্ষবর্ধনের বিদ্যোৎসাহ

হিউ-য়েন্-সাঙের বিবরণ। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-সাঙ্ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন ভারতের একটি মনোরম বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। হিউ-য়েন্-সাঙ্ সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—যে সম্রাট্ অত্যন্ত সদাশয় ও দানশীল ছিলেন। সম্রাট্ অশোকের মত হর্ষবর্ধনও স্বয়ং রাজ্যের সমস্ত কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন, এবং সর্বদা রাজ্য পরিদর্শনের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনিও চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার ইত্যাদি বহু জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধমঠ ও ব্রাহ্মণ্য-মন্দির স্থাপিত করিয়া উহাদের ব্যয় নির্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধর্মশীল রাজা ছিলেন ও সৎলোকের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, কিন্তু অধার্মিক দুশ্চরিত্র — হর্ষবর্ধনের চরিত্র

ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। তিনি শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ত ছিলই না, বরং সকল ধর্মেই তাঁহার ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়েন। হিউ-য়েন্‌-সাঙ্‌কে সম্মান দেখাইবার জন্য তিনি কান্যকুব্জে এক বৃহৎ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় ২০ জন করদ রাজা, ৪০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ৩০০০ জৈন ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ১০০ ফুট উচ্চ এক মন্দির নির্মাণ করেন, এবং উহার ভিতর তাঁহার নিজের সমান উচ্চ এক স্বর্ণময় বুদ্ধ মূর্তি স্থাপিত করেন। প্রত্যহ প্রভাতে এক গজ উচ্চ বুদ্ধের এক স্বর্ণময় মূর্তি শোভাযাত্রা করিয়া রাজপথ দিয়া ঐ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইত। দেবরাজ ইন্দ্রের বেশ পরিধান করিয়া সম্রাট্‌ ঐ মূর্তির মস্তকে নিজ হস্তে ছত্র ধরিতেন, এবং সোনা, রূপা ও মুক্তার ফুল ও অন্যান্য রত্নরাজি ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রসর হইতেন। মন্দিরে পৌঁছিয়া সম্রাট্‌ সুগন্ধি জলে ঐ বৌদ্ধ মূর্তিকে স্নান করাইয়া সহস্র সহস্র মূল্যবান্‌ রত্ন-খচিত রেশমের বস্ত্রাদি দ্বারা উহার পূজা করিতেন। তারপর বিরাট ভোজ হইত। ভোজের পর পণ্ডিত ও ধর্মাচার্যগণকে লইয়া সম্রাট্‌ সভায় বসিতেন; সেখানে নানাবিধ ধর্মতত্ত্বের আলোচনা হইত।

তাঁহার ধর্মমত

কান্যকুব্জে মহাসভা (খ্রী)

একমাস পর্যন্ত প্রত্যহ এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইলে, শেষদিন হঠাৎ মন্দিরে আগুন লাগে, এবং এই গোলমালের সুযোগে এক আততায়ী রাজাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, যে, রাজার বৌদ্ধধর্মে বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া

[illegible] হর্ষকে হত্যা করিবার চেষ্টা

ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এবং রাজার প্রাণনাশের চেষ্টা সেই ষড়যন্ত্রের ফল।

কান্যকুব্জের উৎসব শেষ হইলে হিউ-য়েন্-সাঙকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট্ প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন। সেখানে গঙ্গা ও যমুনার সংগম-স্থলে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর রাজা একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। সমস্ত সামন্ত রাজা এই উৎসবে উপস্থিত হইতেন এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী দরিদ্র, অনাথ ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ দান-প্রাপ্তির আশায় এই স্থানে সমবেত হইত। প্রয়াগে পঞ্চ-বার্ষিক মহোৎসব (গ)

গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থলের পশ্চিমদিকে এক প্রকাণ্ড ময়দান ছিল; তাহার নাম দানক্ষেত্র বা সন্তোষক্ষেত্র। এইখানে সম্রাট্ তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য স্তূপীকৃত করিতেন এবং উহা দেবতার পূজায় ও বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন ও দরিদ্রনারায়ণকে দান করিয়া নিঃশেষ করিতেন। অবশ্য বুদ্ধের বিগ্রহ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রতি রাজার বিশেষ একটু পক্ষপাত ছিল। হর্ষের ধর্মপ্রাণতা ও দানশীলতা

এই উৎসব তিনমাসকাল ধরিয়া চলিল এবং ইহাতে রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষিত হইল। রাজা ক্রমে ক্রমে সমস্তই এমন কি, তাঁহার নিজের রাজভূষণাদিও দান করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে যখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না, তখন তিনি ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে সামান্য পরিচ্ছদ ভিক্ষা করিয়া পরিধান করিলেন এবং বুদ্ধের উপাসনায় রত হইলেন।

হিউ-য়েন্-সাঙ্ বিখ্যাত নালন্দা * বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশদ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। এশিয়ার দূর-দূরান্তর প্রদেশ হইতে

* বর্তমান পাটনা জেলার বিহার সবডিভিসনে "বড়্‌গাঁও" নামে পরিচিত আধুনিক এক গ্রামের নিকট নালন্দা অবস্থিত ছিল। এইস্থানে সম্প্রতি মাটি খুঁড়িয়া অনেক পুরাতন মন্দির, মঠ, ছাত্রাবাস প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়

ছাত্রগণ অধ্যয়নের জন্য এই নালন্দায় সমবেত হইত এবং ইহাই সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতন ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু সুরম্য হর্ম্য ছিল এবং ইহার অধ্যাপকগণ সকলেই বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এইখানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিত এবং তৎকালে প্রচলিত বিবিধ বিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ করিত।

রাজ্যশাসন-প্রণালী

রাজ্যশাসন-প্রণালীর উৎকর্ষ এবং দেশবাসীর উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিষয় চৈনিক পরিব্রাজক প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অপরাধিগণের শাস্তি কিন্তু বড় কঠোর ছিল। গুরুতর অপরাধে নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি কাটিয়া ফেলা হইত, এবং অগ্নি, জল অথবা বিষ পরীক্ষাদ্বারা অপরাধ নির্ণয়ের প্রথাও প্রচলিত ছিল। রাজার প্রাপ্য করের পরিমাণ অতি কম ছিল। কাহাকেও জোর করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটান হইত না।

যশোবর্মন। আনুমানিক ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার অর্ধশতাব্দী পরে হর্ষবর্ধনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া যশোবর্মন্ নামে কান্যকুব্জের একজন রাজা উত্তর ভারতে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন।

যশোবর্মনের সাম্রাজ্য

তিনি গৌড়দেশ (উত্তরবঙ্গ) জয় করিয়া উহার রাজাকে হত্যা করেন। তাঁহার সভাকবি বাকপতিরাজ এই ঘটনা 'গৌড়বহো' (গৌড়-বধ) নামক কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। ৭৩১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্মন্ চীন-সম্রাটের নিকট নিজের মন্ত্রীকে দূত প্রেরণ করেন।

চীনদেশে দূত প্রেরণ

কাশ্মীররাজ

ললিতাদিত্য। যশোবর্মনের গৌরব কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইল না। ৭৪২ খৃষ্টাব্দে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় নামে একজন অসাধারণ সমর-কুশল রাজা কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাংক্ষায় প্রণোদিত হইয়া তিনি প্রথমে তিব্বতীয় ও অন্যান্য পার্বত্য জাতিকে পরাজিত করেন, এবং পরে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বহুকালব্যাপী যুদ্ধের পর যশোবর্মন পরাজিত ও নিহত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য বিশাল কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। কান্যকুব্জ পদানত করিয়া ললিতাদিত্য পূর্বদিকে বিজয় যাত্রা করিলেন, এবং অনায়াসে মগধ, বঙ্গ, কামরূপ এবং কলিঙ্গ জয় করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি মালব, ও গুজরাট অধিকার করেন এবং সম্ভবত সিন্ধুদেশ বিজেতা মুসলমান ধর্মাবলম্বী আরবগণকেও যুদ্ধে পরাজিত করেন। ললিতাদিত্য তাঁহার এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যদ্বারা কাশ্মীরে মনোহর নগরাবলী নির্মাণ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে ঐ সকল নগর বিচিত্র অট্টালিকা ও দেবমন্দিরে শোভিত হইল। তাঁহার নির্মিত মন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কাশ্মীরের তৎকালীন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প যে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, ঐ ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়

যশোবর্মনের পরাজয়

ললিতাদিত্যের সাম্রাজ্য

কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির

মহাপুরুষ মুহম্মদ। এই সময় ইসলাম ধর্মের প্রভাবে এশিয়ার পশ্চিমভাগে অবস্থিত আরব দেশের অধিবাসিগণ একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। এই নূতন ধর্মের প্রবর্তক হজরৎ মুহম্মদ প্রথম জীবনে মক্কা সহরের একজন সম্ভ্রান্ত

মুহম্মদের জীবনী

বংশীয় দরিদ্র অধিবাসী মাত্র ছিলেন। পরে তিনি খাদিজা নাম্নী এক সম্পত্তিশালিনী বিধবাকে বিবাহ করিলেন। শৈশবকাল হইতেই হজরৎ মুহম্মদ নিভৃতে চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। পরিণত বয়সে তিনি যে ধর্ম্মমতের প্রচার করেন, তাহাই ইস্‌লাম নামে পরিচিত। আরব দেশে তখন ঘোর পৌত্তলিকতা বিরাজ করিতেছিল। হজরৎ মুহম্মদ এই প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন যে,—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি (মুহম্মদ) নিজে ঈশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ। প্রথমে দেশের লোক তাঁহার এমনই বিরুদ্ধবাদী হইল, যে, হজরৎ মুহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় পলাইতে বাধ্য হইলেন (৬২২খৃঃ) *; কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল এবং ক্রমে তাঁহার ধর্ম্মমত সমগ্র দেশের লোক গ্রহণ করিল। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে হজরৎ মুহম্মদের মৃত্যু হয়।

তাঁহার ধর্ম্মমত

ইস্‌লাম-শক্তির বিকাশ। নূতন ধর্ম্মমতের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ মুহম্মদ আরবজাতির মধ্যে এক নূতন জাতীয় ভাব জাগাইয়া তুলিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাহারা এক প্রবল সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল। আরব জাতির বিজয়-কাহিনী উপকথার মত আশ্চর্য। হজরৎ মুহম্মদের মৃত্যুর মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে পারস্য, সিরিয়া ও মিসর দেশ আরবের পদানত হইল, এবং তাহার পরে দেখিতে দেখিতে উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য দেশ, এমন কি, স্পেন পর্য্যন্ত বৃহৎ আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। হজরৎ মুহম্মদের পরবর্তী ইস্‌লামের নায়কগণ

* এই ঘটনা হইতেই মুসলমানগণের হিজিরা অব্দ প্রচলিত হয়।

খলিফা নামে অভিহিত। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে খলিফার সাম্রাজ্য স্পেন দেশ হইতে মধ্য-এশিয়ার অক্ষুনদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সিন্ধুদেশে আরবগণ। এই দুর্ধর্ষ আরবজাতি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগেই ভারতের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রমে তাহারা ভারতবর্ষের ধন-ধান্যপূর্ণ গ্রাম ও নগরের দিকে লুব্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে এই নবজাগ্রত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড শক্তি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। কাজেই ভারতবর্ষও ক্রমশ মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহা বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় নহে। বরং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই জয় সম্পন্ন করিতে মুসলমানগণের পাঁচশত বৎসর আবশ্যক হইয়াছিল।

জল ও স্থলপথে আরবগণ বহুবার ভারতবর্ষের অভিমুখে লুণ্ঠনাভিযান করিয়াছে; কিন্তু ৭১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। সিন্ধুদেশের দেবল নামক বন্দরে আরবগণের একখানা জাহাজ জলদস্যুগণকর্তৃক লুন্ঠিত হয়। সিন্ধুরাজ দাহরের নিকট এই বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি উত্তর করিলেন, যে, জলদস্যুগণের উপর তাঁহার কোন অধিকার বা প্রভুত্ব নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া খলিফার পূর্বপ্রদেশের শাসনকর্তা হজ্জাজ দেবল আক্রমণ করিতে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। দাহরের পুত্র এই সৈন্যদলকে হারাইয়া দিলেন। অতঃপর হজ্জাজ কাশিম-পুত্র মুহম্মদের সেনাপতিত্বে বড় একদল সৈন্য ভারতে প্রেরণ করিলেন। দাহরের সেনানায়কগণ অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিল। রাওর দুর্গের

সিন্ধুরাজ দাহর

মুহম্মদ-বিন্ কাশিমের (কাশিমের পুত্র মুহম্মদের) সিন্ধু বিজয়

নিকট দাহরের সহিত শত্রুপক্ষের ভীষণ যুদ্ধ হইল। বীরের মত যুদ্ধ করিয়া দাহর রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার বীর-মহিষী শত্রুগণের বিরুদ্ধে অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাওর দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে খাদ্য ফুরাইয়া গেল। তখন রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি এবং তাঁহার সহচরীগণ ভীষণ "জহর-ব্রতের" অনুষ্ঠানপূর্বক অগ্নিতে পুড়িয়া মরিলেন, এবং বীর যোদ্ধগণ উন্মুক্ত অসিহস্তে শত্রুমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একে একে প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে রাওর দুর্গ অধিকার করিয়া মুহম্মদ শীঘ্রই সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোর ও অন্যান্য দুর্গ ও নগরী দখল করেন।

বীরাঙ্গনা সিন্ধু রাজমহিষী

এইরূপে সিন্ধুদেশ আরবজাতির পদানত হইল; কিন্তু তাহারা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মধ্যে মধ্যে তাহারা দূরদেশে লুণ্ঠনাভিযান করিত বটে, কিন্তু তাহাদের স্থায়ী অধিকার সিন্ধুদেশেই সীমাবদ্ধ রহিল। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হাতে একবার তাহারা পরাজিত হইয়াছিল, এবং পরবর্তীকালে গুর্জর ও চালুক্যগণ তাহাদিগকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। এইরূপে ভারতের সিংহদ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াও পৃথিবীর বিজেতাগণ বহুদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই।

আরব বিজয় সিন্ধুদেশে সীমাবদ্ধ

চালুক্যগণ। এখন দাক্ষিণাত্যের কথা কিছু বলা আবশ্যক। সাতবাহনগণের পতনের পর প্রায় তিন শতাব্দীকাল ধরিয়া সেখানে কোনও প্রবল রাজশক্তির উদ্ভব হয় নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য-বংশ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিল। তাহার রাজধানী হইল—বাতাপীপুর বা বাদামী। শীঘ্রই সমস্ত দাক্ষিণাত্য

এই বংশের পদানত হইল। দ্বিতীয় পুলকেশী এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি উত্তরে এবং দক্ষিণে অনেক দেশ জয় করেন। নর্মদাকূলে তিনি উত্তরাপথের অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করিয়া মালব ও গুজরাট অধিকার করেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনকে তিনি গুরুতররূপে পরাজিত করিয়া বিজয়-বাহিনী লইয়া পল্লব রাজধানীর নিকটে পৌছিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি চোল, চের অথবা কেরল, এবং পাণ্ড্য দেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। এইরূপে পুলকেশী বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণস্থ প্রায় সমস্ত ভূ-ভাগের অধীশ্বর হইলেন। ভারতের বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে: কেহ কেহ বলেন যে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সহিত তাঁহার দূত বিনিময় হইয়াছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-সাঙ তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে পুলকেশীর ক্ষমতা ও গুণাবলী এবং তাঁহার প্রজাগণের বীরত্ব কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।

চালুক্য-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা

পুলকেশীর দিগ্বিজয়

পারস্যে দূত প্রেরণ

কিন্তু পুলকেশীর এই বিজয় খ্যাতি শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নাই। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন্ যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া চালুক্য রাজধানী লুণ্ঠন করেন (৬৪২ খৃঃ)। পুলকেশীর পুত্র বিক্রমাদিত্য চালুক্যগণের রাজ্যশ্রী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন এবং ৭৫৩ খৃঃ পর্যন্ত চালুক্যগণ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতে থাকেন। ঐ বৎসর রাষ্ট্রকূটগণ চালুক্য রাজ্য ধ্বংস করে।

পুলকেশীর পরাজয় ও মৃত্যু

পল্লবগণ। চালুক্যগণ দাক্ষিণাত্যে প্রতাপশালী হইবার পূর্বেই পল্লবগণ কাঞ্চীকে (মাদ্রাজের নিকটবর্তী কাঞ্জীভেরাম) রাজধানী করিয়া দক্ষিণ ভারতে এক রাজ্য স্থাপন করে। তাহারা

শীঘ্রই অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, এবং বর্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রায় সমস্ত স্থান জুড়িয়া তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত করে। চালুক্যগণের সহিত তাহাদের অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ হইত। মহেন্দ্রবর্মনের পরাজয় এবং নরসিংহবর্মনের বিজয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। নরসিংহবর্মনের সময়ে পল্লবগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে।

চালুক্যগণ তাহাদের রাজ্য উদ্ধার করিবার পরও এই দুই রাজ্যের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলিল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্লবগণের রাজশক্তি হ্রাস হইতে থাকে, এবং ইহার একশত বৎসর পরে চোলগণের হাতে উহা একেবারেই নির্মূল হয়।

পল্লব স্থাপত্য শিল্প

স্থাপত্য শিল্পে পল্লব-রাজগণের সবিশেষ অনুরাগ ছিল; মামল্ল-পুরের বিখ্যাত সাতটি মন্দির নরসিংহবর্মনের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই মন্দিরগুলির প্রত্যেকটি আস্ত এক একটি পাহাড় কাটিয়া তৈরি হইয়াছে।

দশম অধ্যায়

সাম্রাজ্যের জন্য দ্বন্দ্ব—রাষ্ট্রকূট, পাল এবং গুর্জর-প্রতীহার বংশ

(৭৫০ হইতে ৯৫০ খৃষ্টাব্দ)

ভারতের প্রধান শক্তিত্রয়

অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে ভাবতেব বিভিন্ন প্রদেশে তিনটি প্রবল বাজ্যেব উদ্ভব হইল। ১ দাক্ষিণাত্যেব বাষ্ট্রকূটগণ, ২ বাজপুতানাব গুর্জব-প্রতীহাবগণ এবং ৩ বঙ্গদেশেব পালগণ যথাক্রমে এই তিন বাজ্যেব স্থাপন-কর্তা। ৭৫০ খৃঃ হইতে ৯৫০ খৃঃ পর্যন্ত ভাবতেব ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে এই তিন বাজশক্তিব দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এই অন্তর্বিবাদ তিন বাজশক্তিকেই দুর্বল কবিযা ফেলিল, এবং ভাবতে মুসলমান অধিকাবেব পথ সুগম কবিযা দিল।

রাষ্ট্রকূট-বংশ। দাক্ষিণাত্যেব চালুক্যগণকে পবাস্ত কবিযা বাষ্ট্রকূটগণ বাজশক্তিব প্রতিষ্ঠা কবে। বাষ্ট্রকূট বাজধানী মান্যখেট (বর্তমানে মালখেড) বলিযা পবিচিত এবং উহা নিজামেব বাজ্যে অবস্থিত। মহাবাজ ধ্রুবেব সময বাষ্ট্রকূটগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হইযা উঠে এবং উত্তবদিকে বিজযযাত্রা কবিযা গুর্জবগণকে পবাজিত করে। ধ্রুবেব পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জবদেশ অধিকাব কবিযা বিজয-বাহিনী লইযা হিমালয পর্যন্ত অগ্রসব হন। বঙ্গদেশে পালদেব অভ্যুত্থানে বাষ্ট্রকূটগণ উত্তব ভাবতে আব অধিক প্রতিপত্তি লাভ কবিতে পাবিল না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাহাবা দশম শতাব্দীব মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবল বাজশক্তিরূপে বর্তমান ছিল। পরে এক নূতন চালুক্য-বংশ তাহাদেব স্থান অধিকাব কবে।

রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুব

তৃতীয় গোবিন্দ

বঙ্গদেশের পালবংশ। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। পরবর্তী গুপ্তগণ কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশ অধিকার করেন। পরে উহা যশোবর্মন্, ললিতাদিত্য ইত্যাদি বৈদেশিক রাজগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ বিজিত হয়। বার বার এইরূপে বিদেশীয়গণ কর্তৃক পদদলিত হওয়ায় বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, এবং দেশময় অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। সমগ্র দেশের কোনও রাজা ছিল না, পরন্তু দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারা কেহ কাহাকেও মানিত না এবং সর্বত্রই প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিত।

বঙ্গদেশে অরাজকতা

এই দুর্দশা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বঙ্গবাসিগণ একত্র হইয়া গোপাল নামক একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সমগ্র দেশের রাজা নির্বাচিত করিল। গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিলেন, এবং বঙ্গদেশকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিলেন। স্বীয় তনয় ধর্মপালের হস্তে রাজ্য প্রদান করিয়া তিনি যখন পরলোক গমন করিলেন, তখন বঙ্গদেশ আবার ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল।

গোপালের রাজপদে নির্বাচন

ধর্মপাল পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি তাঁহার বিজয়-বাহিনী লইয়া দিগ্‌দিগন্তরে বঙ্গের প্রতিপত্তি বিস্তার করিলেন। আর্যাবর্তের অধিকাংশ রাজ্যই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া, তিনি তাঁহার নিজের নির্বাচিত চক্রায়ুধকে সেই সিংহাসন প্রদান করিলেন। কান্যকুব্জে তিনি এক মহাসভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি

পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল

রাজ্যের সামন্ত রাজন্যবর্গ উপস্থিত থাকিয়া পালরাজকে সম্রাটের মহিমায় ভূষিত করিয়াছিলেন। এইরূপে ধর্মপাল সমগ্র আর্যাবর্তে এক বিশাল বঙ্গ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাঙলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইহার পূর্বে বা পরে আর কখনও বাঙালি জাতি রাজনীতি-ক্ষেত্রে এরূপ প্রভাব বা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। কান্যকুব্জে মহাসভা

বিশাল বঙ্গ-সাম্রাজ্য

সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিয়া ধর্মপাল পরলোকগমন করিলে, তৎপুত্র দেবপাল বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দেবপাল গুর্জর ও হূনগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং উৎকল ও কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় সমস্ত আর্যাবর্তে তাঁহার অক্ষুণ্ণ অধিকার ছিল। দেবপাল ৩৯ বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করেন, এবং তাঁহার খ্যাতি ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দা মহাবিহারে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন এবং দেবপালদেবের নিকট দূত প্রেরণ করেন। বালপুত্রদেবের অনুরোধে এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থ দেবপালদেব পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করেন।

৩ দেবপাল

দেবপালের সাম্রাজ্য

দেবপালের সঙ্গে সঙ্গে পালবংশের পূর্ণগৌরবের দিন শেষ হইল। দেবপালদেবের বংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগে গুর্জরগণ আর্যাবর্তে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে পাল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল; কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পরও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রায় তিনশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে ও মগধে রাজত্ব করেন।

দেবপালের পরে পালবংশের অবনতি

গুর্জর-প্রতীহার বংশ। গুর্জরগণ সম্ভবত হূনগণের সহিত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। গুর্জর জাতি নানা শাখায় বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রতীহারগণই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রতীহারগণ সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই মালব ও রাজপুতানায় স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মালবের প্রতীহার-রাজ সিন্ধুদেশ-বিজয়ী আরবগণকে বাধা প্রদান করিয়া শক্তিশালী হন। তাঁহার পরে বৎসরাজ এবং নাগভট নামক আরও দুইজন রাজা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। উভয়েই অনেক দেশ জয় করেন, কিন্তু রাষ্ট্রকূটগণেব হস্তে পরাজিত হওয়ায় কেহই কোনও স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রতীহার-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ভোজ

পূর্বদিকে পালগণের সহিতও প্রতীহারগণের সর্বদা দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশ হীনবল হইয়া পড়ে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবল পরাক্রান্ত প্রতীহার-রাজ ভোজ নানা দেশ জয় করিয়া প্রতীহার-বংশের সৌভাগ্য ফিরাইয়া আনিলেন।

মহেন্দ্রপাল

প্রতীহার সাম্রাজ্য

ভোজ এবং তাঁহাব পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে প্রতীহার-রাজশক্তি গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিল এবং প্রতীহার-রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহাদের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরীও তৎকালে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিন্তু মহেন্দ্রপালের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীহার-গৌরবরবি অস্তমিত হইল।

প্রতীহার-বংশের পতন

মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র প্রতীহার-রাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাব রাজধানী কান্যকুব্জ লুণ্ঠন করিলেন (৯১৬ খৃঃ)।

মহীপাল

মহীপাল শীঘ্রই নিজের রাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু প্রতীহার-বংশের পূর্ব গৌরব আর ফিরিল না।

প্রতীহার-বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। প্রতীহার-বংশের প্রভুত্ব কেবল কান্যকুব্জ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূ-ভাগেই সীমাবদ্ধ রহিল। প্রতীহার-রাজ্যের ধ্বংসের ফলে যে সমস্ত নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে চন্দেল্ল রাজ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চন্দেল্ল-বংশ। বর্তমান বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ পূর্বকালে জেজাকভুক্তি নামে বিখ্যাত ছিল। নবম শতাব্দীতে সেখানে চন্দেল্লগণ এক রাজ্য স্থাপন করে। তাহারা প্রথমে প্রতীহারগণের অধীনে ছিল। কিন্তু চন্দেল্লরাজ যশোবর্মন্ প্রতীহারের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বহু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং কালঞ্জর পর্বত অধিকার করেন। এই কালঞ্জর পর্বত অতঃপর তাঁহার রাজ্যের দুর্ভেদ্য কেন্দ্র হইয়াছিল। যশোবর্মনের পুত্র ধঙ্গের রাজত্বকালে চন্দেল্লগণ দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল। ধঙ্গ কান্যকুব্জের প্রতীহার রাজাকে পরাজিত করিয়া নিজের রাজ্যের সীমা অনেক বাড়াইয়া ফেলিলেন। দশম শতাব্দীর শেষার্ধব্যাপী তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বে ধঙ্গ কাশী পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। উত্তরে যমুনানদী ও উত্তর-পশ্চিমে গোয়ালিয়র পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। চন্দেল্লরাজগণ শিল্পানুরাগী ছিলেন। অনেক সুন্দর মন্দির, কৃত্রিম হ্রদ ও বড় বড় বাঁধ আজও তাঁহাদের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

যশোবর্মন্

ধঙ্গ

চন্দেল্লরাজগণের কীর্তি।

অন্যান্য রাজ্য। চন্দেল্ল-বংশের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীহার-সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল। জব্বলপুরের নিকটস্থ

কলচুরি ভূ-ভাগে কলচুরিগণ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশের রাজা লক্ষ্মণরাজ নানা দেশ জয় করিয়া কলচুরি রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিলেন। প্রায় এই

চৌলুক্য সময়েই চৌলুক্য-বংশীয় মূলরাজ গুজরাট ও রাজপুতানার কিয়দংশ লইয়া এবং অনহিলবারাকে রাজধানী করিয়া এক রাজ্য স্থাপিত

শাহী করিলেন। পশ্চিমে কাবুলের শাহী-বংশীয় রাজা জয়পাল পূর্বদিকে (অধুনা লুপ্ত) হক্রা নদী পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিলেন। প্রতীহার-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর আরও কয়েকটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মালবের পরমার-

পরমার রাজ্য এবং শাকম্ভরী ও আজমীরের চৌহান-রাজ্যই সমধিক

চৌহান প্রসিদ্ধ।

একাদশ অধ্যায়

সুলতান মামুদ

আলপ্‌তিগীন প্রতিষ্ঠিত গজনীর রাজ্য

গজনীর রাজ্য। ভারতবর্ষ যখন এইরূপ রাজনৈতিক বিপ্লবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন আলপ্‌তিগীন্ নামে সামানি রাজ্যের উচ্চপদস্থ এক তুরস্কজাতীয় ক্রীতদাস গজনীকে কেন্দ্র করিয়া সুলেমান পর্বতে এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পর আঃ ৯৭৭ খৃঃ সবুক্তিগীন্ নামে তাঁহার তুরস্কজাতীয় এক ক্রীতদাস এই রাজ্য লাভ করেন। সবুক্তিগীন্ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন।

জয়পাল ও সবুক্তিগীনের যুদ্ধ

জয়পাল। শাহী-বংশীয় রাজা জয়পালের রাজ্য এই সময়ে কাবুল হইতে হক্রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সবুক্তিগীনের ভারত অভিযানে বিচলিত হইয়া জয়পাল এই নূতন রাজ্য আক্রমণ করিলেন। গজনী ও জালালাবাদের মধ্যে দুই রাজ্যের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। কিন্তু রীতিমত যুদ্ধ হইবার পূর্বেই একদিন এমন ভয়ংকর তুষারপাত ও ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে, জয়পালকে সবুক্তিগীনের সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল। নিজ রাজ্যে ফিরিয়া কিন্তু জয়পাল এই সন্ধি অস্বীকার করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সবুক্তিগীন্ জয়পালের রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জয়পাল বহুদিন হইতে এই মুসলমান আক্রমণের আশংকায় চিন্তিত ছিলেন। এই আশংকা যখন সত্যে

পরিণত হইতে চলিল, তখন এই বিপদের গুরুত্ব তিনি সম্যক্‌রূপেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মুসলমানদিগকে বাধা দিয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে তিনি ভারতের রাজন্যবর্গকে আহ্বান করিলেন। কান্যকুব্জরাজ, চৌহান-রাজ এবং চন্দেল্ল-রাজ প্রভৃতি সকলেই এই আহ্বানে জয়পালের সহিত মিলিত হইলেন।

সবুক্তিগীনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভারতীয় রাজন্য-বর্গের অভিযান

এই সম্মিলিত ভারতীয় রাজন্যবর্গ আফগানিস্থানে মুসলমান সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। স্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভারতীয় সৈন্যদল পরাজিত হইল এবং সবুক্তিগীন্‌ সিন্ধুনদ পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ অধিকার করিয়া লইলেন (৯৯১ খৃঃ)।

ভারতবাসীর পরাজয়

সুলতান মামুদ। ৯৯৭ খৃঃ সবুক্তিগীন্‌ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র ইসলাম গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মামুদ তাহাকে দূরীভূত করিয়া গজনীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। মামুদ সামানি-রাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া, স্বাধীন নরপতির চিহ্নস্বরূপ 'সুলতান' এই পদবী গ্রহণ করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ

সুলতান মামুদ এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর-কুশল সেনাপতি ছিলেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সিন্ধু হইতে পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগের অধিপতি মামুদ তাঁহার পিতার প্রবর্তিত ভারত-লুণ্ঠন-নীতি আরও ব্যাপকভাবে অনুসরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

১০০১ খৃঃ অব্দে দশ সহস্র সমর-কুশল অশ্বারোহী লইয়া তিনি ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধ রাজা জয়পাল বর্তমান পেশবারের নিকট তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন; কিন্তু যুদ্ধে

পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। করদান করিতে স্বীকৃত হইয়া জয়পাল মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু আর এই অপমান সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি জীবন্তে চিতায় আরোহণ করিয়া স্বহস্তে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া পুড়িয়া মরিলেন।

জয়পালের পরাজয় ও মৃত্যু

সুলতান মামুদের ভারত অভিযান

ইহার পর সুলতান মামুদ প্রায় প্রতিবৎসর প্রবল ঘূর্ণী বাত্যার মত আসিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারত লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করিতে লাগিলেন। এক এক বৎসর এক একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া তিনি যাত্রা করিতেন। ঐ স্থানের সমস্ত মন্দির ও দেব-বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া চূরমার করিতেন, এবং তথা হইতে অপরিমেয় ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

ভেরা

১০০৪ খৃঃ অব্দে মামুদ সিন্ধুনদ পার হইয়া ঝিলামের তীরবর্তী ভেরা নামক নগরী আক্রমণ করিলেন। রাজা বিজিরায় অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মামুদের অবস্থা শংকটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে সুলতান মামুদের জয় হইল এবং তিনি ঐ রাজ্য অধিকার করিলেন। পর বৎসর তিনি মুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

মুলতান

মুলতানের রাজা এই বিপদে জয়পালের পুত্র রাজা আনন্দপালের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। আনন্দপাল মামুদকে তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। সুলতান মামুদ আনন্দপালের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সহজেই মুলতান অধিকার করিলেন। তিন বৎসর পর আনন্দপালের হঠকারিতার শাস্তি বিধানের জন্য বিরাট একদল সৈন্য লইয়া তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন (১০০৮ খৃঃ অঃ)।

আনন্দপাল। দেশের এবং ধর্মের এই ঘোর বিপদের দিনে ভারতবাসী যে নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহা নহে। (আনন্দপাল পশ্চিম এবং মধ্য-ভারতের রাজন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সুলতান মামুদকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। নিজেদের ধর্ম ও দেশ রক্ষার্থে ভারতবাসীরা পূর্বে আর কখনও সকলে মিলিত হইয়া এইরূপ বিপুল উদ্যম করে নাই।) এই স্বাধীনতার সংগ্রামে সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, প্রত্যেক দিন দূর দূরান্তর হইতে সৈন্যদল আসিয়া হিন্দুপক্ষের বলবৃদ্ধি করিতে লাগিল এবং হিন্দুরমণীগণ নিজেদের অলংকার-রাশি বিক্রয় করিয়া বা গালাইয়া এই ধর্মযুদ্ধের ব্যয়নির্বাহার্থ অর্থ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে প্রথম হিন্দু সৈন্যেরই জয়ের সম্ভাবনা দেখা গেল। কিন্তু যে হস্তীর উপর থাকিয়া হিন্দু সেনাপতি * যুঝিতেছিলেন, সহসা সে ভয় পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। সেনাপতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখিতে পাইয়া হিন্দু সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময় মামুদ সবেগে আক্রমণ করিলেন এবং হিন্দুসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। (হিন্দু সৈন্যের অগণ্য সংখ্যা, অতুল বীরত্ব সমস্তই সেনাপতির সুব্যবস্থা ও সমর-কুশলতার অভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল।)

মিলিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের সুলতানমামুদকে বাধাপ্রদান

ভারতীয় সৈন্যের পরাজয়

অতঃপর সুলতান মামুদ অগ্রসর হইয়া নগরকোট (বর্তমান কাংড়া) লুণ্ঠন করিলেন। নগরকোট রক্ষা করিবার তখন আর কেহ ছিল না। মামুদ অনায়াসে সাতলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা, সাতশ মন স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, দুইশ মন বিশুদ্ধ স্বর্ণ, দুই হাজার মন রৌপ্য

নগরকোট

* সম্ভবত আনন্দপাল স্বয়ং কিন্তু এবিষয়ে মতভেদ আছে।

এবং ২০ মন মুক্তা, প্রবাল, হীরক ইত্যাদি রত্ন লইয়া প্রস্থান করিলেন।* কিছুদিন পরে বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়া আনন্দপাল সুলতান মামুদের সহিত সন্ধি করিলেন।

সুলতান মামুদের ভারত অভিযান। ইহার পর সুলতান মামুদ তাঁহার বাৎসরিক ভারত অভিযানে, বলিতে গেলে, বিশেষ কোনও বাধাই প্রাপ্ত হন নাই। তিনি সতর বার ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সমস্ত-গুলির একই ইতিহাস—হত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংস ও দেবমন্দির চূর্ণ করা। কান্যকুব্জের বিরুদ্ধে তিনি দুইবার অভিযান করেন এবং পথে মথুরা নগরী ধ্বংস করেন। প্রতীহার-রাজ মামুদের অধীনতা স্বীকার করেন। মুলতান ও থানেশ্বর নগরীর বিরুদ্ধেও সুলতান মামুদ অভিযান করেন এবং ঐ সমুদয় নগর লুণ্ঠন করেন। চন্দেল্ল-রাজ প্রথমে বীরত্বের সহিত মামুদকে বাধা প্রদান করেন; কিন্তু পরে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়া মামুদের সহিত শান্তিস্থাপন করেন। আনন্দপালের উত্তরাধিকারী ত্রিলোচন পাল মামুদকে বাধা দিতে যাইয়া পরাজিত হইলেন। মামুদ পঞ্জাব স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন (১০২১-২২ খৃঃ অঃ)।

কান্যকুব্জ মথুরা

পঞ্জাব অধিকার

গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনই মামুদের সর্বশেষ বিখ্যাত অভিযান (১০২৪ খৃঃ অঃ)। হিন্দুগণ অশেষ বীরত্বের সহিত দুই দিন পর্যন্ত মুসলমান সৈন্যকে পরাভূত করিয়া নগর রক্ষা করিল।

---

* ঐতিহাসিক ফিরিস্‌তার এই উক্তি সম্ভবত অতিরঞ্জিত। 'মন' বলিতে ফিরিস্‌তা ঠিক কি ওজন বুঝিয়াছিলেন বলা যায় না। আরব ও পারস্যের নানা স্থানে এক সের হইতে আরম্ভ করিয়া চারি সেরেও মন হয়। ভারতবর্ষে ৪০ সেরি মনই প্রসিদ্ধ।

সোমনাথ-লুণ্ঠন

গুজরাটের রাজা এবং অন্যান্য স্থানীয় ভূস্বামিগণ যোগ দেওয়ায় তৃতীয় দিনের যুদ্ধে মুসলমান সৈন্য প্রায় পরাজিত হইতেছিল, কিন্তু সুলতান মামুদের অদ্ভুত সাহস ও রণকৌশলে হিন্দুদেরই পরাজয় ঘটিল।

সোমনাথ অভিযানে অপরিমেয় ধন-রত্ন সুলতানের হস্তগত হইল। পূর্বে আর কোনও অভিযানে তিনি এত ঐশ্বর্য হস্তগত করিতে পারেন নাই।

পারস্য বিজয়

অতঃপর সুলতান মামুদ পশ্চিমদিক্ জয়ে মনোনিবেশ করিলেন, এবং পারস্যদেশের অধিকাংশ জয় করিয়া কাস্পিয়ান হ্রদ পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত করিলেন। এই গৌরবময় বিজয়ের অব্যবহিত পরে ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ গজনীতে প্রাণত্যাগ করেন।

সামরিক প্রতিভা

সুলতান মামুদের চরিত্র। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমর-কুশল সেনাপতিদের মধ্যে সুলতান মামুদের স্থান যে অতি উচ্চে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! তাঁহার অদম্য সাহস, বিপদে ধৈর্য, অসাধারণ সমর-কুশলতা ইত্যাদি বিবিধ গুণরাজি সর্বতোভাবে সম্মানার্হ এবং প্রশংসনীয়। তিনি স্বীয় রাজ্যে শিল্প ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন এবং রাজধানী গজনীকে সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের পক্ষ হইতে বলিতে গেলে আলেকজাণ্ডার, তৈমুরলঙ্গ, নাদিরশাহের ন্যায় তাঁহাকেও একজন নিষ্ঠুর আক্রমণকারী ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। ভারতবাসীরা তাঁহার হাতে অশেষ দুর্গতি ও

নৃশংসতা

নিগ্রহ সহ্য করিয়াছিল, এবং অসংখ্য মন্দির ও দেব-মূর্তি ধ্বংস

করিয়া তিনি এই ধর্মপ্রাণ জাতির হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ধন-লিপ্সার আর অন্ত ছিল না। তাঁহার ভারতাভিযানগুলির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ধনলুণ্ঠন এবং তাঁহার আক্রমণের ফলে ভারতের অসীম ধনরত্ন বিদেশে চলিয়া যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

হিন্দু স্বাধীনতার শেষযুগ

রাজপুত রাজ্যসমূহ। সুলতান মামুদের আক্রমণে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইয়া গেল। ইহার পরেই ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইল। ইহারা সর্বদাই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে মত্ত থাকিত। ফলে শীঘ্রই এমন একদিন আসিল যখন সমস্তগুলিই এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটির বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

কনৌজ। সুলতান মামুদের কান্যকুব্জ অভিযানের ফলে প্রতীহার-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে গাহড়বাল-বংশীয় চন্দ্রদেব কনৌজে নূতন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন।

গাহড়বাল-বংশ চন্দ্রদেব

এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মহারাজাধিরাজ গোবিন্দচন্দ্র প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং মগধ পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র মহারাজাধিরাজ জয়চন্দ্র ১১৭০ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে ইনি তৎকালীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র

জয়চন্দ্র

বঙ্গদেশ। পালগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে বহিঃশত্রুর আক্রমণে তাঁহাদের অশান্তি ঘটিতেছিল। দশম শতাব্দীর শেষভাগে কাম্বোজগণ পালরাজ্য অধিকার করিল; কিন্তু মহীপাল (আঃ খৃঃ ৯৮০ হইতে ১০৩০ খৃঃ) পৈতৃক রাজ্যের

কাম্বোজ অধিকার

পুনরুদ্ধার করিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল পাল-রাজ্য আক্রমণ করেন। মহীপাল চোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বদেশরক্ষা-পূর্বক অতুল গৌরবের অধিকারী হইলেন। তিনি কাশী পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজ্যকালে লাহোরের মুসলমান শাসনকর্তা বারাণসী আক্রমণ করেন কিন্তু পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কলচুরি রাজ কর্ণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু অবশেষে নয়পালই জয় লাভ করেন। তিনি দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে (অতীশ) বিক্রমশিলা বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতীশ তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন করেন। নয়পালের পৌত্র দ্বিতীয় মহীপাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা তৃতীয়পাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে। এই বিদ্রোহের নায়ক দিব্বোক অথবা দিব্য কৈবর্ত জাতীয় ছিলেন এবং তিনি, তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুকাল বরেন্দ্র অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করেন। মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল পৈতৃক সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু পাল-রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি আর ফিরিল না।

মহীপাল

প্রজা বিদ্রোহ

সেন রাজবংশ। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সেন উপাধিধারী এক নূতন রাজবংশ বাঙলা দেশে রাজত্ব করেন। ইঁহারা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং প্রথমে রাঢ় দেশে (বর্তমান বর্ধমান বিভাগ) অধিকার স্থাপন করেন। এই বংশের প্রথম

সেনবংশের উত্থান

বিজয়সেন

উল্লেখযোগ্য রাজা বিজয়সেন পালরাজাকে পরাজিত করিয়া প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। বিজয়সেনের বিজয় কামরূপ, মিথিলা ও কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্ভবত তিনি মগধেরও কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। পালরাজবংশের কোন নরপতি সম্ভবত তখনও মগধের এক অংশে রাজত্ব করিতেন। বিজয়সেনের পরে তাঁহার পুত্র বল্লালসেন এবং তৎপরে বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করেন। লক্ষ্মণসেনের সময়ে বঙ্গরাজ্যের সীমা দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেনবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট সামাজিক বিধানের প্রচলন হয়। এই সকল বিধান বঙ্গদেশে এখনও চলিতেছে।

বল্লালসেন

লক্ষ্মণসেন

সেনরাজ্যের বিস্তৃতি

মধ্যভারত। মধ্যভারতের রাজগণের মধ্যে কলচুরি এবং চন্দেল্লগণই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কলচুরি-বংশে গাঙ্গেয়দেব একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র মহারাজাধিরাজ কর্ণ এই বংশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিশেষরূপে বাড়াইয়া তোলেন। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে চন্দেল্ল-রাজ কীর্তিবর্মন্ কর্ণকে পরাজিত করেন। চন্দেল্লগণের ক্ষমতা আরও এক শতাব্দী কাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

কলচুরি-বংশ

চন্দেল্ল-বংশ

মালব। নবম শতাব্দীতে ধারা নগরীকে রাজধানী করিয়া পরমারগণ মালবে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ভোজ। ১০১৮ খৃঃ ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ৪০ বৎসর ব্যাপী গৌরবময় সুদীর্ঘ রাজত্বের কাহিনী লইয়া ভারতে এখনও অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। জন-প্রবাদ মতে ভোজ আদর্শ রাজা ছিলেন। বিদ্বান্‌গণ সর্বদা

ভোজ

আদর্শ রাজা

তাঁহার রাজসভায় সমাদৃত হইতেন, এবং তিনি নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। সরস্বতীর এক মন্দির স্থাপিত করিয়া, তাহার প্রাঙ্গণে তিনি এক বিপুল বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বিদ্যামন্দিরে স্থাপত্য, জ্যোতিষ, কাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। কলচুরিরাজ কর্ণদেবের হস্তে তিনি পরাজিত হন এবং তাঁহার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পরমার-বংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হয়।

বিদ্যোৎসাহী

তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির

গুজরাট। ভোজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কর্ণদেব গুজরাটের চৌলুক্য-রাজের সহায়তা পাইয়াছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, যে, এই চৌলুক্য (সোলাংকি) রাজ্য দশম শতাব্দীতে মূলরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই রাজ্যের রাজধানী অনহিলবারা শীঘ্রই একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইল, এবং এই বংশের রাজগণ সুলতান মামুদ এবং অন্যান্য মুসলমান আক্রমণ-কারীর সহিত যুদ্ধ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত এই বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গুজরাটের চৌলুক্য-বংশ

আজমীর। সুলতান মামুদের তিরোধানের পরে ভারতবর্ষে যে সমস্ত রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে আজমীরের চাহমান বা চৌহান-বংশই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, এবং এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন পৃথ্বীরাজ।

চাহমান-বংশ

পৃথ্বীরাজ চন্দেল্লগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজধানী মহোবা অধিকার করেন (১১৮২ খৃঃ অঃ)। পৃথ্বীরাজই তৎকালে আর্য্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া গণ্য হইতেন। গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্র কিন্তু পৃথ্বীরাজের চিরশত্রু ছিলেন, এবং এই দুই রাজার বিবাদের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়।

পৃথ্বীরাজ

পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের বিবাদ

কি কারণে উভয় রাজার মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে নিকটবর্তী দুই শক্তিশালী রাজার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ঘোররাজ্য। কিন্তু কেবল জয়চন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই পৃথ্বীরাজের যশের কারণ নহে। ঘোর রাজ্যের মুসলমান আক্রমণকারিগণের সহিত যুদ্ধেই তিনি চিরস্মরণীয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। হিরাটের পূর্বদিকস্থ একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য দেশের নাম ঘোর। সুলতান মামুদ এই দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং ইহা গজনী রাজ্যের অধীনে ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুই রাজ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল, এবং উভয় পক্ষদ্বারাই অশেষবিধ নিষ্ঠুরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অবশেষে গজনীরাজ বেহ্‌রাম ঘোররাজের হস্তে পরাজিত হইলেন। ঘোররাজ গজনী দখল করিলেন এবং তারপর সাতদিন ধরিয়া অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে গজনী নগর বিধ্বস্ত করিলেন। ভারতের লুণ্ঠিত ধন-সম্পদদ্বারা সুলতান মামুদ যে নগরীকে অসীম সম্পদে ভূষিত করিয়াছিলেন, এইরূপে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

ঘোর ও গজনী রাজ্যের বিবাদ

পরাজিত গজনীর রাজা বেহ্‌রামের পুত্র খুসরু মালিক তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত পঞ্জাব প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ঘোররাজ্যের সহিত শত্রুতার অবসান হইল না। কিছুদিন পরে ঘিয়াসুদ্দিন ঘোরী ঘোররাজ্যের রাজা হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মুহম্মদ-বিন্‌-সামকে (ইনি শিহাবুদ্দিন ঘোরী এবং মুইজুদ্দিন ঘোরী নামেও পরিচিত) কাবুল ও গজনীর সুলতান পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজ্যের পূর্বভাগ শিহাবুদ্দিনের হস্তে ন্যস্ত

ঘিয়াসুদ্দিন ঘোরী

শিহাবুদ্দিন ঘোরী

হওয়ায় স্বভাবতই তাহার লোলুপ দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর পড়িল। তিনি পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং মুলতান ও উচ্ অধিকার করিলেন। কিন্তু সেখান হইতে গুজরাট আক্রমণ করিতে যাইয়া চৌলুক্যরাজ কর্তৃক গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। অতঃপর তিনি সিন্ধুদেশ জয় করিলেন এবং আঃ ১১৮৬ খৃঃ অঃ গজনী বংশের শেষ রাজা খুসরু মালিকের নিকট হইতে পঞ্জাব কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইলেন। খুসরু মালিককে কিছুদিন বন্দী অবস্থায় রাখিয়া নিহত করা হইল।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ। পঞ্জাব অধিকার করায় ঘোরী-রাজ্য পৃথ্বীরাজের রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং এই দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল। পৃথ্বীরাজ অন্যান্য হিন্দুরাজগণের সহিত মিলিত হইয়া শিহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ১১৯১ খৃঃ তরাইন বা তলাবাড়ী নামক স্থানে দুই পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর শিহাবুদ্দিন আহত হইয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার এক অনুচর অতিকষ্টে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া গেল; ইহাতে শিহাবুদ্দিনের সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। পৃথ্বীরাজ সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়া মুসলমান সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন।

পৃথ্বীরাজের বিজয়

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ। শিহাবুদ্দিন এই দারুণ অপমান ভুলিতে পারিলেন না। প্রতিশোধ লইবার জন্য মধ্য-এশিয়ার দুর্ধর্ষ পার্বত্য অধিবাসিগণকে লইয়া তিনি এক বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করিলেন, এবং পর বৎসরই আবার ভারতবর্ষ

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবার সেই তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। হিন্দু জাতির এই ঘোর বিপদের সময় ভারতের অন্যান্য রাজগণও কর্তব্য-প্রণোদিত হইয়া পৃথ্বীরাজের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধের পূর্বে শিহাবুদ্দিনকে নিজদেশে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া একখানা পত্র লিখিলেন। মুসলমান সেনাপতি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, যে, তিনি ভ্রাতার প্রতিনিধি মাত্র,—সুতরাং এই বিষয়ে ভ্রাতার আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেছেন।

পৃথ্বীরাজের প্রথম জয়লাভ

এইরূপে হিন্দুগণের সন্দেহ দূর করিয়া, তিনি একদিন অতর্কিতভাবে সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে হিন্দুগণকে আক্রমণ করিলেন। হিন্দু সৈন্যদলে প্রথমে বিষম হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে শৃংখলা স্থাপিত হইলে পর, হিন্দু সৈন্যগণ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। তখন শিহাবুদ্দিন নিজের সৈন্য পাঁচ ছয় দলে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেককে উপদেশ দিলেন, যে, তাহারা প্রবলবেগে হিন্দু সৈন্যের সহিত যুঝিয়া কিছুক্ষণ পরে পলাইবার ভাণ করিয়া পশ্চাৎপদ হইবে। তারপর আর একদল সৈন্যও ঠিক ঐরূপে হিন্দু সৈন্য আক্রমণ করিয়া পলায়নের ভাণ করিবে। এইরূপে সারাদিন ভীষণ যুদ্ধের পর মুসলমানগণ হটিতেছে ভাবিয়া, হিন্দু সৈন্য সমস্ত শৃংখলা ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া মুসলমানের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। শিহাবুদ্দিন হটিতেছিলেন বটে, কিন্তু নিজের সৈন্যদলের সম্পূর্ণ শৃংখলা বজায় রাখিয়াছিলেন। যেই তিনি দেখিলেন হিন্দু সৈন্যের শৃংখলা নষ্ট হইয়াছে, অমনি বার হাজার বাছাই অশ্বারোহী সেনা লইয়া তিনি হিন্দুগণকে আক্রমণ করিলেন। হিন্দুগণ সম্পূর্ণরূপে

পবাজিত হইয়া পলায়ন কবিল। বহু হিন্দু সেনানায়ক সেইদিন বণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ কবিল। পৃথ্বীবাজ বন্দী ও অবশেষে নিহত হইলেন। পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু

মুসলমান বিজয়। পৃথ্বীবাজ নিহত হইলে শিহাবুদ্দিন অগ্রসব হইযা আজমীব অধিকাব কবিলেন, এবং একজন হিন্দুকে কবদ বাজারূপে উহাব শাসনকর্তা নিযুক্ত কবিলেন। আজমীর বিজয় অতঃপব শিহাবুদ্দিন গজনীতে ফিবিয়া গেলেন ; কিন্তু তাঁহাব ভাবতবর্ষীয প্রতিনিধি কুতবুদ্দিন আইবেক শীঘ্রই দিল্লী এবং অন্যান্য স্থান জয কবিযা ফেলিলেন। পব বৎসব শিহাবুদ্দিন নিজে আসিযা কনৌজেব বাজা জয়চন্দ্রকে চন্দাবাবেব যুদ্ধে পবাজিত এবং নিহত কবিলেন। দিল্লী চন্দাবারের যুদ্ধ কনৌজ এইরূপে বাবাণসী পযন্ত ইস্লামেব জয-পতাকা উড্ডীন হইল। তখন বিহাবে একজন পালবংশীয বাজা এবং বঙ্গদেশে লক্ষ্মণসেন বাজত্ব কবিতেছিলেন ; বক্তিযাবেব পুত্র মুহম্মদ খিলজী তাঁহাদিগকে পবাজিত কবিযা বিহাব এবং পশ্চিম ও উত্তব বঙ্গ জয কবিলেন। বঙ্গ ও বিহার এইরূপে আসামেব সীমা পর্যন্ত মুসলমান বাজ্য বিস্তৃত হইল। কিন্তু দক্ষিণ দিকে অগ্রসব হইতে গিযা কুতবুদ্দিন গুজবাটেব চৌলুক্যবাজেব হস্তে পবাজিত হইলেন। গুজরাটের স্বাধীনতা চৌলুক্য-বাজ অগ্রসব হইযা আজমীব অববোধ করিলেন এবং গজনী হইতে কুতবুদ্দিনেব সাহায্যার্থে সৈন্য আসিলে উভয পক্ষে আবাব যুদ্ধ আবম্ভ হইল। এইবাব কুতবুদ্দিন অগ্রসব হইযা চৌলুক্য-বাজেব বাজধানী অনহিলবাবা অধিকাব কবিলেন ; কিন্তু সমগ্র গুজবাট বাজ্য অধিকৃত হইল না। কলচুবি এবং চন্দেল্লগণ কুতবুদ্দিন কর্তৃক সম্পূর্ণ পবাজিত হইল এবং শুধু মালবেব পবমাবগণই স্বাধীনতা বজায রাখিতে সমর্থ হইল। চন্দেল্ল ও কলচুরি বিজয় এইরূপে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের

পর পনর বৎসরের মধ্যে কাশ্মীর, গুজরাট, মালব এবং পূর্ববঙ্গ ভিন্ন প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত মুসলমানদের করতলগত হইল। পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ ও অন্যান্য হিন্দুরাজগণ আরও প্রায় শতাব্দীকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শিহাবুদ্দিন ঘোরী ভ্রাতার মৃত্যুর পরে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১২০৬ খৃঃ খোক্কার নামে একদল পার্বত্য জাতি গোপনে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। নাসিরুদ্দিন কুবাচা সিন্ধুদেশ ও মুলতান অধিকার করেন। ভারতীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ কুতবুদ্দিনের হস্তগত হয়।

পরবর্তী চালুক্যগণ। দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটগণ ৯৭৩ খৃঃ নূতন এক চালুক্য-বংশকর্তৃক পরাভূত হইল। এই পরবর্তী চালুক্যদিগকে তাহাদের রাজধানীর নাম অনুসারে কল্যাণের চালুক্য বলা হয়।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। তিনি পঞ্চাশ বৎসরকাল সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন (১০৭৬—১১২৬ খৃঃ)। এই সময়ের ভিতর তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুরাজ্যে বিশেষত বাঙলা দেশ ও মালবে বিজয়-অভিযান করিয়াছিলেন। বাঙলার সেনরাজগণ সম্ভবত এই সুযোগেই রাঢ়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১১৯০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া যায়।

যাদব ও হোয়্সলগণ। চালুক্যদের পতনের পর দুইটি প্রধান শক্তি ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে ক্ষমতা

বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। ইহারা দেবগিরির যাদব-বংশ ১ এবং মহীশূরের নিকটবর্তী দোরসমুদ্রের হোয়সল-বংশ বলিয়া ২ খ্যাত।

হোয়সল-বংশের বিখ্যাত রাজা বিষ্ণুবর্ধন (আঃ ১১১১—১১৪১ খৃঃ অঃ) দোরসমুদ্রে রাজধানী স্থাপিত করেন। ইনি প্রসিদ্ধ আচার্য রামানুজকর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন ও বহু বৈষ্ণব মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি বহু যুদ্ধ জয় করিয়া হোয়সল শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

যাদবরাজ ভিল্লম (১১৮৭-১১৯১) চালুক্য রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন, কিন্তু তিনি হোয়সলরাজ দ্বিতীয় বীরবল্লাল কর্তৃক পরাজিত এবং সম্ভবত নিহত হন। ভিল্লমের পৌত্র সিংঘনের অধীনে যাদবেরা পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। তিনি হোয়সলদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাঁহার বিজয়-পতাকা কাবেরী নদী পর্যন্ত উড্ডীন করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতেও তিনি বহু স্থান জয় করেন, এমন কি, কয়েকজন মুসলমান রাজাকে পর্যন্ত পরাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে সিংঘনের দীর্ঘ রাজত্বকালে (১২১০—১২৪৭ খৃঃ) দেবগিরির যাদবেরা এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিল। সিংঘনের প্রপৌত্র রামচন্দ্রের রাজত্বকালে মুসলমানগণকর্তৃক ~~কিরূপে~~ এই সাম্রাজ্য বিজিত হইয়াছিল, ~~তাহা পরবর্তী এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।~~

চোল। পল্লবদের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে চোলগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। এই বংশের মহারাজাধিরাজ রাজরাজ ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে কলিঙ্গ এবং দক্ষিণে সিংহল দেশ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

ভিল্লম

সিংঘন

রাজরাজ চোল

রাজেন্দ্র চোল

তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোল (১০১৪—১০৪৪ খৃঃ) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি চালুক্যদিগকে পরাজিত করেন এবং বাঙলাদেশ পর্যন্ত তাঁহার বিজয়-বাহিনী লইয়া অগ্রসর হন।

তাঁহার নৌ-যুদ্ধে বিজয়

তাঁহার যুদ্ধ-জাহাজ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মলয় উপদ্বীপের কতকাংশ এবং সুমাত্রা দ্বীপটি অধিকার করে।

ইহার এক শতাব্দী পর পর্যন্তও চোলেরা দাক্ষিণাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তি ছিল। {অনন্তবর্মন্ চোডগঙ্গের রাজত্বকালে (১০৭৬—১১৪৭) 'প্রাচ্য গঙ্গ' বংশ বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে এবং তিনি গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্যন্ত ভূ-ভাগ অধিকার করেন।} ইহার কিছুকাল পরেই হোয়সল-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। এই সমুদয় কারণে চোল-শক্তি ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়ে। খৃষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে অধীন জমিদারগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করায় চোল-রাজ একেবারে হতবল হইয়া পড়েন। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, এই সমস্ত রাজ্যই আলাউদ্দিন খিল্‌জীর সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল।

প্রাচ্য গঙ্গবংশ

চোল শক্তির অধঃপতন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পৌরাণিক যুগে হিন্দু সভ্যতা

বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের অভ্যুদয়ের পরবর্তী যুগে হিন্দু সভ্যতার অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল ; কয়েকটি বিশিষ্ট বিষয় উল্লেখ করিলে এই পরিবর্তন কতকটা বুঝা যাইবে।

ধর্ম। অশোকের পরে প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্মই ভারতের প্রধান ধর্ম হইয়া রহিল। গুপ্ত সম্রাটদের আমলে তাঁহাদের পোষকতায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম আবার ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কিন্তু বৈদিক যুগের ধর্মের সহিত এই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অনেক প্রভেদ ঘটিয়াছিল। বৈদিক যুগের প্রধান প্রধান দেবতাগণ ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া উঠিতেছিলেন, নূতন দেবতা আসিয়া তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতেছিলেন। এই যুগের বিশিষ্ট দেবতাগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব এই ত্রিমূর্তিই প্রধান। তবে বৈদিক যুগের দেবতা সূর্যের পূজাও প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মার পূজা অল্পকাল পরেই অপ্রচলিত হইতে আরম্ভ করে ; কিন্তু সূর্য, বিষ্ণু ও শিব বহুদিন পর্যন্ত সমান সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। আজকাল সূর্যের পূজাও আর তেমন প্রচলিত নাই ; শিব ও বিষ্ণু এবং তাঁহাদের পুত্র কলত্রগণই বর্তমান কালের হিন্দুসমাজের উপাস্য দেবতা। বৈদিক যুগে মূর্তি গড়িয়া দেবতার উপাসনা বিশেষ প্রচলিত ছিল না, পরবর্তী যুগে কিন্তু মূর্তি পূজাই

ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরুত্থান

ত্রিমূর্তি

ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে এবং দেশে নূতন নূতন দেবতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠার জন্য অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়।

পুরাণ ও স্মৃতি

"পুরাণ" বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থ এই নূতন ধর্মের শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। এইজন্য এই নূতন ধর্ম ও যুগকে পৌরাণিক ধর্ম ও পৌরাণিক যুগ বলা হয়। নূতন দেবদেবীগণ সম্বন্ধে পুরাণসমূহে বহু আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতিও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এই যুগে সমাজ পরিচালনার জন্য স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র নামে পরিচিত নূতন এক শ্রেণীর ব্যবহার-গ্রন্থের উদ্ভব হয়। এই শ্রেণীর প্রধান গ্রন্থের নাম মানবধর্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতা। হিন্দুগণ এই গ্রন্থকে সমস্ত সামাজিক ও ব্যবহারিক বিধানের নিদান বলিয়া মনে করেন। মনুসংহিতার রচনা-কাল সম্ভবত খৃষ্ট-পূর্বাব্দের দ্বিতীয় শতক হইতে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকের মধ্যে।

মনুসংহিতা

সমাজ। ভিন্নধর্মাবলম্বী ও বিদেশীয়গণকে সমাজে গ্রহণ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু সমাজের আশ্চর্য উদারতা ছিল। যবন, পারদ, শক, কুষাণ, হুন, গুর্জর ইত্যাদি বৈদেশিকগণ ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া ভারতীয় সমাজে এমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে, আজ তাহাদের পৃথক্ সত্তার চিহ্নমাত্রও নাই। যে বৌদ্ধ-ধর্ম ভারতে এক সময় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অনুসরণকারিগণও সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল এবং বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন হিন্দু সমাজের উদারতা

বৈদেশিকগণের হিন্দু সমাজে মিশ্রণ

কিন্তু কালক্রমে একটি সংকীর্ণ অনুদার ভাব ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিল। ইহার ফলে ক্রমশ জাতিভেদের বন্ধন কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিল। সমাজ বহু জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া গেল। জাত্যন্তর গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়া গেল, এবং নিম্ন জাতির অন্নগ্রহণ বা ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান দণ্ডনীয় হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমশ এই ধারণা সমাজে বদ্ধমূল হইতে লাগিল, যে, হিন্দুগণ মানবজাতির অবশিষ্টাংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং বাহির হইতে কেহই আসিয়া হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে স্থানলাভ করিতে পারে না। হিন্দু সমাজের বাহিরের যত জাতি সকলেই অশুচি এবং হিন্দুগণ উহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই ধারণা সমাজে প্রসারলাভ করায়, বৈদেশিকগণের সহিত সংশ্রব ক্রমশই কমিয়া আসিতে লাগিল।

জাতিভেদের কঠোরতা

বৈদেশিক বর্জন

গজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গে আল্‌বেরুণী নামক এক পণ্ডিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য ও সামাজিক আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহার একটি মনোরম বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দুগণের শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও এই সংকীর্ণ ভাবের কঠোর সমালোচনা করিয়া আল্‌বেরুণী লিখিয়াছেন—

আল্‌বেরুণী

"হিন্দুগণ বিদেশীয়গণকে ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অপবিত্র বলিয়া অভিহিত করে এবং তাহাদের সহিত কোনও সংস্পর্শ রাখা নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে। বিদেশীয়গণের স্পৃষ্ট জল বা অগ্নি পর্যন্ত তাহারা অপবিত্র বলিয়া মনে করে। হিন্দুদের বিশ্বাস

আল্‌বেরুণী বর্ণিত হিন্দু

তাহাদের জাতির মত জাতি নাই, তাহাদের ধর্মের মত ধর্ম নাই এবং তাহাদের বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান নাই। তাহারা বিদেশে যায় না এবং অন্য জাতির সহিত মিশে না; মিশিলে তাহাদের এই ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইত।"

স্ত্রীলোক ও নিম্নজাতির অবনত অবস্থা

সমাজে স্ত্রীলোকদের অবস্থার অবনতিতেও হিন্দুগণের সংকীর্ণতা প্রকাশ পাইতে লাগিল; স্ত্রীজাতির বেদ পাঠ নিষিদ্ধ হইয়া গেল এবং সর্বতোভাবে তাহাদিগকে পুরুষের মুখাপেক্ষী করিয়া তোলা হইল। নিম্নজাতিসমূহের অবস্থাও ক্রমশ দুর্দশার চরমে পৌছিল। তাহাদের কোন কোন জাতিকে গ্রামে বা নগরের অভ্যন্তরে বাস করিতে দেওয়া হইত না। শুধু তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে নহে, তাহাদিগকে দেখিলে, এমন কি, তাহাদের ছায়া মাড়াইলেও, উচ্চজাতির লোক নিজকে অপবিত্র মনে করিতেন। এই অমানুষিক সংকীর্ণতা ও নির্দয়তা যে হিন্দু জাতির পতনের একটি প্রধান কারণ, সে বিষয়ে প্রায় কোনও সন্দেহ নাই।

সাহিত্য। পুরাণ, স্মৃতি ও মহাকাব্য ব্যতীত কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও নানাবিধ বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

কালিদাস ও ভবভূতি

কবিগণের মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতির খ্যাতি জগদ্ব্যাপী। মনুষ্য-সমাজে যতদিন সাহিত্যের আদর থাকিবে, ততদিন এই দুই মহাকবির অমর কাব্য ও নাটক বিলুপ্ত হইবে না। অন্যান্য

ভাস এবং অশ্বঘোষ

লেখকগণের মধ্যে কালিদাসের পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাস এবং কবি অশ্বঘোষের নাম করা যাইতে পারে। কালিদাসের পরবর্তী কবিগণের মধ্যে ভারবি, শ্রীহর্ষ এবং মাঘ

সবিশেষ খ্যাত। গদ্য উপন্যাসকারগণের মধ্যে দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণভট্টের স্থান সর্বাগ্রে।

দর্শন শাস্ত্র

ষড় দর্শন

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য দার্শনিক রচনায়ও বিশেষ সমৃদ্ধ। উপনিষদের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উপনিষদের পরবর্তী যুগে দর্শনশাস্ত্রের ছয়টি বিভিন্ন শাখা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই ছয়টি শাখা যথাক্রমে—কপিলের সাংখ্য-দর্শন, কণাদের বৈশেষিক-দর্শন, গৌতমের ন্যায়-দর্শন, পাতঞ্জলের যোগ-দর্শন, জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসা দর্শন, এবং ব্যাসের উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন বলিয়া খ্যাত। খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে দার্শনিকপ্রবর শ্রীমৎ শংকরাচার্য বেদান্ত-দর্শনের আরও উন্নতি-সাধন করেন। শংকরের পরেই দার্শনিকপ্রবর কুমারিল ও রামানুজের নাম করা যাইতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যেও অনেক দার্শনিক ছিলেন।

শংকরাচার্য

ঐতিহাসিক সাহিত্য

রাজতরঙ্গিণী

ঐতিহাসিক গ্রন্থের সংখ্যা কিন্তু বড়ই কম ছিল। বর্তমানের আদর্শ অনুসারে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, এমন একখানা মাত্র পুস্তকের নাম করা যায়; সেখানি রাজতরঙ্গিণী। ইহা কাশ্মীরের ইতিহাস এবং কহ্লন পণ্ডিত কর্তৃক খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। বড় বড় রাজার কয়েকখানা চরিতাখ্যান সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাণভট্ট-রচিত হর্ষ-চরিত (সম্রাট হর্ষবর্ধনের জীবন-কথা), বিহ্লন-রচিত বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত (পরবর্তী যুগের চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের জীবন-কথা), এবং সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রাম-চরিত (পালরাজ রামপালের জীবন-কথা)।

ঐতিহাসিক চরিতাখ্যান

অর্থনীতি ও রাজনীতি এই দুই শাস্ত্রের চর্চা বিশেষরূপেই হইয়াছিল। এই বিষয়ে আদর্শ গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (৩৫ পৃঃ)।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

অঙ্ক, জ্যোতিষ, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয়েও কিছু কিছু চর্চা এদেশে হইয়াছিল। বর্তমানকালে গণিত-শাস্ত্রের মূলরূপে গৃহীত দশমিক পদ্ধতি হিন্দুগণেরই আবিষ্কৃত। জ্যোতির্বেত্তাগণের মধ্যে আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ভাস্করাচার্যের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ।

বৈজ্ঞানিক সাহিত্য

চিকিৎসা-শাস্ত্র

চিকিৎসা-বিদ্যায়ও ভারতীয়গণ যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিয়াছিল। বিশ্রুতকীর্তি সুশ্রুত এবং কনিষ্কের সমসাময়িক চরক এ বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন। প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতীয়গণ বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রসিদ্ধ। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়াস্থিত দেশসমূহের সহিত ভারতীয়গণের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে বিলাসোপকরণ যোগাইয়া প্রত্যেক বৎসর ভারতীয়গণ বিপুল অর্থ আহরণ করিত। পূর্বদিকে ভারতবাসিগণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশসমূহের সহিত কেবল যে বাণিজ্য করিতেন, তাহাই নহে, তাঁহারা ধীরে ধীরে ঐ সকল দেশে উপনিবেশও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এইরূপে আনাম, কাম্বোজ, শ্যাম, ব্রহ্ম, মলয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও ইত্যাদি স্থানে ভারতীয়গণের বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থলপথে মধ্য-এশিয়ার খোটান্ ও তন্নিকটবর্তী স্থানে এবং ইউনান ও নিকটবর্তী চীনদেশের সীমান্ত প্রদেশে তাঁহারা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত

পাশ্চাত্যদেশের সহিত বাণিজ্য

পূর্বভাগে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন

মধ্য-এশিয়ায় বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন

করিয়াছিলেন। এই সমুদয় স্থানেই ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। এমন কি, চীন, কোরিয়া ও জাপান বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করে। গ্রীস যেভাবে ইউরোপকে সভ্যতা শিখাইয়াছিল, ভারতবর্ষ সেই রকমে সমগ্র এশিয়ার গুরুপদ অধিকার করিয়াছিল।" বিদেশে গিয়া ভারতীয় সভ্যতা কি পরিমাণ ফলপ্রসূ হইয়াছিল, কাম্বোজের আঙ্কোরভাট্ এবং যবদ্বীপের বরবুদর প্রভৃতি বিশাল কারুকার্য-খচিত মন্দিরগুলি দেখিলে তাহার কিছু ধারণা করা যায়।

ভারতীয় সভ্যতার প্রসার

অর্থনৈতিক অবস্থা। স্বাভাবিক সম্পদে বিভবশালী ভারতবর্ষ ব্যবসা ও বাণিজ্যের ফলে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইল। এককালে ভারতের ধন-সম্পদ উপকথার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। কি পরিমাণ ধন-রত্ন এই দেশে সঞ্চিত হইয়াছিল, নিম্নের তিনটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। কাশিম-পুত্র মুহম্মদ যখন মুলতান জয় করেন, তখন কেবল একটি মন্দিরেই তিনি ১৩২০০ মন সুবর্ণ প্রাপ্ত হন। সুলতান মামুদ যখন নগরকোট নামক স্থানের মন্দির লুণ্ঠন করেন, তখন কি পরিমাণ ধন-রত্ন তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আলাউদ্দিন খিল্‌জী যখন দেবগিরির যাদবরাজের সহিত সন্ধি করিলেন, তখন যাদবরাজ অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে তাঁহাকে ৬০০ মন মুক্তা, ১০০০ মন রৌপ্য এবং দুই মন হীরকাদি বিবিধ রত্ন দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, আলাউদ্দিনের সৈন্যগণ প্রত্যাবর্তনের পথে দুর্বহ বলিয়া রূপার জিনিষ রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল।

ভারতের প্রভূত ধন-সম্পদ

শিল্প ও স্থাপত্য। ভারতের অতুল ঐশ্বর্য স্বভাবতই দেশের শিল্প ও স্থাপত্যের উৎকর্ষ বিধান করিয়াছিল। সম্রাট্

অশোকের উৎসাহে শিল্পকলায় ভারত অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। অশোকের নির্মিত মনোরম শীর্ষসমন্বিত এবং একখণ্ডমাত্র প্রস্তরে গঠিত বিশাল স্তম্ভগুলি এখনও সমস্ত জগতের বিস্ময় উদ্রেক করে। অশোক বহু সংখ্যক স্তূপও নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সাঁচিস্তূপই সবিশেষ খ্যাত।

সম্রাট্ অশোকের আমলের শিল্প

কনিষ্কের স্তূপ

কনিষ্কও স্থাপত্য-শিল্পের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর পেশবারে তিনি যে স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত এশিয়ার বিস্ময়-স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গুপ্তদের শাসনকালে ভারতীয় শিল্পকলা বিশেষ উন্নতিলাভ করে।

গুপ্তযুগের শিল্প

অতি সুন্দর সুন্দর মন্দিরসমূহে সমস্ত দেশ ভরিয়া যায় এবং তাহাদের শোভাবর্ধনের জন্য যে সকল খোদিত প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাদের অতুলনীয় সৌন্দর্যে আজও জগৎ মুগ্ধ। এই সময়ে নির্মিত কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি মূর্তি-শিল্পের চরমোৎকর্ষ বলিয়া এখনও গণ্য হইয়া থাকে। চিত্রবিদ্যাও এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

অজন্তাগুহার চিত্র-শিল্প

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিজামের রাজ্যস্থিত অজন্তাগুহার মনোরম চিত্রাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। অজন্তা এখন সমগ্র পৃথিবীর শিল্পানুরাগীর তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রকূটরাজগণও শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ এলোরার বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। সাধারণভাবে প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া এই মন্দির নির্মিত হয় নাই; একটি সমগ্র পর্বতখণ্ড খোদাই করিয়া এই মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই শ্রেণীর স্থাপত্য দেখা যায় না।

এলোরার পর্বত খোদিত মন্দির

চোল শিল্প

চোলরাজগণও গগনচুম্বী বিশাল মন্দিরাবলী নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সেইগুলি যেমন বৃহদাকার তেমন সুন্দর। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ তাঞ্জোরের বিশাল শৈব মন্দিরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবু পর্বতের উপরিস্থিত জৈন মন্দিরসমূহ শ্বেতমর্মর প্রস্তরে গঠিত হইয়াছিল। ইহার সূক্ষ্ম কারুকার্য অপরূপ ও অতুলনীয়। এইগুলি রাজপুতানার স্থাপত্য পদ্ধতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পল্লব, চালুক্য, হোয়্‌সল এবং পালরাজবংশও শিল্পকলার চমৎকার নিদর্শনসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ দিবার স্থান এইখানে নাই। ভারতীয় মন্দিরসমূহের গৌরবের আভাস সুলতান মামুদ এবং তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক-গণের বর্ণনা হইতেও পাওয়া যায়। মথুরার একটি মন্দির দেখিয়া সুলতান মামুদ নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—"এইরূপ একটি মন্দির যদি কেহ নির্মাণ করিতে চাহে, তবে দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় ব্যতিরেকে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং অতিশয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিকরগণকে এই কর্মে নিয়োজিত করিলেও দুইশত বৎসরেও এই মন্দিরের নির্মাণ-কার্য শেষ হইবে না।" মথুরার এই মন্দিরে যে সকল প্রতিমূর্তি ছিল তাহাদের মধ্যে পাঁচটি ১০ হাত উচ্চ; এগুলি সুবর্ণে গঠিত ছিল এবং ইহাদের চক্ষুর্দ্বয় মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নদ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল মন্দিরের অলৌকিক সৌন্দর্যও ইহাদিগকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সুলতানের আদেশে এই সকল মন্দির আগুনে পোড়াইয়া ভূমিসাৎ করা হয়। এইরূপে বিদেশীয় আক্রমণের ফলে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় শিল্প-নিদর্শনসমূহ একে একে বিনষ্ট হইয়াছিল।

আবুপাহাড়ের মন্দির

মথুরার মন্দির

হিন্দুমন্দির ধ্বংস

দ্বিতীয় খণ্ড

মুসলমান আমল

প্রথম অধ্যায়

দাস রাজবংশ

কুতবুদ্দিন। মুহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতবুদ্দিন ভারতের মুসলমান বিজিত প্রদেশ সমূহের অধিপতি হইলেন। মুহম্মদ ঘোরীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র কুতবুদ্দিনকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এইজন্য কুতবুদ্দিন দিল্লীর প্রথম সুলতান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়।

দিল্লীর প্রথম সুলতান

কুতবুদ্দিন প্রথমে মুহম্মদ ঘোরীর একজন ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্যদক্ষতা-গুণে তিনি প্রভুর অনুরাগভাজন ও উচ্চপদে নিযুক্ত হন। মুহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের পর কুতবুদ্দিন কিরূপে নানা দেশ জয় করেন, তাহা পূর্বে বলা

তাঁহার চরিত্র

তাঁহার চরিত্রে নিষ্ঠুরতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য এই দুই বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ ছিল। সমসাময়িক একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "তিনি এক হস্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিতরণ ও অন্য হস্তে লক্ষ লক্ষ

প্রাণদণ্ড করিতেন।" উপর্যুপরি নৃশংস সামরিক অভিযানের দ্বারা তিনি হিন্দুগণের বিদ্রোহ দমন করেন, এবং ভারতে মুসলমান শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত কুতব-মিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন ও সর্বনিম্নতলটি নির্মাণ করেন। কুতব নামক এক মুসলমান সাধুর স্মৃতিরক্ষার্থে ইহা নির্মিত হয়। ১২১০ খৃষ্টাব্দে চৌগ নামক পোলোর ন্যায় এক প্রকার খেলা করিবার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া লাহোরে কুতবুদ্দিনের মৃত্যু হয়। কুতব-মিনার

অতঃপর কুতবুদ্দিনের পুত্র আরাম লাহোরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই দিল্লীর ওমরাহ্‌বর্গের আহ্বানে কুতবুদ্দিনের জামাতা ইল্‌তুৎমিস্ দিল্লীতে গিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এক বৎসরের মধ্যেই আরামের রাজত্বের অবসান হয়।

ইল্‌তুৎমিস্‌। সুলতান ইল্‌তুৎমিস্ কুতবুদ্দিনের মত ক্রীতদাসরূপে জীবন আরম্ভ করেন, এবং কেবল নিজের গুণে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে কুতবের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হন। তিনি সুযোগ্য ও গুণানুরাগী রাজা ছিলেন।

তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান ওমরাহ্‌গণকে দমন করেন ও বিখ্যাত গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করেন। মালবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তিনি উজ্জয়িনী অধিকার করেন এবং মহাকালের বিখ্যাত মন্দিরটি ধ্বংস করেন। বঙ্গ ও সিন্ধুদেশের মুসলমান শাসনকর্তাগণ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার না করায়, ইল্‌তুৎমিস্ তাঁহাদিগকে দমন করিয়া ঐ দুই প্রদেশে স্বীয় অধিকার দৃঢ়রূপে তাঁহার রাজ্য জয়

প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার রাজত্বে ভারতবর্ষ এক ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পায়। এই যুগে মোগলরাজ চেঙ্গিস্ খাঁর নামে সমস্ত এশিয়া কম্পিত হইত। ইল্‌তুৎমিসের রাজত্বকালে চেঙ্গিস্ খাঁর হস্তে পরাজিত হইয়া এক রাজা আসিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চেঙ্গিস্ খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হন এবং পশ্চিম পঞ্জাব লুণ্ঠন করেন। কিন্তু উক্ত পলায়নপর রাজা পারস্যে গমন করিলে চেঙ্গিস্ খাঁ সৈন্য-সামন্ত লইয়া ফিরিয়া যান।

চেঙ্গিস্ খাঁর আক্রমণ সম্ভাবনা

ইল্‌তুৎমিস্ যে কেবল একজন সমর-কুশল সেনাপতিই ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এশিয়ার নানাস্থান হইতে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাঁহার রাজসভায় সমবেত হইয়াছিলেন এবং ইল্‌তুৎমিস্‌ও তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া বাগ্‌দাদের খলিফা তাঁহাকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ উপহার দেন। ইল্‌তুৎমিস্ কুতব-মিনারের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থতল নির্মাণ করেন। দিল্লীর বিখ্যাত জমি মস্‌জিদের (যাহা পরে কুতব মস্‌জিদ বলিয়া খ্যাত হয়) অধিকাংশও তাঁহারই নির্মিত।

ইল্‌তুৎমিসের বিদ্যোৎসাহ

রাজিয়া। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার কন্যা রাজিয়াকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া যান। রাজ্যের ওমরাহ্‌গণ কিন্তু স্ত্রীলোকের সিংহাসন লাভ পছন্দ না করিয়া, রাজিয়ার এক অপদার্থ ভ্রাতা রুক্‌নুদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করে। রাজিয়া রুক্‌নুদ্দিনকে সরাইয়া নিজে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন (১২৩৬ খৃঃ অঃ)। এই

মহীয়সী মহিলা যেমন কার্যতৎপর, তেমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি প্রকাশ্য রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতেন এবং পুরুষের ন্যায় শিরোভূষণ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ওমরাহ্‌গণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দিল না। তাঁহাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য হিন্দুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত, অপরদিকে আবার বিদ্রোহী মুসলমান ওমরাহ্‌গণকে শাস্তি দিতে হইত। সময়ে সময়ে তিনি নিজে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু একা তিনি ওমরাহ্‌গণের সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি এক ওমরাহ্‌কে বিবাহ করিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের কিছু অধিককাল রাজত্ব করার পর তিনি ও তাঁহার স্বামী উভয়েই নিহত হন (১২৪০ খৃঃ অঃ)। বিদ্রোহ দমন

রাজিয়া ভিন্ন দিল্লীর রাজসিংহাসনে আর কোনও রমণী উপবেশন করেন নাই। একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিকের মতে রাজিয়া "শ্রেষ্ঠ রাজগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রজাবৎসল, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ, দয়াশীল, বিদ্যোৎসাহী, সুবিচারক, সমর-কুশল এবং অন্যান্য সমস্ত প্রকার প্রশংসনীয় রাজগুণের অধিকারিণী ছিলেন;" কিন্তু এই ঐতিহাসিক যে তৎকাল-প্রচলিত স্ত্রীবিদ্বেষের ভাব মনে মনে পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতেই বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"রাজিয়ার এত সদ্‌গুণ থাকিলে কি হইবে? তিনি পুরুষ হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত গুণাবলীই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।" রাজিয়ার চরিত্র

রাজিয়ার পরে ইল্‌তুৎমিসের একটি অপদার্থ পুত্র এবং পৌত্র যথাক্রমে সিংহাসন লাভ করেন। এই দুই রাজার রাজত্বকালে মধ্য-এশিয়ার মোগলগণ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ১২৪১ খৃঃ অঃ তাহারা লাহোর অধিকার করে এবং চারি বৎসর পরে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। অবশেষে তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।

নসিরুদ্দিন। ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে নসিরুদ্দিন নামে ইল্‌তুৎমিসের এক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। নসিরুদ্দিন একজন সদাশয় ও পুণ্যাত্মা রাজা ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন গুরুতর রাজকার্য সম্পাদন করিবার যোগ্যতা তাঁহার অল্পই ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ঘিয়াসুদ্দিন বল্‌বনের ন্যায় একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী লাভ করিয়া-

মোগল আক্রমণ

ছিলেন। বল্‌বন বিদ্রোহদমন ও মোগলগণকে পরাভূত করিয়া রাজ্যে কতক পরিমাণে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু শাসনকর্তা হিসাবে যদিও নসিরুদ্দিন খুব

রাজার আদর্শ চরিত্র

দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই, মানুষ হিসাবে তিনি এই যুগের অনেক রাজা অপেক্ষাই বড় ছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মীন্‌হাজ এই সুলতানের একটি মনোরম চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। মীন্‌হাজের বর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে, প্রাচীন যুগের রাজর্ষির

তাঁহার সরল জীবন

আদর্শ নসিরুদ্দিনে অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছিল। মীন্‌হাজ বলেন—নসিরুদ্দিন কোরানের নকল প্রস্তুত করিয়া তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে জীবিকানির্বাহ করিতেন। নসিরুদ্দিনের মাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন। সেই রাণী নিজের হাতে স্বামীর জন্য রন্ধন করিতেন। একদিন রাণী রাঁধিতে গিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিলেন, এবং রাজাকে একটি দাসী নিযুক্ত করিয়া দিবার জন্য

অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন,—তিনি গরীব মানুষ, তিনি দাসীর মাহিয়ানা কি করিয়া চালাইবেন! কারণ রাজকোষের অর্থ তাঁহার নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিবার তাঁহার কোনও অধিকার আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। এই রাজার অসাধারণ গুণাবলী বিষয়ে মীন্‌হাজ আরও কয়েকটি আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই যুগের ইতিহাস কেবল নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তপাতের বিবরণে পূর্ণ। এই সকলের মধ্যে নসিরুদ্দিনের পূত চরিত্রের কাহিনী পাঠ করিলে মন বিশেষ তৃপ্ত হয়।

ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অবস্থা

১২৬৬ খৃষ্টাব্দে নসিরুদ্দিন পরলোক গমন করেন। ইল্‌তুৎমিসের বংশ তাঁহার সঙ্গেই লোপ পাইয়া যায়। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসরে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং সুলতান নসিরুদ্দিনের মৃদুস্বভাবের ফলে রাজ্যে বিষম বিশৃংখলা উপস্থিত হইয়াছিল। ইল্‌তুৎমিসের চল্লিশ জন তুরস্কজাতীয় ক্রীতদাস এই যুগে বিশেষ ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। সমগ্র দেশ প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই করতলগত ছিল।

বল্‌বনের পূর্ব ইতিহাস

এই চল্লিশ জনের অন্যতম ঘিয়াসুদ্দিন বল্‌বন নসিরুদ্দিনের সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ~~ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে~~। নসিরুদ্দিনের বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে এই বল্‌বনই রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্য চালাইতেন। তাঁহার উপাধি ছিল উলুখ্‌-খাঁ। নসিরুদ্দিন বল্‌বনের হস্তের যন্ত্রমাত্র ছিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং নসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্‌বন অনায়াসে সিংহাসন অধিকার করিলেন।

ঘিয়াসুদ্দিন বল্‌বন। বল্‌বন অসামান্য অভিজ্ঞতা লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শাসনকার্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি সুশৃংখলার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ববর্তী রাজগণের কু-শাসনের ফলে রাজ-সিংহাসনের যে গৌরব ও মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় ফিরাইয়া আনিলেন। বল্‌বনের অসাধারণ সমর-কুশলতা, কার্যদক্ষতা ও সাহস ছিল এবং ত্রিশ বৎসরের দুর্বল শাসনজনিত বিশৃংখলার পর এমন একজন উপযুক্ত রাজা পাইয়া ভারতবর্ষ পুনরায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

বল্‌বনের চরিত্র

সুলতান প্রথমে সমরবিভাগের সুশৃংখলা স্থাপনে মনোযোগ প্রদান করিলেন। ভারতের প্রজাসাধারণ মুসলমান শাসনের বিরোধী থাকায়, এদেশে ইস্‌লাম রাজ্য সামরিক বলের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং সৈন্য-বলই রাজ্যের প্রকৃত বল ছিল। সৈন্যদলে সুশৃংখলা বিধান করিয়া তিনি দেওয়ানী বিভাগেরও সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং মহা আড়ম্বরে রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন। রাজার এত আদবকায়দা, রাজসভার এত জাঁকজমক দিল্লীতে পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। বল্‌বনের রাজত্বের দীর্ঘ বিশ বৎসর এইরূপে রাজার গৌরব, মর্যাদা ও ঐশ্বর্য সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত ছিল।

সৈন্যদের মধ্যে শৃংখলা আনয়ন

রাজসভার আড়ম্বর

সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই সুলতান দেখিলেন, মেওয়াটিগণ রাজ্যমধ্যে বড় অত্যাচার করিতেছে। এই দুঃসাহসী জাতি পথিকগণের সর্বস্ব লুঠিয়া লইত এবং সময় সময় লুণ্ঠন করিতে করিতে দিল্লী নগরের দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইত। এই দস্যুগণের দুর্গসমূহ ভূমিসাৎ করিয়া সুলতান তাহাদিগকে সম্পূর্ণ-

রূপে দমন করিলেন। ঐতিহাসিক সানন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"এই ঘটনার পরে ষাট বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মেওয়াটি দস্যুগণ আর পথিকগণের উপর অত্যাচার করিতে সাহস পায় নাই।" এই মেওয়াটি দমন বল্‌বনের মত প্রবল শাসনকর্তারই উপযুক্ত কীর্তি।

মেওয়াটিগণের বিদ্রোহ দমন

এই অসাধারণ দূরদর্শী এবং রাজনীতিজ্ঞ সুলতান বিনা কারণে কেবলমাত্র স্বীয় ক্ষমতা বিস্তারের নিমিত্ত যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে পরাক্রান্ত মোগলগণ* প্রায় সমস্ত এশিয়া পদানত করিয়াছে এবং সুযোগ পাইলেই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। এই জন্য তিনি সর্বদা সসৈন্যে প্রস্তুত থাকিতেন কিন্তু নিজের রাজ্য ছাড়িয়া দূরে যুদ্ধ অভিযান করিতেন না।

বল্‌বনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

রাজ্যমধ্যে কোন বিদ্রোহ বা গোলযোগ হইলে তিনি তাহা কঠোরতার সহিত দমন করিতেন। এই সকল বিদ্রোহের মধ্যে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা তুঘ্রিলের বিদ্রোহই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তুঘ্রিল বিদ্রোহী হইয়া দুইবার সম্রাট্‌-প্রেরিত সৈন্যদলকে পরাজিত করেন; অবশেষে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ সুলতান নিজে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। তুঘ্রিলের বিদ্রোহ দমন করিবার পর বঙ্গের মুসলমান রাজধানী গৌড় অথবা লক্ষ্মণাবতীর বাজারে দুইধারে ফাঁসি কাষ্ঠ পুঁতিয়া সম্রাট্‌ তুঘ্রিলের অনুচরগণকে ফাঁসি দিলেন। সম্রাটের এই কঠোরতায় দেশে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া গেল।

মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা

বাঙলার বিদ্রোহ দমন

* মধ্য-এশিয়ার পরাক্রান্ত জাতি। ইহারা মোঙ্গল, মোগল, মুঘল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে বাবর ও তাঁহার পরবর্তীগণকে মুঘল এবং তাঁহার পূর্ববর্তীদিগকে মোগল বলা হইয়াছে।

সম্রাট্‌ নিজের দ্বিতীয় পুত্র বঘ্‌রা খাঁকে বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে সম্রাট্‌ নিদারুণ মনোবেদনা প্রাপ্ত হইলেন। এই রাজকুমার অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন এবং মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সভায় সেই যুগের শ্রেষ্ঠ গুণিগণ সমবেত হইতেন। তিনি কবিতা ভালবাসিতেন এবং বিখ্যাত কবি আমীর খস্‌রু পাঁচ বৎসর তাঁহার সভায় ছিলেন। ১২৮৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে মোগলদের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। সুলতান তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ এই দারুণ শোকে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন।

বল্‌বনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু

ঘিয়াসুদ্দিন বল্‌বনের চরিত্র। ঘিয়াসুদ্দিন বল্‌বন ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান নরপতিগণের অন্যতম ছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বিদ্রোহীর প্রতি তিনি কঠোর, মমতাহীন ও নিষ্ঠুর ছিলেন, কিন্তু নিজের প্রজাগণের কাছে তিনি ন্যায়পরায়ণতা এবং সদাশয়তার প্রতিমূর্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায়বিচারের নিকট ছোট-বড় আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভেদ ছিল না। বাদাউনের এক আমীর একবার বেত্রাঘাতে তাঁহার এক ভৃত্যকে হত্যা করে। ঐ নিহত ব্যক্তির বিধবা সুলতানের নিকট অভিযোগ আনয়ন করিলে, সুলতান আদেশ দিলেন যে, ঐ বিধবার সম্মুখে ঐ হত্যাকারী আমীরকে কষাঘাতে জর্জরিত করিয়া হত্যা করা হউক। বাদাউনে সুলতানের নিয়োজিত গুপ্তচরগণ এই ঘটনা সম্রাটের কর্ণগোচর না করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

বল্‌বনের কঠোরতা এবং ন্যায়পরায়ণতা

সুলতান ঘিয়াসুদ্দিনের নাম ও গৌরব সমস্ত এশিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং মোগলদের অত্যাচারে রাজ্য হারাইয়া সতের জন রাজা তাঁহার রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বল্‌বনের মৃত্যুতে দেশ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা বুঝাইতে গিয়া ঐতিহাসিক সত্যই লিখিয়া গিয়াছেন,—"যে দিন প্রজাগণের পিতৃপ্রতিম বল্‌বনের মৃত্যু হইল, সেই দিন হইতে দেশের লোকের জীবন ও ধন-সম্পদ আর নিরাপদ রহিল না।"

বল্‌বনের সভায় হৃতরাজ্য রাজগণ

কায়কোবাদের সিংহাসনে আরোহণ। বল্‌বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বঘ্‌রা খাঁকে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু বিলাসী বঘ্‌রা খাঁ বঙ্গরাজ্যের নিশ্চিত আরাম পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর কণ্টকময় সিংহাসনে আসিয়া বসিতে চাহিলেন না। এই কারণে বল্‌বন মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র কাই খসরুকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া যান। কিন্তু ওমরাহ্‌গণ সম্রাটের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া বঘ্‌রা খাঁর পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিল।

কায়কোবাদের রাজত্বকালে রাজ্যের সর্বনাশ। কায়কোবাদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৮৬ খৃঃ) তখন তিনি সতের কি আঠার বৎসরের তরুণ যুবক। সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র তিনি সর্বপ্রকার বিলাসিতা ও অত্যাচারে নিমগ্ন হইলেন। রাজ্যের ওমরাহ্‌ এবং মন্ত্রিগণও রাজার আদর্শ অনুসরণ করিলেন এবং দেশময় সুরাপান ও আমোদ-প্রমোদের স্রোত বহিতে লাগিল। মন্ত্রী নিজামুদ্দিনই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি কাই খসরুকে নিহত

বিলাসী রাজা কায়কোবাদ

করেন এবং আরও অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচার করেন। এই সমুদয় কারণে রাজ্যে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হয়। বঘ্‌রা খাঁ বঙ্গদেশে এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং পুত্রের চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন। পিতার পরামর্শে কায়কোবাদ বিলাসিতা ও পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া তিনি কিছুকালের জন্য ভাল হইতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কুসঙ্গিগণ তাঁহাকে ভাল হইতে দিল না,—তিনি ক্রমশ আবার বিলাস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। অবশেষে শরীরের উপর এই

কায়কোবাদের ব্যাধি

সকল অত্যাচারের ফলে পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার অর্ধাঙ্গ অবশ হইয়া গেল, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার জীবনের কোন আশা রহিল না। তখন ওমরাহ্‌গণ কায়কোবাদের শিশুপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। রাজ্যে বিশৃংখলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এই সুযোগে খিল্‌জী বংশের

জালালুদ্দিন খিল্‌জীর সিংহাসন লাভ

জালালুদ্দিন ফিরোজ নামে এক ওমরাহ্‌ কায়কোবাদকে হত্যা করিয়া ১২৯০ খৃষ্টাব্দে অনায়াসে সিংহাসন অধিকার করিলেন। কায়কোবাদ নিহত ও তাঁহার মৃত দেহ যমুনার জলে নিক্ষিপ্ত হইল।

খিল্‌জী বংশ তুরস্ক জাতি হইতে উদ্ভূত হইলেও বহুকাল আফগানিস্থানে বাস করায় দিল্লীর তুরস্কগণ তাহাদিগকে স্বজাতীয়

দাসবংশ লোপ

বলিয়া স্বীকার করিত না, আফগান বা পাঠান বলিয়া মনে করিত। সুতরাং জালালুদ্দিনের সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কুতবুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত তুরস্ক রাজবংশের ধারা শেষ হইল। এই

বংশের কুতবুদ্দিন, ইলতুৎমিস্ এবং বল্‌বন এই তিনজন শ্রেষ্ঠ রাজাই প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলিয়া, এই বংশ ইতিহাসে দাস রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশের রাজত্বকাল ১২০৬ হইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ। এই বংশের রাজত্বকালে ভারতে মুসলমানশাসন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খিলজী বংশ

জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজী। জালালুদ্দিন যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। তিনি প্রভুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই মৃদুস্বভাব, সদয় ও ধর্মশীল নরপতি বলিয়া পরিচিত হইলেন। দিল্লীর লোকেরা প্রথমে তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু তাঁহার সদয় ব্যবহারে, নিরপেক্ষ বিচারে এবং উদারতায় ক্রমশ তাঁহার পক্ষপাতী হইতে আরম্ভ করিল। বাস্তবিক তিনি এমন কোমলস্বভাব ও সদয় ছিলেন যে, ঐ মারামারি কাটাকাটির দিনে দিল্লীর সিংহাসন তাঁহার মত লোকের ঠিক উপযুক্ত স্থান ছিল কিনা সন্দেহ।

রাজার মৃদুতা ও সদাশয়তা

বল্‌বনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পরাজিত হন। জালালুদ্দিন তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরগণকে শুধু যে ক্ষমা করিলেন, তাহা নহে, তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। একবার কতকগুলি ভয়ংকর প্রকৃতির ঠগ দস্যু ধৃত হয়। সুলতান তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া, স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি দিয়া বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন। একমাত্র সিদিমোল্লা সম্বন্ধে সুলতান কঠোরতা দেখাইয়াছিলেন। এই মুসলমান দরবেশের মতামত ও আচার-ব্যবহার অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। সুলতানের প্রাণনাশ

সিদিমোল্লার প্রাণদণ্ড

করিবার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইলে, তাঁহাকে হাতীর পায়ের তলায় পিষিয়া মারা হয়।

মোগলগণ। ১২৯২ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কিন্তু সুলতান তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ফলে তাহাদের অধিকাংশই প্রস্থান করিল, কিন্তু কতক ভারতবর্ষে রহিয়া গেল। সুলতান দিল্লীর নিকটে তাহাদের বসবাস ও জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাহারা "নব মুসলমান" নামে পরিচিত হইল।

নব মুসলমান

জালালুদ্দিনের হত্যা। কিন্তু যে ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠানদ্বারা সুলতান সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্তী জীবনের দয়াশীলতা ও ধর্মপ্রাণতা সত্ত্বেও তাঁহাকে তাহার শাস্তিভোগ করিতে হইল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা আলাউদ্দিনকে তিনি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন; সেই আলাউদ্দিনই তাঁহার প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আলাউদ্দিনকে তিনি অযোধ্যা ও কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তথা হইতে আলাউদ্দিন দেবগিরির যাদব রাজ্য জয় করিয়া বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া আলাউদ্দিন সুলতানকে কারাতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আত্মরক্ষার বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত না করিয়াই সুলতান এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিয়া গেলেন এবং আলাউদ্দিনের অনুচরগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পরই আলাউদ্দিনের অনুচরগণ আলাউদ্দিনকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া চতুর্দিকে ঘোষণা করিয়া দিল (১২৯৬ খৃঃ)। দিল্লীতে এই

আলাউদ্দিন কর্তৃক জালালুদ্দিনের হত্যা

আলাউদ্দিনের সিংহাসনে আরোহণ

সংবাদ পৌঁছিলে জালালুদ্দিনের পুত্রকে সিংহাসনে বসান হইয়াছিল। পাঁচ মাস পরে আলাউদ্দিন দিল্লী অধিকার করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। জালালুদ্দিনের পুত্র মুলতানে পলাইয়া গেল।

জনসাধারণের মন হইতে এই নৃশংস পাপকার্যের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার জন্য আলাউদ্দিন দিল্লী যাইবার পথে দুইধারে মোহর ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুক্তহস্তে উপাধি ও ধনরত্ন বিতরণ করিয়া তিনি লোকের মনের বিরাগ দূর করিতে চেষ্টা করিলেন এবং বহু পরিমাণে সফলও হইলেন।

মোগল আক্রমণ। আলাউদ্দিনের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরে মোগলগণ পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। একবার তাহারা রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু সুলতান প্রতিবারই তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সমুদয় যুদ্ধে সহস্র সহস্র মোগল নিহত হইয়াছিল। বন্দী মোগল সৈন্য ও সেনানায়কগণকে হাতীর পায়ের তলায় পিষিয়া মারা হইত। নিহত মোগলগণের মস্তকগুলি দুর্গাকারে সাজাইয়া রাখা হইত।

দিল্লীর নিকট প্রতিষ্ঠিত "নব মুসলমান" নামে পরিচিত মোগলগণের প্রতিও আলাউদ্দিন অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিলেন। একবার কয়েকজন মোগল তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। সুলতান আলাউদ্দিন ইহা জানিতে পারিয়া আদেশ করিলেন যে, "নব মুসলমানদিগকে" সমূলে ধ্বংস করা হউক, এবং একদিনেই বিশ ত্রিশ হাজার মোগলকে মারিয়া ফেলা হইল।

এই সমুদয় ব্যাপারে মোগলেরা এত ভয় পাইয়াছিল যে, আলাউদ্দিনের রাজত্বে আর কখনও তাহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই।

আলাউদ্দিনের রাজ্যবিস্তার। ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য আলাউদ্দিনের সময়েই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল; এই জন্যই আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি গুজরাটের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়া ঐ দেশ অধিকার করেন (১২৯৭ খৃঃ অঃ)। গুজরাটের রাণী কমলাদেবী বন্দিনী হইয়া আলাউদ্দিনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং আলাউদ্দিনের একজন প্রিয়তমা মহিষীরূপে পরিগণিত হইলেন। সম্ভবত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক বন্ধনের ইহাই প্রাচীনতম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

গুজরাট বিজয়

কমলাদেবী

১২৯৯ খৃঃ অঃ আলাউদ্দিন বিখ্যাত রণথম্ভোর (রণস্তম্ভপুর) দুর্গ আক্রমণ করেন। জালালুদ্দিন খিল্‌জী পূর্বে একবার এই দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকার করিতে পারেন নাই। দুর্গের অধিপতি রাজপুতবীর হম্মীরদেব দুর্গের বাহিরে আসিয়া আলাউদ্দিনের সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন। অতঃপর সুলতান আলাউদ্দিন স্বয়ং আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। অবশেষে হম্মীরদেব তাঁহার দুইজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হন, এবং সুলতান ঐ দুর্গ অধিকার করেন (১৩০১ খৃঃ অঃ)।

রণথম্ভোর বিজয়

মেবারের রাণা রতনসিংহের পত্নী রাণী পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আলাউদ্দিন ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে চিতোরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিলেন।* বিখ্যাত গোরা,

পদ্মিনী

বাদল ও চিতোরের অন্যান্য রাজপুত বীরগণ প্রাণপণ যুঝিয়াও চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু চিতোরের পতনেও আলাউদ্দিনের পদ্মিনী লাভ হইল না। ভীষণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সহচরীগণসহ রাণী পদ্মিনী জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।*

চিতোর বিজয়

এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পনর বৎসরের মধ্যেই মেবারের বীর রাণা হম্মীর চিতোর উদ্ধার করিয়া মেবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

চিতোরের পুনরুদ্ধার

চিতোর জয়ের কয়েক বৎসর পরই আলাউদ্দিন মালবদেশ অধিকার করেন। এইরূপে ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র আর্যাবর্তে তাঁহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মালব বিজয়

দাক্ষিণাত্যে অভিযান। দাক্ষিণাত্য বিজয়ই আলাউদ্দিনের রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন যখন অযোধ্যা ও কারা প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি দেবগিরির যাদব রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইয়া, রাজ্যের কতক অংশ আলাউদ্দিনকে ছাড়িয়া দিয়া, এবং প্রভূত অর্থ উপহার দিয়া রামচন্দ্র আলাউদ্দিনের সহিত সন্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র গুজরাটের পলায়িত রাজাকে আশ্রয় দেওয়ায় এবং রীতিমত কর না দেওয়ায় ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে আর এক অভিযান প্রেরিত হইল। এই অভিযানের সেনাপতি ছিলেন—মালিক্

দেবগিরি বিজয়

* পদ্মিনীর উপাখ্যানের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন।

কাফুর। তিনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন, কিন্তু ক্রমশ আলাউদ্দিনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে মালিক্ কাফুর রামচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। রামচন্দ্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন এবং করদানে স্বীকৃত হন। মালিক্ কাফুরের প্রথম অভিযান

১৩০৯ খৃষ্টাব্দে কাফুর তেলিংগানার কাকতীয়রাজ প্রতাপ-রুদ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রাজা প্রথমে বীরবিক্রমে রাজধানী বরংগল রক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু অবশেষে সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ ও বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করেন। কাফুরের দ্বিতীয় অভিযান

১৩১০ খৃষ্টাব্দে কাফুর দোরসমুদ্রের হোয়্সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালকে পরাজিত করেন। বিস্তর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তিনি বীরবল্লালকে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। অতঃপর মাদুরার পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করিয়া কাফুর রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজাকে পরাজিত করেন। ১৩১১ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী বীর কাফুর দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। কাফুরের তৃতীয় অভিযান

১৩০৯ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র শংকর স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, কিন্তু মালিক্ কাফুর তাঁহাকেও পরাজিত ও নিহত করিলেন (১৩১২ খৃঃ অঃ)। কাফুরের চতুর্থ অভিযান

দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে মালিক্ কাফুরের অদ্ভুত বিজযাভিযান ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিল। একে একে প্রাচীন রাজ্যসমূহ মুসলমান শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিল এবং ১৩১২ খৃষ্টাব্দে প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষই আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আলাউদ্দিনের চরিত্র। সুলতান আলাউদ্দিন সাহসী, বুদ্ধিমান ও সমর-কুশল ছিলেন। তিনি নিজ বাহুবলে বহু দূরদেশ জয় করিয়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু এই উচ্চ রাজপদের যোগ্যতা তাঁহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন, এবং ধর্মজ্ঞান ও নীতির কোন ধার ধারিতেন না। সামরিক শৃংখলা বিধান ও কঠোর স্বেচ্ছাচারিতাদ্বারা তিনি রাজ্যমধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিয়া, তিনি অনেক পরিমাণে জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অশিক্ষিত, চরিত্রহীন, অহংকারী, অস্থিরমতি এবং একান্ত

খামখেয়াল

খামখেয়ালী ছিলেন। তিনি নিজকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বলিয়া ঘোষণা করেন। এক সময় তিনি এক নূতন ধর্মপ্রচারের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা একত্র হইলেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে এই আশংকায় তিনি নিয়ম করিলেন যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এই সমুদয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক অনুষ্ঠান এমন কি প্রীতিমিলন পর্যন্ত হইতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্যে মদ্যপানও নিষিদ্ধ হইল। সাধারণ প্রজাগণ, বিশেষত

অত্যাচার

হিন্দুগণের উপরও তিনি অনেক অত্যচার করিয়াছেন। তাহাদিগকে করভারে প্রপীড়িত করিয়া এমন দরিদ্র অবস্থায় রাখা হইত, যাহাতে তাহারা কোন প্রকার ভাল কাপড়চোপড় পরিধান করা, অশ্ব বা অন্য যানবাহন রাখা, বা অন্য কোন প্রকার বিলাসিতা উপভোগ করিতে না পারে। দেশময় তাঁহার বহু গুপ্তচর ছিল। তাহারা

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত খবর আনিয়া আলাউদ্দিনকে দিত। আলাউদ্দিনের গুপ্তচরের ভয়ে কেহ মুখ ফুটিয়া কথাও বলিতে পারিত না। তিনি যে কেবল অপরাধীদেরই দণ্ডবিধান করিতেন, তাহা নহে, তাহাদের স্ত্রীপুত্রদের উপরও অত্যাচার করিতেন। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হইল না। চারিদিকে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দেখা দিতে লাগিল। এই প্রকার গোলযোগের মধ্যে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইল। কেহ কেহ বলেন, শেষ অবস্থায় মালিক্ কাফুর তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। নিষ্ঠুরতা

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে অরাজকতা। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরবর্তী পাঁচ বৎসরে দেশে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। সুলতানের এক শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া, মালিক্ কাফুর তাঁহার নামে রাজত্ব ও যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ৩৫ দিন মাত্র এই শিশু সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই রাজবংশের প্রায় সমস্ত ব্যক্তির উপরই অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল। কেহ বন্দী, কেহ হত, আবার কাহাকেও বা অন্ধ করা হইল। অবশেষে কয়েকজন ক্রীতদাস ষড়যন্ত্র করিয়া কাফুরকে হত্যা করিল।

খিল্‌জী বংশের অবসান। কাফুরের মৃত্যুর পর কুতবুদ্দিন মবারক শাহ্ নামক আলাউদ্দিনের আর এক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩১৬)। মবারক প্রথমে বেশ্ কার্যদক্ষতা দেখাইলেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের জামাতা হরপাল বিদ্রোহী হইলে মবারক তাহাকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি কাকতীয়দিগের রাজধানী

বরংগল জয় করেন। কিন্তু এই সমুদয় যুদ্ধ জয় করার পরে মবারক বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। রাজা মদ্যপান ও নানারূপ অকথ্য ব্যভিচারে মগ্ন থাকায় ক্রমেই রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। খসৃরু নামে একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী নীচজাতীয় হিন্দু মবারকের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সুবিধা বুঝিয়া খসৃরুই অবশেষে মবারককে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩২০ খৃঃ অঃ)। খসৃরু রাজা হইয়া নসিরুদ্দিন উপাধি ধারণ করিলেন এবং সর্বপ্রকারে হিন্দুগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রকাশ্যে মুসলমান ধর্মের অবমাননা করায় রাজ্যের ওমরাহ্‌গণ ক্রুদ্ধ হইয়া খসৃরুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গাজী মালিক নামক একজন তুরস্ক দেশীয় ওমরাহ্‌ পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্তা ছিলেন। দিল্লীর ওমরাহ্‌গণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া খসৃরুকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। বিগত পাঁচ বৎসরে খিল্‌জী রাজবংশের সমস্ত ব্যক্তিই নিহত হইয়াছিল। অতএব ওমরাহ্‌গণের অনুরোধে গাজী মালিক 'ঘিয়াসুদ্দিন তুঘ্‌লক' এই নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩২০ খৃঃ অঃ)। ইনি ইতিহাসে তুঘ্‌লক শাহ্‌ নামেও পরিচিত।

তৃতীয় অধ্যায়

তুঘ্লক বংশ

ঘিয়াসুদ্দিন তুঘ্লক। ঘিয়াসুদ্দিন তুঘ্লকের পিতা ঘিয়াসুদ্দিন বল্বনের একজন তুরস্ক জাতীয় ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার মাতা জাঠবংশের একজন হিন্দু রমণী। সুতরাং ঘিয়াসুদ্দিন তুঘ্লকই প্রথম মুসলমান রাজা—যাঁহার ধমনীতে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত ছিল। ঘিয়াসুদ্দিন একজন যোগ্য এবং সদাশয় নরপতি ছিলেন। তিনি শীঘ্রই দেশে শান্তি ও শৃংখলা ফিরাইয়া আনিলেন। রাজ্যে শৃংখলা বিধান করিয়া তিনি তাঁহার পুত্র জুনা খাঁর অধীনে দাক্ষিণাত্যে এক অভিযান প্রেরণ করিলেন। জুনা খাঁ বরংগল অধিকার করিলেন। বঙ্গদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ঘিয়াসুদ্দিন স্বয়ং তাহা দমন করিতে বঙ্গদেশে গমন করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ত্রিহুত জয় করিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে জুনা খাঁ প্রকাণ্ড এক কাষ্ঠনির্মিত গৃহ নির্মাণ করিয়া, মহাসমারোহে পিতাকে সেখানে অভ্যর্থনা করিলেন। সহসা সেই কাঠের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাওয়ায় সুলতান নিহত হইলেন (১৩২৫ খৃষ্টাব্দ)। অনেকের বিশ্বাস যে, এই দুর্ঘটনা দৈবক্রমে ঘটে নাই, জুনা খাঁর ষড়যন্ত্রমতেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

মুহম্মদ তুঘ্লক। জুনা খাঁ তখন সুলতান মুহম্মদ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই রাজার

মুহম্মদ তুঘ্‌লকের অদ্ভুত চরিত্র

মত অদ্ভুত রাজা পৃথিবীতে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বহু গুণ ছিল,—তিনি বিদ্বান্, কবি, সাহসী ও সমর-কুশল ছিলেন এবং মুসলমান ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি রীতিমত নমাজ পড়িতেন, কখনও মদ্য স্পর্শ করিতেন না, এবং ইস্‌লাম ধর্মের রীতি-নীতি মানিয়া চলিতেন। কিন্তু বিকৃত বিচারবুদ্ধির প্রভাবে এবং অপরের দুঃখের প্রতি সহানুভূতির একান্ত অভাবে তাঁহার এই সমস্ত গুণ একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। তিনি আজীবন নানাপ্রকার অদ্ভুত ও অসম্ভব ব্যাপারের সাধন করিতে যাইয়া, নিজের ও রাজ্যের সর্বনাশ করিলেন।

তাঁহার প্রশংসনীয় কার্যাবলী

তাঁহার কতকগুলি কার্য সদাশয়তা, যোগ্যতা ও মহত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, তিনি ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে হোয়্‌সলরাজকে পরাজিত করিয়া সমগ্র দক্ষিণ ভারত সম্পূর্ণরূপে স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যের দূরতম প্রদেশেরও শাসনকার্যে সুশৃংখলা বিধান করিয়াছিলেন। দেশময় তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় ও দানশালা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং মুসলমান পণ্ডিতগণের জন্য প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সমুদয় গুণের জন্যই মিশর দেশের খলিফা কর্তৃক সুলতান মুহম্মদ ভারতবর্ষের রাজারূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মুহম্মদ তুঘলকের অদ্ভুত কার্যাবলী। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য কার্যকলাপ এবং তজ্জনিত প্রজাসাধারণের অসীম কষ্টের কথা স্মরণ করিলে, তাঁহার সৎকার্যসমূহও অত্যন্ত নগণ্য বলিয়া মনে হয়। তিনি প্রথমেই প্রজাগণের কর অসম্ভব রকম

বাড়াইয়া দেন। ফলে কৃষকগণ সর্বস্বান্ত হইয়া বনে জঙ্গলে পলায়ন করে, এবং শস্যক্ষেত্র রীতিমত চাষ না হওয়ায় দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়।

তারপর রাজার আবার অন্য এক খেয়াল চাপিল। তিনি দিল্লী হইতে দেবগিরিতে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। দেবগিরির নূতন নাম হইল দৌলতাবাদ। দিল্লীর অধিবাসিগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইল এবং সুলতানের অদ্ভুত কার্যাবলীর জন্য উপহাস করিয়া বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিল। তাই তিনি দিল্লীর অধিবাসীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য আদেশ করিলেন—দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীকে তাহাদের যথাসর্বস্ব নিয়া দেবগিরিতে চলিয়া যাইতে হইবে। নির্দিষ্ট তারিখের পরে যদি কাহাকেও দিল্লীতে দেখা যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ফলে দিল্লী প্রায় জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইল। আট বৎসর পরে আবার দিল্লীর অধিবাসিগণ দিল্লীতে ফিরিবার অনুমতি পাইল। কিন্তু এই যাতায়াতে লোকের কষ্টের আর অবধি রহিল না। অবশ্য মুহম্মদ তুঘ্‌লক অর্থদ্বারা অনেককে সাহায্য করিয়াছিলেন।

সুলতান অর্থের অভাব দূর করিবার জন্য এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। বর্তমানকালে যেমন টাকার বদলে কাগজের নোট চলে, তিনি তেমনি তামার নোট চালাইতে কৃতসংকল্প হইলেন; অর্থাৎ এক একটি তাম্রখণ্ড লইয়া তিনি তাহার উপর লিখিলেন, ইহা এক টাকার সমান, ইহা দুই টাকার সমান ইত্যাদি। কিন্তু জাল করার বিরুদ্ধে যখন উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বিত হয়, তখনই টাকার পরিবর্তে নোটের

তামার নোট

প্রথা চলিতে পারে। তাহা না থাকায় সকলেই এই তামার টাকা তৈরী করিয়া লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইতে লাগিল। কাজেই এই উদ্যম একেবারে বিফল হইল। বিদেশীয় বণিক্‌গণ এই তামার নোট লইতে সম্মত হইল না; ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইল, দেশময় গোলমাল হুলস্থূল চলিতে লাগিল। মুহম্মদ তুঘ্‌লকের সততার সপক্ষে একথা উল্লেখ করিতে হইবে যে, তিনি রাজকোষ হইতে এই সমস্ত জাল টাকার পূরাপূরি মূল্য শোধ করিয়া দিয়াছিলেন।

পারস্ত বিজয় চেষ্টা

সুলতান মুহম্মদ একবার পারস্ত জয় করিবার জন্য তিনলক্ষ সত্তর হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। একবৎসর পর্য্যন্ত ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়া, অবশেষে পারস্ত জয় অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি এই সৈন্যদলকে বিদায় দিলেন।

আর একবার ভারতবর্ষ ও চীন দেশের মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশ জয় করিবার জন্য তিনি বিপুল একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সংকীর্ণ গিরিসংকটের মুখে পার্বত্য জাতির আক্রমণে তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়।

এই সমুদয় অত্যাচারের ফল। এই সমুদয় ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। রাজ্যের শাসনশৃংখলা একেবারে নষ্ট হইল এবং রাজ্যের সমস্ত ভাগে বিদ্রোহ দেখা দিল।

রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ

কতকগুলি বিদ্রোহ সুলতান নিজে যাইয়া দমন করিলেন কিন্তু কতকগুলি প্রদেশের বিদ্রোহ আর দমিত হইল না। বঙ্গদেশ, মাদুরা ও বরংগল স্বাধীন হইল এবং দাক্ষিণাত্যে দুইটি বিস্তৃত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাদের একটি ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে

রাজ্য ছিন্নভিন্ন

প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর রাজ্য এবং অপরটি ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাহ্‌মনী রাজ্য।

এই সমুদয় বিদ্রোহের ফলে সম্রাটের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি নিজের প্রজাগণের প্রতি পরাজিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। একদল সৈন্য লইয়া তিনি হিন্দুস্থান ছারখার করিতে লাগিলেন। প্রজারা ভয়ে জংগলে পলাইল, কিন্তু সুলতান জংগল ঘিরিয়া বন্য পশুর ন্যায় তাহাদিগকে বধ করিলেন। সমসাময়িক লেখকগণ তাঁহার এইরূপ নিষ্ঠুরতার বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ

সম্রাটের রাজত্বের শেষ কয় বৎসর বিদ্রোহদমনেই ব্যয়িত হইল। গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করিতে তাঁহার তিন বৎসর লাগিল, এবং ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের এক বিদ্রোহীর পশ্চাদ্ধাবন করিবার সময় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

তাঁহার মৃত্যু

ফিরোজ শাহ। মুহম্মদ তুঘ্‌লকের মৃত্যুর পর হিন্দু ও মুসলমান আমিরগণ একত্র হইয়া সুলতানের খুল্লতাতপুত্র ফিরোজ তুঘ্‌লককে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। মুহম্মদ তুঘ্‌লকও ইঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। ফিরোজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজ্যের শৃংখলা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। তিনি দুইবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করেন, কিন্তু সিন্ধুদেশ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না। যুদ্ধে তিনি তেমন সফলতা দেখাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল নগর, দুর্গ, মস্‌জিদ,

বঙ্গ ও সিন্ধু উদ্ধারে বিফলতা

জনহিতকর অনুষ্ঠান

বিদ্যায়তন, হাসপাতাল, সরাইখানা ও সেতু, বাঁধ, খাল ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তিনি ফিরোজাবাদ নামে দিল্লীতে এক নূতন সহর পত্তন করেন এবং তাহার চারিপাশে প্রায় ১২০০ উদ্যান নির্মাণ করেন। মোটের উপর তিনি একজন সদাশয় নৃপতি ছিলেন এবং রাজ্যশাসন-পদ্ধতির অনেক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। তিনি কয়েদীর হস্তপদচ্ছেদন ও নানারূপ অমানুষিক যন্ত্রণা প্রদান প্রথা রহিত করেন, এবং নানাবিধ আব্‌ওয়াব উঠাইয়া দিয়া প্রজার করভার লাঘব করেন। তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং বিদ্বানের সমাদর করিতেন, কিন্তু তিনি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান ও হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করিতেন। সকল হিন্দুকেই জিজিয়া নামক কর দিতে হইত। ফিরোজের রাজত্বের শেষভাগে রাজ্যে বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে সুলতান ফিরোজের মৃত্যু হয়।

ফিরোজ শাহের পরবর্তিগণ। ফিরোজ শাহের পরে কয়েকজন নামে মাত্র রাজা পর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লীর রাজ্য তখন দিল্লী সহর এবং তাহার চারিদিকের কিঞ্চিৎ ভূ-ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ ইতিমধ্যে প্রাদেশিক শাসন-কর্তাগণ সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ১৩৯৪ হইতে ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নসিরুদ্দিন মামুদ এবং নসরৎ শাহ নামে দুইজন রাজা যখন দিল্লীর সিংহাসনের জন্য পরস্পর দ্বন্দ্ব করিতেছিলেন, তখন ভারতের এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। রক্তপিপাসু তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন।

মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস

তৈমুরের ভারতবর্ষ আক্রমণ। আমীর তৈমুর তুরস্কজাতীয় চাঘ্‌তাই বংশের নায়ক ও সমরখন্দের রাজা ছিলেন। তিনি খোঁড়া ছিলেন বলিয়া তৈমুরলঙ্গ নামে পরিচিত হন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং পথে নিষ্ঠুর অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড করিতে করিতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। পানিপথের নিকট মামুদ তুঘ্‌লককে তিনি অনায়াসে পরাজিত করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন এবং নিজকে ভারতবর্ষের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যে সকল ঘোরতর নিষ্ঠুর ও হিংস্র-স্বভাব অত্যাচারীর বিবরণে পৃথিবীর ইতিহাস কলংকিত হইয়াছে, তৈমুর তাহাদের একজন। দিল্লীতে আসিবার পথে তিনি একলক্ষ বন্দীকে হত্যা করিলেন। তাহার পরে তিনি দিল্লী অধিকার করিয়া তিন দিন পর্যন্ত অকথ্য নিষ্ঠুর অত্যাচার করিলেন।

দিল্লী অধিকার

লক্ষ হিন্দু বন্দীর হত্যা

সৈয়দ বংশ। তৈমুর অসীম ধনরত্ন ও কতকগুলি কলাকুশল শিল্পী সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া গেলেন; আর ভারতবর্ষে রাখিয়া গেলেন—অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। দিল্লীর রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা তখন এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। মামুদ তুঘ্‌লক নামমাত্র আরও কয়েক বৎসর রাজত্ব করিলেন। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে তুরস্কজাতির আধিপত্য শেষ হয়। মোটের উপর প্রায় ২০০ বৎসর ইহারা ভারতে রাজত্ব করে।

মামুদের মৃত্যুর পর ওমরাহ্‌ দৌলৎ খাঁ লোদী দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তৈমুরের প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ দিল্লী অধিকার

করেন (১৪১৪ খৃঃ অঃ)। তিনি তৈমুরের পুত্রের নামে রাজ্য শাসন করিতেন ও মাঝে মাঝে উক্ত রাজার নিকট রাজকর পাঠাইতেন। খিজির খাঁ এবং তাঁহার পরবর্তী তিনজন সুলতান দিল্লী এবং তাহার চারিদিকের স্বল্প পরিমাণ ভূ-ভাগে ১৪১৪ হইতে ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারা মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। এই জন্যই এই বংশকে সৈয়দ বংশ বলে। এই বংশের শেষ রাজা আলাউদ্দিন আলম শাহকে বিতাড়িত করিয়া বাহ্‌লুল লোদী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা হইল (১৪৫১ খৃষ্টাব্দে)।

পাঠান লোদী বংশ

বাহ্‌লুল লোদী আফগান বা পাঠান ছিলেন * এবং লোদী বংশই ভারতের প্রথম পাঠান রাজবংশ। অনেকে কিন্তু ভুল করিয়া পূর্বেকার সমস্ত মুসলমান রাজবংশকেই পাঠান বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে তুরস্ক বলিলেই ঠিক বলা হয়।

---

* লোদী বংশ তুরস্ক জাতীয় হইলেও সুদীর্ঘকাল আফগানিস্থানে বসবাস করায় আফগান বলিয়া গণ্য হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানগণের পতনের পর ভারতবর্ষের অবস্থা

মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। তারপর তৈমুরের আক্রমণের ফলে যে অরাজকতা ও গোলযোগ উপস্থিত হয় সেই সুযোগে জৌনপুর, মালব, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমেই বিশাল দিল্লী সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই সমুদয়ের মধ্যে যে রাজ্যগুলি বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এই অধ্যায়ে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

বঙ্গদেশ। তুগ্রিলের স্বাধীনতা অবলম্বনের নিষ্ফল চেষ্টার কিরূপ শোচনীয় ফল ফলিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। ঘিয়াসুদ্দিন বল্‌বন ভয়ংকর কঠোরতার সহিত এই বিদ্রোহ দমন করিয়া নিজের দ্বিতীয় পুত্র বঘ্‌রা খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। বঘ্‌রার পুত্র কায়কোবাদ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন বঘ্‌রা খাঁ বাঙলা দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইলেন। প্রথমে মুসলমান শাসন উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বঘ্‌রা খাঁর পরে তাঁহার দুই পুত্র যথাক্রমে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ জয় করেন এবং লক্ষ্মণসেনের

বঙ্গদেশের স্বাধীনতা

শেষ বংশধরগণকে ঐ সকল স্থান হইতে বিতাড়িত করেন। বঘ্‌রা খাঁর উত্তরাধিকারিগণের শাসনাধীনে সমগ্র বঙ্গদেশ বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। অবশেষে ঘিয়াসুদ্দিন তুঘ্‌লকের সময়ে (১৩২৪ খৃঃ) বঙ্গদেশ আবার দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে।

মুহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বকালে আবার বঙ্গদেশ স্বাধীন হয়। ১৩৩৯ খৃঃ অব্দে পূর্ববঙ্গে ফখরুদ্দিন প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে কিছুদিন পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এক একজন নায়কের আবির্ভাব হয় ও উহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে। অবশেষে আঃ ১৩৫২-৩ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের অধিপতি সামসুদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ সমগ্র বঙ্গদেশে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস্ শাহ পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা ও ত্রিহুত হইতে কর আদায় করেন এবং বারাণসী পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করেন।

ইলিয়াস্ শাহের নেতৃত্বে বঙ্গ পুনরায় স্বাধীন

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সুলতান ফিরোজ তুঘ্‌লক বঙ্গদেশ পুনরুদ্ধারের জন্য দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইলিয়াস্ শাহ এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ দুইবারই একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফিরোজ তুঘ্‌লক বহু চেষ্টা করিয়াও একডালা দুর্গ দখল করিতে না পারিয়া অবশেষে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

রাজা গণেশ

ইলিয়াস্ শাহের বংশ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে। এই সময়ে গণেশ নামে একজন হিন্দু জমিদার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, এবং ইলিয়াস্ শাহের বংশধরগণকে সরাইয়া নিজে

বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়েই আবার আমরা বঙ্গদেশের সিংহাসনে দনুজমর্দনদেব নামে এক হিন্দুকে দেখিতে পাই। ইনি উত্তর-পশ্চিমে পাণ্ডুয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, গণেশ নিজেই দনুজমর্দন নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গণেশের পরে তাঁহার পুত্র যদু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দিন মুহম্মদ নামে পরিচিত হন। যদুর পর তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ্ রাজা হন। রাজ্যের ওমরাহ্‌গণ ষড়যন্ত্র করিয়া আহম্মদ শাহকে হত্যা করে এবং ইলিয়াস্ শাহের এক বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপন করে (১৪৪২ খৃঃ)। তিনি এবং তাঁহার চারিজন বংশধর ১৪৪২ হইতে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পূর্ববর্তী রাজাদের আমলে হাব্‌সী খোজাগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এইবার একজন খোজা রাজাকে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসন গ্রহণ করিল। অতঃপর সাত বৎসর পর্যন্ত এই সমুদয় খোজারাই রাজশক্তি পরিচালিত করে। অরাজকতায় অস্থির হইয়া অতঃপর দেশের হিন্দু ও মুসলমান আমিরগণ বিদ্রোহী হন এবং রাজাকে হত্যা করিয়া আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নামক একজন যোগ্য ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করেন (১৪৯৩ খৃঃ)। বঙ্গদেশের মুসলমান রাজগণের মধ্যে হোসেন শাহই সমধিক বিখ্যাত। তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত। হোসেন শাহ ত্রিপুরার এক অংশ ও বিহার জয় করেন এবং আসাম ও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহের পুত্র

ইলিয়াস্ শাহী বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

হাব্‌সী সুলতান

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

নসরৎ শাহ

নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ~~তাঁহার সহিত মুঘল সম্রাট বাবরের যুদ্ধের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।~~

মালব। ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী মালব জয় করেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উহা দিল্লীর শাসনাধীনে ছিল। এই সময়ে তৈমুরের আক্রমণের সুযোগে মালবের শাসনকর্তা দিলাবর খান ঘোরী এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা মুহম্মদ ঘোরী তাঁহার মন্ত্রী মামুদ খাঁ কর্তৃক বিষ-প্রয়োগে নিহত হন, এবং এই হত্যাকারী মন্ত্রী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই নূতন সুলতান রাজা হিসাবে ভালই ছিলেন। তিনি বিনয়ী, সাহসী, ন্যায়পরায়ণ ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রজারা উভয়েই সুখে কালযাপন করিত। তিনি বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন এবং সারা জীবনই প্রায় যুদ্ধে কাটাইয়াছেন। দক্ষিণে সাতপুরা পর্বত ও পূর্বে বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত তিনি রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। উত্তরে মেবার * ও পশ্চিমে গুজরাট রাজ্যের সহিত তিনি সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি বাহমনী রাজাকে পরাজিত করেন, কিন্তু দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া বিফলমনোরথ হন। তাঁহার পুত্র ঘিয়াসউদ্দিন (১৪৬৯—১৫০০) স্বীয় পুত্রের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। ঘিয়াসউদ্দিনের পৌত্র দ্বিতীয় মামুদের সময়ে রাজ্যে বিষম বিশৃংখলা উপস্থিত হয় এবং মামুদ রাজ্য হইতে বিতাড়িত

ঘোরীবংশ

খিলজী বংশ

মেবারের সহিত যুদ্ধ

শেষ রাজা দ্বিতীয় মামুদ

---

* মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে মেবার রাজ পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজপুত আখ্যান অনুসারে রাণা কুম্ভ মামুদকে পরাজিত ও বন্দী করেন। উভয়েই বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন।

হন। তাঁহার রাজপুত সেনাপতি মেদিনী রাওয়ের সাহায্যে তিনি রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। এই অকৃতজ্ঞ রাজা পরে তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতিকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিলেন। মেদিনী রাও মহারাণা সঙ্গের সাহায্যে দ্বিতীয় মামুদকে বন্দী করিয়া চিতোরে লইয়া যান। মহারাণার অনুগ্রহে দ্বিতীয় মামুদ রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত আবার গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। বাহাদুর শাহ দ্বিতীয় মামুদকে পরাজিত করিয়া মালব গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন (১৫৩১ খৃঃ) মালব গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত

মালব রাজ্যের রাজধানী প্রথমে ধারা নগরীতে ছিল। পরে উহা মাণ্ডুতে স্থানান্তরিত হয়।

গুজরাট। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক গুজরাট দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্তা জাফর খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া নসিরুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (১৪০৩)। জাফর খাঁ আবার ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে নিজের পুত্রকে হত্যা করিয়া, মুজফ্ফর শাহ এই নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু তাঁহার পৌত্র আহম্মদ শাহ চারি বৎসর পরে তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। আহম্মদ শাহ

আহম্মদ শাহ একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনি শাসনকার্যের উন্নতি বিধান করেন এবং মালবরাজ ও সন্নিহিত অন্যান্য রাজপুত রাজাকে পরাজিত করিয়া চারিদিকে নিজের রাজ্য বিস্তার করেন। সুপ্রসিদ্ধ আহম্মদাবাদ নগরটি

তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার দীর্ঘ ৩১ বৎসর রাজত্বকালে (১৪১১—১৪৪২) গুজরাট একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। আহম্মদ শাহই প্রকৃত পক্ষে গুজরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মামুদ বিগরহ

তাঁহার পৌত্র মামুদ বিগরহ (১৪৫৮—১৫১১ খৃঃ) নিতান্ত অল্প বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁহার কার্যাবলী এবং ব্যক্তিগত বিশেষত্বগুলি এমনই অদ্ভুত ছিল যে, ভ্রমণকারিগণের মুখে মুখে নানা উপন্যাসের আকারে তাহা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বহু যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন এবং জুনাগড়, ও চম্পানীর দুর্গ এবং কচ্ছ প্রদেশ জয় করেন। কিন্তু মেবারের মহারাণা কুম্ভের সহিত অনেক যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন।

তুরস্কের সুলতানের সহযোগে পর্তুগীজগণকে দূরীকরণের চেষ্টা

তুরস্কের সুলতানের সহিত একযোগে তিনি পর্তুগীজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া ভারতসাগরের বাণিজ্য ভারতীয়গণের পক্ষে নিরাপদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিলিত তুর্কী ও গুজরাটী নৌবহর পর্তুগীজ নৌবহরকে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে চউলের নিকট পরাজিত করে। কিন্তু পর বৎসর ডিউ নামক স্থানের অনতিদূরে গুজরাটী নৌবহর পর্তুগীজগণ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ইহার পর হইতে ভারতমহাসাগরে পর্তুগীজগণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল।

দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর

মামুদ বিগরহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুজফ্‌ফর শাহের মাতা রাজপুত কুমারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে মুজফ্‌ফর শাহ

রাজপুতদের সহিত যুদ্ধ

রাজপুতগণের সহিত বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং পুনঃপুনঃ

মেবারের রাণা এবং অন্যান্য রাজপুত রাজাকর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। মুজফ্ফর শাহের পরে ক্রমান্বয়ে তাঁহার তিন পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্বশেষ রাজা বাহাদুর শাহ ১৫২৬ হইতে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব-বর্ণিত মালব বিজয় ছাড়া বাহাদুর ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে চিতোর দুর্গও দখল করিয়াছিলেন। বাহাদুরের রাজত্বের অন্যান্য ঘটনা হুমায়ুনের রাজত্বের বর্ণনায় বিবৃত হইবে।

মালব ও চিতোর বিজয়

বাহ্মনী রাজ্য। মুহম্মদ তুঘ্লকের রাজ্যের ঘোর দুর্দিনে দাক্ষিণাত্যের আমিরগণ বিদ্রোহী হইয়া এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে হাসান নামক একজন সাহসী যোদ্ধাকে এই রাজ্যের রাজপদে বরণ করে। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি আলাউদ্দিন হাসান বাহ্মন শাহ এই উপাধি ধারণ করেন। হাসান প্রতিষ্ঠিত বংশ বাহ্মনী বংশ বলিয়া বিখ্যাত এবং তাঁহার রাজ্যও ঐ নামে পরিচিত। সাধারণের বিশ্বাস যে, হাসান শৈশবকালে এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত নিজের প্রতিষ্ঠিত বংশের ঐরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কারণ বোধ হয় এই যে,—হাসান প্রাচীন পারস্যের বাহ্মন শাহ নামক একজন রাজার বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন, এবং সেইজন্য বাহ্মন উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

বাহ্মনীর অর্থ

এই নূতন সুলতান দ্রুতগতিতে স্বরাজ্যের বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। ১৩৫৮* খৃষ্টাব্দে যখন হাসান পরলোক গমন করিলেন, তখন এই রাজ্যের উত্তর সীমা পেনগঙ্গা, দক্ষিণ সীমা কৃষ্ণা নদী

রাজ্যের সীমানা

* মতান্তরে ১৩৫৯

এবং পূর্ব সীমা ছিল বর্তমান নিজামের রাজ্যস্থিত ভোনগিরি নামক নগর। পশ্চিমে ইহা সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং গোয়া ও দাভোল এই দুইটি বিখ্যাত বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই বিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী ছিল গুল্‌বর্গা নগরীতে। হাসানের নাম অনুসারে নূতন রাজধানীর নামকরণ হইয়াছিল হাসানাবাদ।

বাহ্‌মনী রাজ্যের ইতিহাসের মূলসূত্র

১৩৪৭ হইতে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মোট চৌদ্দ জন সুলতান এই রাজ্যে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্বের ইতিহাসে বিজয়নগর এবং বরংগল এই হিন্দু রাজ্য দুইটির বিরুদ্ধে পুনঃপুন লোক-ক্ষয়কারী সংগ্রাম, হিন্দুগণের উপর অত্যাচার, দরবারের বিভিন্ন দলের মধ্যে রেষারেষি, বিবাদ ও নরহত্যা, এবং দ্রুত রাজপরিবর্তন, এই সকল বিশ্রী ব্যাপার ভিন্ন আর বেশি কিছু নাই।

এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ফিরোজ শাহ ১৩৯৭ হইতে ১৪২২ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের আকবর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন এবং রাজধানী গুল্‌বর্গায় অনেক মনোরম-অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তিনি দুইবার বিজয়নগরের রাজাকে পরাজিত করেন, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে নিজেই পরাজিত হন। তিনি বিজয়নগরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং ন্যায়-পরায়ণতার সহিত রাজ্য শাসন করিতেন।

তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে বরংগল অধিকার করেন এবং বিদর নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। শীঘ্রই এই নগর বাহ্‌মনী রাজ্যের

রাজধানীতে পরিণত হয়। কিন্তু বিজয়নগর রাজ্য থাকায় দক্ষিণে বাহ্‌মনী রাজ্য বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। এই বংশের সমুদয় রাজার সবিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই তাঁহাদের রাজ্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইবে। '১৪ জন রাজার মধ্যে ৪ জন গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেয় এবং ২ জনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহাদের চোখ উপ্‌ড়াইয়া ফেলা হয়। একমাত্র পঞ্চম সুলতান ভিন্ন অন্য যে সমস্ত সুলতান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভয়ংকর রক্তপিপাসু ও পরধর্মদ্বেষী ছিলেন।'

মামুদ গাওয়ান্

এই সকল অপদার্থ সুলতানগণের রাজত্ববিবরণে কেবল এক ব্যক্তির নাম সসম্মানে উল্লেখ করিতে হয়। ইনি মামুদ গাওয়ান্। পরধর্মদ্বেষী ও নিষ্ঠুর হইলেও প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল পর্যন্ত ইনি বাহ্‌মনী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন থাকিয়া রাজ্যের কার্য অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও সদ্বিবেচনার সহিত চালাইয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সুলতান তৃতীয় মুহম্মদ শাহ বিরুদ্ধ পক্ষের প্ররোচনায় রাজদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে এই বিজ্ঞ মন্ত্রীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই সময় হইতেই বাহ্‌মনী রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল।

বাহ্‌মনী রাজ্য ধ্বংস

মাহ্‌মুদ শার রাজত্বকালে (১৪৮২—১৫১৮) রাজ্য মধ্যে ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদ নরহত্যা ও বিদ্রোহ চলিতেছিল। এই সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া চারিটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। মাহ্‌মুদের পরে চারিজন নামমাত্র রাজা রাজধানীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ভূ-ভাগের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রী কাশিম বারিদ্ ও তাঁহার পরে তৎপুত্র আমির

বারিদ্ই রাজত্ব করিতেন। অবশেষে ১৫২৭ খৃঃ অব্দে আমির বারিদ্ নিজের নামেই রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।

এইরূপে বাবর যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন বিস্তৃত বাহ্মনী রাজ্য পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বংশের অধীনে পাঁচটি পৃথক্ রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলঃ—(১) বেরারে ইমাদশাহী বংশ, (২) আহম্মদনগরে নিজামশাহী বংশ, (৩) বিজাপুরে আদিলশাহী বংশ, (৪) গোলকুণ্ডায় কুতুব্‌শাহী বংশ, এবং (৫) বিদরে বারিদ্‌শাহী বংশ। মুঘলদিগের সহিত ইহাদের যুদ্ধের ~~ইতিহাস এবং কিরূপে~~ ইহারা অবশেষে মুঘল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত

বিজয়নগর রাজ্য। বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি রহস্যজালে আবৃত। কথিত আছে যে, হরিহর বুক্ক প্রভৃতি পাঁচ ভ্রাতা মিলিয়া উহার প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভবত হোয়্সল-রাজ তৃতীয় বল্লাল দিল্লীর সুলতানগণের আক্রমণ রোধ করিবার জন্য তুংগভদ্রা নদীর দক্ষিণে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ইহাই পরে বিজয়নগর নামে পরিচিত হয়। বিজয়নগরের শাসনকর্তাগণ ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই স্বাধীন রাজগণের মধ্যে হরিহর এবং বুক্ক এই দুই ভ্রাতার নাম প্রথমে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা যাদব বংশীয় বলিয়া দাবি করিতেন। বুক্কের মৃত্যুকালে (১৩৭৮ খৃঃ) কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ প্রায় সমস্ত ভূ-ভাগই বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৮—১৪০৪ খৃঃ) প্রকাশ্যে রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তাঁহার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্ক যাদব বংশ

ইহার পরের উল্লেখযোগ্য রাজা দেবরায় (১৪০৬—১৪১২ খৃঃ)। স্বীয় রাজ্যের এত নিকটেই একটি প্রবল হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় বাহ্‌মনী রাজগণ অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং অনেকবার বিজয়নগর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। দেবরায় এবং তাঁহার পরবর্তী রাজগণের রাজত্বকালে বাহ্‌মনী রাজ্যের সহিত এইরূপ অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছিল, এবং এই সকল যুদ্ধে দুই পক্ষেই ঘোরতর নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হইত। দেবরায় বাহ্‌মনী রাজাকে নিজের কন্যাদান করেন। কিন্তু তাহাতেও এই যুদ্ধ থামিল না, বংশানুক্রমে চলিতে লাগিল। **বাহ্‌মনী ও বিজয়নগর রাজ্যের যুদ্ধ**

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির শাসনকর্তা নরসিংহ বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকাব করিলেন। এই অনধিকারী রাজা কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং তামিলদেশ জয় করিয়া বিজয়নগর রাজ্যের সীমা বাড়াইয়াছিলেন। এই সময় বাহ্‌মনী রাজ্যের অত্যন্ত দুর্দশা উপস্থিত হয়। ইহার কিছু পরেই উহা পাঁচটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল এবং এই সমুদয় রাজ্য, বিশেষত বিজাপুর, উত্তরাধিকারসূত্রে বিজয়নগরের সহিত বিবাদে রত হইল। বিজয়নগররাজ নরসিংহকে সর্বদা এই পাঁচটি রাজ্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইত। **নরসিংহের সিংহাসন অধিকার**

১৫০৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য নূতন এক রাজবংশের হস্তগত হয়। তুলুব সেনাপতি নরস নায়ক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণরায়ের দীর্ঘ বিংশ বর্ষব্যাপী (১৫০৯—১৫২৯ খৃঃ) রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্য **তুলুব বংশ** **কৃষ্ণরায়**

তাঁহার রাজ্য জয়

গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণরায় বিজাপুররাজকে বার বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া একবার বিজাপুর নগর পর্যন্ত অধিকার করেন। তিনি এক সময়ে বাহ্‌মনী রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজধানী গুল্‌বর্গা নগর অধিকার করিয়া, উহার দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। কৃষ্ণরায় যেমন যুদ্ধে বীর ছিলেন, তেমনি অন্যান্য নানাবিধ সদ্‌গুণে মণ্ডিত ছিলেন। এই যুগের ঘোর পরধর্মদ্বেষ, এবং অকথ্য নিষ্ঠুরতার মধ্যে কৃষ্ণরায়ের উদারতা ও মনুষ্যত্বের কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যুগের বিবরণে পাওয়া যায় কেবল হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বীভৎস বিবরণ। কৃষ্ণরায় কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনে কখনও পরাংমুখ হন নাই, এবং বিজিত নগরীর অধিবাসিগণের উপর কখনও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে দেন নাই। দুর্বল ও অসহায়গণ সর্বদাই রাজার সহানুভূতি লাভ করিত। রাজা বিদ্যোৎসাহী এবং দানশীলতা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বস্তুত দাক্ষিণাত্যের রাজগণের মধ্যে কৃষ্ণরায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। তাঁহার রাজত্বকালে বর্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রায় সমস্তটা এবং দক্ষিণ ভারতের মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যও বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

তাঁহার উদারতা

বিজয়নগর রাজ্যের বিস্তৃতি

কৃষ্ণরায়ের পরবর্তী বিজয়নগরের রাজগণ দুর্বল ও অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহারা এক মুসলমান রাজ্যের সহিত যোগ দিয়া অন্য মুসলমান রাজ্যের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মুসলমান রাজ্যই বিজয়নগরের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে একদা বিজাপুর, আহম্মদনগর,

গোলকুণ্ডা এবং বিদরের রাজগণ একত্র হইয়া বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই সম্মিলিত সৈন্য কৃষ্ণা নদীর উত্তরে তালিকোটা নামক স্থানে সমবেত হইল। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল আরও প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে নদীর অপর পারে। ইতিহাসে এই যুদ্ধ কিন্তু তালিকোটার যুদ্ধ নামেই বিখ্যাত।

সম্মিলিত মুসলমান রাজগণের বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা

এই সময় সদাশিব রায় বিজয়নগরের নামে মাত্র রাজা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমতা ছিল মন্ত্রী রামরাজের হস্তে। রামরাজ এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং সম্মিলিত মুসলমান সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড এক সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন; ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে প্রথম প্রথম হিন্দুপক্ষেরই জয় হইতে লাগিল; কিন্তু দৈবক্রমে রামরাজ যুদ্ধে বন্দী হওয়ায় অবশেষে হিন্দু সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল; প্রায় একলক্ষ হিন্দু সৈন্য হত হইল।

হিন্দু সৈন্যের সম্পূর্ণ পরাজয়

একটি মাত্র যুদ্ধের ফলাফলের উপর সমস্ত নির্ভর করিতে গিয়া রামরাজ নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যখন সেই যুদ্ধে পরাজয় ঘটিল, তখন এই বহু বিস্তৃত রাজ্য এবং ইহার সর্বৈশ্বর্যশালিনী রাজধানী একদিনেই বিজেতাগণের পদানত হইয়া পড়িল। বিজয়ী সৈন্যগণ নিরতিশয় নৃশংসতা এবং বর্বরতার সহিত নগরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিল। ফলে যেখানে একদিন গগনচুম্বী প্রাসাদসমূহ বর্তমান ছিল, সেইখানে আজ ইষ্টক ও প্রস্তরের প্রকাণ্ড স্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিজয়নগরের পতন

রামরাজের ভ্রাতা এই বিষম বিপত্তির পরে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে পেন্নুগোণ্ডা নামক স্থানে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তাঁহার বংশধরগণ চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়া আরও প্রায় এক শতাব্দীকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের এই চতুর্থ রাজবংশের নাম অরবিদু বংশ। কিন্তু এই বংশের রাজগণ নামে মাত্রই রাজা ছিলেন। বিশেষ কোনও ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। আনেগুন্দির বর্তমান রাজা এই বংশজাত।

অরবিদু বংশ

বিজয়নগরের গৌরবের দিনে অনেক বৈদেশিক ভ্রমণকারী এই রাজ্য পরিদর্শন করিয়া, ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শতমুখে বিজয়নগরের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির এবং বিজয়নগররাজগণের শক্তিমত্তার সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে নিকলো কন্টি নামক একজন ইটালীয় পর্যটক বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, বিজয়নগরের পরিধি প্রায় ৬০ মাইল ছিল এবং বিজয়নগররাজের মত শক্তিশালী রাজা তখন ভারতবর্ষে আর ছিল না। অন্যান্য পর্যটকগণও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, রাজধানী বিজয়নগরের বহুসংখ্যক বিশাল মন্দির, প্রাসাদ এবং দুর্গ লোকের সম্ভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করিত। বিজয়নগর রাজ্যে সাহিত্য ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বেদের ব্যাখ্যাকর্তা সায়নাচার্য এই রাজ্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিদেশীয় পর্যটকগণের বিবরণ

উড়িষ্যা। বহু প্রাচীনকাল হইতেই উড়িষ্যায় গঙ্গবংশের রাজত্ব চলিতেছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ। তিনি উত্তরে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তিনি পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকর্তা। তিনি ১০৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে

১১৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৭১ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে তাঁহার বংশধর নৃসিংহদেব বঙ্গের মুসলমান রাজগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজধানী লক্ষ্মণাবতী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনিই কণারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। মুহম্মদ তুঘ্‌লক উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বে জুনা খাঁ একবার উড়িষ্যা আক্রমণ কবিয়াছিলেন, কিন্তু কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ফিরোজ তুঘ্‌লকও উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কপিলেন্দ্রদেব-কর্তৃক উড়িষ্যার সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি গঙ্গা হইতে কাবেরী নদী পর্যন্ত জয় করেন। এই বংশের শতবর্ষব্যাপী রাজ্যকালে উড়িষ্যা পরাক্রান্ত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। আঃ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলার সুলতান সুলেমান কররাণীর সেনাপতি বিখ্যাত কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করিয়া উহাকে বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলেন।

মেবারের রাজপুত রাজ্য। কিন্তু এই সকল রাজ্যের মধ্যে রাজপুত জাতির কাহিনীই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রাজপুত জাতি মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বযুগে ভারতবর্ষে ক্ষমতাশালী হইতে আরম্ভ করে। কিরূপে এই বীর জাতির উদ্ভব হইল, তাহা ঠিক জানা যায় না। বর্তমান পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এই যে, রাজপুত জাতি শক, হুন, গুর্জর ইত্যাদি বিদেশীয় ভারত-বিজেতাগণের বংশধর। তাহারা ভারতবর্ষে আবাস স্থাপন করিয়া শেষে ভারতীয় আর্য-সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল

রাজপুতজাতির উৎপত্তি ও তাহাদের বিশিষ্টতা

এবং এই মিশ্রণের ফলেই রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয়। অসাধারণ সাহস, স্বাধীনতার প্রতি প্রবল অনুরাগ, এবং অদ্ভুত আত্মবিসর্জনের ক্ষমতা এই রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের অলৌকিক শৌর্যের কাহিনী ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

হিন্দু যুগের চৌহান, পরমার, চৌলুক্য ও প্রতীহার বা পরিহার রাজবংশের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই রাজপুত বলিয়া গণ্য হয়। মুসলমান যুগে রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মেবার

মেবার রাজ্য

রাজ্য। এই রাজ্যে গুহিলোট অথবা শিশোদীয় রাজপুতগণের * বাস। বাপ্পারাও নামে একজন বীর হইতে শিশোদীয় রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। বাপ্পারাও সম্ভবত ৭২৮ খৃষ্টাব্দে চিতোর অধিকার করেন। কিন্তু শিশোদীয়রাজ

সমরসিংহ

সমরসিংহের চেষ্টায়ই খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে এই রাজ্য প্রথমে গৌরবের আসনে উন্নীত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খিলজী ~~কিরূপে~~ এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া চিতোর অধিকার করেন, ~~তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে~~। রাণা হম্মীর এই রাজ্যের বিনষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ

হম্মীর

হন। হম্মীর ও তাঁহার পরবর্তী দুইজন রাজার রাজত্বকালে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে মেবার রাজ্য দিল্লীর সুলতান এবং অন্যান্য রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী

---

* গুহিল নামে একজন পূর্বপুরুষের নামানুসারে গুহিলোট নামের উৎপত্তি। গুহিল সম্ভবত ৬০৯ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। 'শিশোদীয়'—রাজবংশের নাম।

হইয়া উঠে এবং এই রাজ্যের সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ইহার পরে এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা মহারাণা কুম্ভ (১৪৩৩—১৪৬৮)। তিনি বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন এবং মালব, গুজরাট ও নাগোরের মুসলমান সুলতানগণকে পুনঃপুন যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে মালব ও গুজরাট একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। কুম্ভ একলক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং ১৪০০ হস্তী লইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই বিজয় উপলক্ষে রাজধানী চিতোরে তিনি যে বিশাল জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা আজিও তাঁহার অতুল কীর্তি জগতে বিঘোষিত করিতেছে। এই বীরশ্রেষ্ঠ কুম্ভ কিন্তু নিজের পুত্রের হাতেই (১৪৬৮ খৃঃ) প্রাণ হারাইলেন। মহারাণা কুম্ভ

কুম্ভের পৌত্র সংগ্রামসিংহও (১৫০৮-১৫২৭) এই বংশের একজন বিখ্যাত রাজা। তিনিও মালব ও গুজরাটের সুলতানগণকে পরাজিত করেন এবং মালবের রাজাকে বন্দী করিয়া চিতোরে লইয়া যান। তিনি প্রকৃতপক্ষেই "সমর-শত-বিজয়ী" বীর ছিলেন, এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীনে রাজপুতশক্তি গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। মালব ও দিল্লীরাজের বিরুদ্ধে তিনি ১৮ বার যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। তৎকালে ভারতবর্ষে তাঁহার মত বীর ও শক্তিশালী রাজা আর কেহ ছিল না। মুঘলবীর বাবরের সহিত তাঁহার যুদ্ধের কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। সংগ্রামসিংহ

জৌনপুর। সম্রাট্ ফিরোজ তুঘ্লক গোমতী নদীর তীরে জৌনপুর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ

তুঘ্‌লক তাঁহার উজীর খাজা জাহানকে "মালিক-উস-শার্ক" (পূর্বদেশের অধিপতি) এই উপাধি সহ কনৌজ ও বিহারের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। জৌনপুরে এই প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের ফলে যে অরাজকতা হয় তাহার সুযোগে খাজা জাহান স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এইরূপে জৌনপুরের শার্কী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের তৃতীয় রাজা শামসুদ্দিন ইব্রাহিম শাহ্‌ শিল্প ও সাহিত্যের বিশেষ সমাদর করিতেন। অনেক সাহিত্যিক তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন এবং জৌনপুর মুসলমান শিক্ষা ও সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইব্রাহিম অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহার মধ্যে 'অতল' মস্‌জিদই সমধিক প্রসিদ্ধ। বাহ্‌লুল লোদী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার পর জৌনপুর আক্রমণ করেন। জৌনপুররাজ মাহমুদ ও হুসেন বহুদিন যাবৎ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হন এবং জৌনপুর দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা। পূর্বোল্লিখিত বড় বড় রাজ্য ছাড়া ভারতবর্ষে আরও কতকগুলি রাজ্য সে সময়ে বর্তমান ছিল। সেগুলির মধ্যে কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ এবং খান্দেশ উল্লেখযোগ্য।

এইরূপে দেখা যায় যে, দিল্লীর সুলতানগণের সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতবর্ষে অনেক খণ্ডরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদিগকে মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত উত্তরের কতকগুলি মুসলমান রাজ্য,—সিন্ধু, মুলতান, পঞ্জাব, দিল্লী, জৌনপুর ও বঙ্গদেশ—সিন্ধুনদের মোহনা হইতে

বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকার এক রেখায় অবস্থিত ছিল। দক্ষিণে গুজরাট, মালব, খান্দেশ, ও বাহ্‌মনী রাজ্য মিলিয়া আর একটি মুসলমান রাষ্ট্রচক্র। এই দুইয়ের মধ্যে ছিল প্রবল-পরাক্রান্ত হিন্দু রাজপুত রাজ্যসমূহ এবং সর্বদক্ষিণে ছিল বিজয়নগর ও পূর্বে উড়িষ্যা রাজ্য। এইরূপে দুইটি মুসলমান রাষ্ট্রচক্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি হিন্দু রাষ্ট্রচক্র,—এই চারিটি রাষ্ট্রচক্রে ভারতবর্ষ বিভক্ত ছিল।*

---

* পঞ্জাব নামে দিল্লীর অধীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন আফগান ওমরাহের হস্তে ছিল। মানচিত্রের সাহায্যে এই বর্ণনা সহজে বোধগম্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম মুসলমানযুগে ভারতবর্ষ

১। মুসলমানগণের সামরিক শক্তি

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক দল মুসলমান কর্তৃক অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ জয়, মুসলমানগণের বিশিষ্ট সমর-কুশলতার পরিচায়ক। সর্বসাধারণের বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষের জলবায়ুর গুণে ভারতবাসিগণ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সেই জন্যই কঠোর পরিশ্রম-সহিষ্ণু পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী মুসলমানগণের সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। ইহা হয়ত আংশিকরূপে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণিধান করিয়া পাঠ করিলে মনে হয় যে, ভারতীয়গণের পরাজয়ের কারণ ভারতবাসীর বীরত্বের অভাব নহে, প্রধানত সেনাপতিগণের সমরকৌশলের অভাব। ভারতবর্ষীয়গণ বিদেশের সহিত কোনও সংশ্রব রাখিত না, কাজেই ভারতের বাহিরে পর পর যে সকল সমর-কৌশল আবিষ্কৃত এবং প্রযুক্ত হইতেছিল, তাহা তাহারা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতবাসীর সমর-কৌশলের অভাবের ইহাই একটি প্রধান কারণ।

সমর-কৌশলের অভাবে ভারতীয়গণের পরাজয়

ইহাও সচরাচর বলা হইয়া থাকে যে ভারতীয় রাজগণের মধ্যে কোনও একতা ছিল না, তাই তাঁহারা মুসলমান আক্রমণ

একতাহীনতার অভিযোগ সত্য নহে

বোধ করিতে পারেন নাই। ইতিহাস কিন্তু ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করে। ভারতবর্ষের পরম সংকটের সময়ে ভারতীয় রাজগণ কিরূপে বার বার জয়পাল, আনন্দপাল এবং পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে সম্মিলিত হইয়াছিলেন,—তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। অবশ্য একথা সত্য যে, সমস্ত ভারতবর্ষ কখনও একত্র হইতে পারে নাই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যে সব রাজ্য একত্র মিলিয়াছিল, তাহাদের মিলিত আয়তন, আক্রমণকারী মুসলমান রাজার রাজ্যের আয়তন হইতে অনেক বড়।

বিদেশের সংশ্রব বর্জনই পতনের প্রকৃত কারণ

মোটের উপর এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সমর-কৌশলে ভারতীয়গণ মুসলমানগণের অপেক্ষা হীন ছিল এবং বহির্জগতের সহিত সংশ্রব বর্জন করিয়া চলাই এই হীনতার প্রধান কারণ।

মুসলমান আক্রমণকারিগণও ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয়গণের মতই বাহিরের সংশ্রব হারাইয়া ফেলিয়াছিল, এবং নূতন মুসলমান আক্রমণকারিগণের অপেক্ষা সমর-কৌশলে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু ইব্রাহিম লোদী তখন পর্যন্ত এই নূতন সমরাস্ত্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

২। মুসলমানগণের শাসন

প্রথম যুগে সুশৃংখল শাসনের অভা

কিন্তু দেশজয় এক কথা, দেশশাসনের সুবন্দোবস্ত আর এক কথা। মুসলমান বিজয়ের প্রথম তিন শত বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ দেশশাসনের কোনও সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে

পারেন নাই। বিজিত হিন্দুগণের হৃদয় জয় করার আবশ্যকতা তাঁহারা অনুভব করেন নাই, এবং হিন্দুদিগের কোনও অধিকারই তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। প্রজার যে সহানুভূতি ও মঙ্গলেচ্ছার উপর রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করে, তাহা তাঁহারা অর্জন করিতে পারেন নাই। কাজেই শুধু সামরিক শক্তির বলে দেশকে দমন করিয়া রাখিতে হইত। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে শক্তিশালী সৈন্যদল রাখিতে হইত, এবং সুযোগ পাইলেই ইহাদের নায়কগণ বিদ্রোহ করিত। যখন বিচক্ষণ ও যোগ্য সুলতান সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিতেন, তখন সমস্ত ব্যাপারই নির্বিঘ্নে চলিত। কিন্তু দুর্বল অথবা দুষ্ট রাজা সিংহাসনে আরোহণ কবিবামাত্রই গোলমাল বাধিয়া যাইত। এই কারণেই মুসলমান রাজত্বের প্রথম তিন শত বৎসরে কোন রাজবংশই বেশি দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই।

সামরিক শক্তির উপর শাসনের প্রতিষ্ঠা

হিন্দুগণের অসন্তোষ

৩। মুসলমান যুগের ধর্ম সাহিত্য ও শিল্প

হিন্দুসমাজে মিশিল না

ভারতে মুসলমান। মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে এই নূতন ধর্মাবলম্বিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ পর্যন্ত গ্রীক্, পারদ, শক, কুষাণ, হুন, গুর্জর ইত্যাদি যত বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা সকলেই বিরাট হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ কিন্তু হিন্দু সমাজে একেবারেই মিশিল না। ইহার কারণ দুইটি—প্রথমত হিন্দু সমাজে পূর্বের ন্যায় উদারতা ছিল না, এবং তাহাদের মধ্যে সংকীর্ণতা দেখা দিয়াছিল। দ্বিতীয়ত মুসলমানগণ একেশ্বরবাদমূলক এবং প্রতিমাপূজা-বিরোধী এমন

একটি বিশিষ্ট ও দৃঢ় ধর্মবিশ্বাস সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, যাহা পূর্ববর্তী আক্রমণকারীদের কাহারও ছিল না।

মুসলমানেরা যে কেবল পৃথক্ হইয়া রহিল, তাহা নহে, তাহারা বহু হিন্দুকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরস্থ অনেক কদাচার ও কুসংস্কার এই ব্যাপারের জন্য বহু পরিমাণে দায়ী। হিন্দু সমাজের নিম্নতম জাতিসমূহ সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য জীবন যাপন করিত, কিন্তু তাহারা মুসলমান হইবামাত্র রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মুসলমান ওমরাহের সহিত তুল্য সামাজিক অধিকার লাভ করিত। পৃথিবীতে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব মুসলমান সমাজে কার্যত যতদূর অনুসৃত হইয়াছে, আজ পর্যন্ত কোনও সম্প্রদায়েই ততদূর হয় নাই। অপরদিকে জাতিভেদের সহস্র শাখা উপশাখায় বিভক্ত হিন্দু সমাজে কৃত্রিম, হীন ও গ্লানিকর বৈষম্য যেরূপ কঠোর ভাবে বিরাজ করিত, সেরূপ অন্য কোন সম্প্রদায়ে দেখা যায় না। সুতরাং দলে দলে হিন্দু যে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। অপরদিকে মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদিগকে বহু অসুবিধা ও অপমান সহিতে হইত, তাহাতেও মুসলমান হওয়ার প্রলোভন বড়ই অধিক ছিল।

হিন্দুর মুসলমান ধর্মগ্রহণ

উহার কারণ

হিন্দুসমাজ। হিন্দু সমাজের নেতাগণ যে সমাজের এই বিপদে উদাসীন ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা কঠোর হইতে কঠোরতম সমাজ-শাসনের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া, সমাজ রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাধবাচার্য ও রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রণয়নে হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার চেষ্টা

হিন্দু সমাজের উদার ভাব কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ঐ যুগের সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়া মধ্যে মধ্যে ধর্মপ্রচারকগণ উদার নীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে ভারতে এক নূতন ধর্মভাবের বন্যা বহিয়া গেল। এই নূতন ধর্মের প্রধান কথা(১) ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস(২) নৈতিক জীবন পালনের আবশ্যকতা(৩) এবং জাতিভেদ ও নানাবিধ জটিল পূজাপদ্ধতিতে অবিশ্বাস। এই তিনটি মত অবশ্য নূতন নহে, প্রথমটি ঋগ্বেদের সময় হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের দুইটি প্রধান কথা। কিন্তু দীর্ঘকাল হিন্দু ও মুসলমান একত্র থাকার ফলে, এই ভাবগুলির মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল, এবং এই যুগের কয়েকজন প্রধান ধর্মপ্রচারক আবেগপূর্ণ ভাষায় এই সকল মতের প্রচার করিতে লাগিলেন। এই ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, নানক ও চৈতন্য প্রধান।

নূতন ধর্ম-প্রচারকগণের উদারতা

তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মের মূলকথা

রামানন্দ। খৃষ্টাব্দের চতুর্দশ শতকে বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক রামানন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, এবং তাঁহার সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল একস্থানে বসিয়া ভোজন করিতে পারিত। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঈশ্বরের একত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

কবীর। রামানন্দের এক শিষ্যের নাম কবীর। তিনি জাতিতে মুসলমান, বস্ত্রবয়ন তাঁহার ব্যবসায় ছিল। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। অতি সাধারণ কথায় এবং সুন্দর সুন্দর কবিতায় তিনি দর্শনশাস্ত্রের চরম সত্যগুলি প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের তিনি কোনও ভেদ করিতেন না। তিনি বলিতেন, যিনি হিন্দুর ঈশ্বর—তিনিই মুসলমানেরও ঈশ্বর।

নানক। এইরূপ উদার মতবাদের উপরই নানক পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোককেই নিজের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতেন। শিখগণ পরে এক বিশেষ শক্তিমান সম্প্রদায়ে পরিগণিত হয়।

চৈতন্য। বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের সংস্কার সাধন করেন বিখ্যাত চৈতন্যদেব। তিনি বঙ্গদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যের পিতার আদি নিবাস শ্রীহট্টে ছিল। চৈতন্য অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন,—তাহার মূল কথা ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস। তাঁহার প্রচারের ফলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অনেক বাড়িয়া যায়। তিনি ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে দেহত্যাগ করেন।

ইঁহাদের প্রচারিত শিক্ষার ফল

এই সকল ধর্মপ্রচারকগণের শিক্ষাদ্বারা ভারতের জনসাধারণের মনোভাব বহু পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল, এবং উহা জাতিভেদের কঠোরতা অনেক কমাইয়া দিয়াছিল ও হিন্দুগণের মুসলমান-ধর্মগ্রহণ অনেক পরিমাণে থামাইয়া দিয়াছিল। শের সাহ ও আকবরের অনুসৃত নীতি এক হিসাবে ইঁহাদেরই প্রচারিত মতের অনুসরণ মাত্র।

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য। উল্লিখিত চারিজন ধর্ম-প্রচারক প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধান করিয়া

দেশের আর এক মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর যেরূপ দেশ-প্রচলিত ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এই ধর্মবীরগণও তেমন নিজ নিজ দেশের ভাষায় ধর্মের প্রচার করিয়া, ঐ সকল ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। রামানন্দ ও কবীরের প্রচারে হিন্দি ভাষা, চৈতন্যদেবের প্রচারে বাঙলা এবং নানকের প্রচারে পঞ্জাবের গুরুমুখী ভাষা অনেক উন্নতি লাভ করে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস নামে দুইজন বৈষ্ণব কবি তাঁহাদের অতুলনীয় সংগীতরাজি দিয়া বিহার ও বঙ্গদেশের ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুগে মুসলমান রাজগণের দরবারে বাঙলা ও মৈথিল ভাষার বিশেষ সমাদর হইয়াছিল, এবং এই দুই ভাষার উন্নতির ইহাও একটি প্রধান কারণ। বাঙলার সুলতান সামসুদ্দিন ইউসুফ (১৪৭৪-১৪৮১) মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) কর্তৃক শ্রীমদ্‌ভাগবতের কতকাংশের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সুলতান হোসেন শাহ (১৪১ পৃঃ) একাধিক বঙ্গ কবির উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহাকে কলিযুগের কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরের দ্বারা মহাভারতের আরও একখানি অনুবাদ করান। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীকরণ নন্দী দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও একাধিক মুসলমান সুলতানের উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রচারকগণের শিক্ষায় সমৃদ্ধ

উর্দু

হিন্দু ও মুসলমানের সংশ্রবের ফলে উর্দু নামে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। এই ভাষার ব্যাকরণ হিন্দির ন্যায়, কিন্তু ইহার শব্দগুলি আরবী, পারসী ও হিন্দি এই তিন ভাষা হইতে গৃহীত।

ঐতিহাসিক সাহিত্য। মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া পারস্য ভাষায় এক বিরাট ঐতিহাসিক সাহিত্য গড়িয়া তুলিলেন। হিন্দুগণ ইতিহাস রচনা করিতে ভালবাসিতেন না। বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য অন্য সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ হইলেও ঐতিহাসিক গ্রন্থ উহাতে খুব কমই আছে। মুসলমানগণ কিন্তু ইতিহাস রচনা করিতে খুবই ভালবাসিতেন এবং তাঁহারা কয়েকখানা খুব ভাল ভাল ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। সুলতান নসিরুদ্দিনের রাজত্বকালে মীন্হাজউদ্দিন সিরাজ নামক এক ঐতিহাসিক সুলতানের নাম অনুসারে তবকৎ-ই-নসিরি নামক একখানা বিপুলকায় ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতের বাহিরে বহু মুসলমান রাজ্যের ইতিহাস দেওয়া আছে, এবং সুলতান নসিরুদ্দিনের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভারতের মুসলমান-যুগের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ফিরোজ তুঘ্লকের রাজত্বে জিয়াউদ্দিন বারণী নামক এক ঐতিহাসিক, মীন্হাজ যেখানে তাঁহার ইতিহাস শেষ করিয়াছিলেন, সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া ফিরোজ তুঘ্লকের রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত ইতিহাস তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মীন্হাজউদ্দিন

জিয়াউদ্দিন বারণী

শিল্প। এই যুগে স্থাপত্য শিল্পের খুব উন্নতি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, গুজরাট, জৌনপুর, বিজাপুর, বিজয়নগর প্রভৃতি খণ্ডরাজ্যেও বহু সংখ্যক সুন্দর প্রাসাদ, মন্দির ও মস্জিদ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিশিষ্ট স্থাপত্য রীতির

উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাচীন পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের আদিনা মস্‌জিদ, বড় ও ছোট সোণা মস্‌জিদ, কদম-রসুল মস্‌জিদ এবং দাখিল দরওয়াজা মুসলমান যুগের বাঙলার শিল্প-গৌরবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ইবন্ বতুতা। আফ্রিকা মহাদেশের টেঞ্জিয়ারের অধিবাসী ইবন্ বতুতা নামে পরিচিত এক ভ্রমণকারী সুলতান মুহম্মদ তুঘ্‌লকের আমলে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশের দ্রব্য-মূল্যের একটি তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন।

জিনিষ-পত্রের সস্তা দর

জিনিষ-পত্রের দাম তখন কত সস্তা ছিল, ইবন্ বতুতার প্রদত্ত নিম্ন তালিকা হইতে আমরা তাহা বেশ্ বুঝিতে পারি—

ধান্য (বর্তমান কালের প্রতি মণ)		৶০
ঘি	”	১।৶০
চিনি	”	১।৶০
তিল তৈল	”	॥৶১০
উত্তম কাপড় ১৫ গজ		২৲
দুগ্ধবতী গাভী ১টি		৩৲
হৃষ্টপুষ্ট মুরগী ১টি		৻৫
ভেড়া ১টি		।০

যাতায়াতের সুবিধা

যাতায়াতের বন্দোবস্ত অতি উত্তম ছিল। বড় বড় সহর হইতে রাজধানীতে ডাক আসিবার ব্যবস্থা ছিল। এক একটি ডাকচৌকি এক এক মাইল দূরে স্থাপিত হইত। ডাকবাহকগণ পিতলের ঝুমঝুমিযুক্ত লাঠি হাতে লইয়া, এক চৌকি হইতে আর এক চৌকি পর্যন্ত দৌড়াইয়া যাইত। সেখানে আর এক ডাকবাহক প্রস্তুত থাকিত, সে আবার ডাক লইয়া পরের চৌকিতে পৌঁছাইয়া দিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুঘল-পাঠান দ্বন্দ্ব

লোদী বংশ। বাহ্‌লুল লোদী কর্তৃক পাঠান লোদী বংশের প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১৩৮ পৃঃ)। বাহ্‌লুল ধ্বংসোন্মুখ দিল্লী সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি জৌনপুরের সুলতানকে পরাজিত করিয়া নিজের পুত্র বরবক্ শাহকে রাজপ্রতিনিধিরূপে সেখানে স্থাপিত করিলেন। তিনি পশ্চিমে সিন্ধুনদ হইতে পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত ভূ-ভাগ পুনরায় দিল্লী রাজ্যের অধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাহ্‌লুল লোদী কর্তৃক দিল্লী সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার

সিকন্দর লোদী। বাহ্‌লুলের পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৪৮৯ খৃঃ)। তিনি নিজের ভ্রাতাকে জৌনপুর হইতে বিতাড়িত করিয়া ঐ রাজ্য অধিকার করিলেন। তিনি বিহার জয় করিলেন, এবং ত্রিহুত হইতেও কর আদায় করিলেন। রাজ্যশাসন-কার্যে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সুলতান সিকন্দর লোদীর বহু প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। এই গোঁড়ামির জন্যই তিনি মথুরার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন এবং হিন্দু প্রজাগণের নানারূপ লাঞ্ছনা করেন। সিকন্দর লোদী একজন কবি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

সিকন্দর লোদীর দেশ-বিজয়

তাঁহার গোঁড়ামি

ইব্রাহিম লোদী। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা জৌনপুর অধিকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন ; ইব্রাহিম তাঁহাকে তাড়াইয়া আবার জৌনপুর অধিকার করিলেন। ইব্রাহিমের পাঠান আমিরগণ প্রায়ই বিদ্রোহী হইয়া দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইব্রাহিম তাহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করায়, তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। অবশেষে সুলতানের খুল্লতাত আলম খাঁ এবং পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের মুঘল রাজা বাবরকে ভারত আক্রমণ করিয়া আলম খাঁকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

বাবর ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রিত

বাবর। বাবর চাঘ্তাই বংশীয় তুর্কী তৈমুরের পঞ্চম অধস্তন বংশধর ও তাঁহার মাতামহ বিখ্যাত মোগল চেঙ্গিস্ খাঁর ত্রয়োদশ অধস্তন বংশধর। তাঁহার প্রকৃত নাম জহিরুদ্দিন মুহম্মদ। কিন্তু তিনি তাঁহার মোগল ডাক নাম বাবর (অর্থাৎ সিংহ বা ব্যাঘ্র) দ্বারাই সর্বত্র পরিচিত। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাবরের জন্ম হয়। এগার বৎসর চারি মাস বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি তুর্কীস্থানের অন্তর্গত সিরনদের তীরবর্তী ফরগণা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হন। এই সময় হইতেই বালক বাবর সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় প্রদান করেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সমরখন্দ রাজ্য জয় করেন, কিন্তু শীঘ্রই সমরখন্দ ও ফরগণা উভয় রাজ্য হইতেই বিতাড়িত হন। এই দুই রাজ্য উদ্ধার করিয়া তিনি পুনরায় বিতাড়িত হন, এবং অবশেষে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে কাবুল রাজ্য জয়

বাবরের বাল্য জীবন

করেন। পশ্চিমে সমরখন্দ প্রভৃতি জয়ের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া বাবর অবশেষে পূর্বদিক জয়ে মনোনিবেশ করেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার জয় করিয়া তিনি ভারতবর্ষ জয়ের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতের সীমান্তে কয়েকবার যুদ্ধাভিযানও করিয়াছিলেন। এমন সময় দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁর নিমন্ত্রণ পাইয়া তিনি সানন্দে ভারতবিজয়ে যাত্রা করিলেন। ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যকে পরাজিত করিয়া তিনি লাহোর ও দীপালপুর অধিকার করিলেন। কিন্তু দৌলত খাঁ শত্রুতাচরণ করায় আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া কাবুলে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর বাবর আলম খাঁর সহিত সন্ধি করিলেন। স্থির হইল যে, বাবরের সাহায্যে আলম খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, তিনি লাহোর ও তাহার পশ্চিমস্থ সমস্ত ভূ-ভাগ বাবরকে ছাড়িয়া দিবেন। আলম খাঁ কিন্তু শীঘ্রই বাবরের বিরুদ্ধে দৌলত খাঁর সহিত যোগ দিলেন। সুতরাং অতঃপর বাবর নিজেই দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে একদল সৈন্য লইয়া বাবর পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। দৌলত খাঁ লোদী বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর পানিপথের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর সহিত বাবরের সাক্ষাৎ হইল। বাবরের অদম্য সাহস এবং অসাধারণ সমরকৌশল ছিল, আর ছিল বন্দুক ও কামান। এই নূতন যুদ্ধাস্ত্র পর্তুগীজগণ পূর্বেই এদেশে প্রচলিত করিয়াছিল, কিন্তু লোদীরাজগণ ইহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত

ভারতবর্ষ বিজয়

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ

মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা

হইলেন এবং বাবর ভারতে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৫২৬ খৃষ্টাব্দ)।

পানিপথের যুদ্ধের পর তিনি অনায়াসেই দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। কিন্তু বীরবর সংগ্রামসিংহ মিলিত রাজপুতশক্তি লইয়া এবার তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন।

বাবর ও সংগ্রামসিংহ। মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহের বীরত্ব ও যুদ্ধজয়ের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (১৫৫ পৃঃ)। রাণা মনে মনে ভারতবর্ষকে মুসলমানগণের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা পোষণ করিতেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদী যখন বাবরকর্তৃক পরাজিত হইলেন, তখন রাণা ভাবিলেন, তাঁহার আশা বুঝি ফলবতী হইতে চলিল। তিনি নবাগত মুঘলের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজপুত-প্রধানকে সম্মিলিত করিলেন।

জীবনব্যাপী সংগ্রামের ফলে মহারাণা সংগ্রামসিংহের একটি চোখ নষ্ট হইয়াছিল, একটি হাত ছিল না, একখানা পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত শরীরে ৮০টি বর্শা বা তরবারির আঘাতচিহ্ন ছিল। তথাপি এই মহাবীর যোদ্ধা আশী হাজার রাজপুত অশ্বারোহী, পাঁচ শত রণহস্তী ও অসংখ্য পদাতিক লইয়া বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া বাবর শংকিত হইলেন, তাঁহার দলের সমস্ত সৈন্যের মন আতংকের কাল ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফতেপুর সিক্রীর নিকট

খানুয়ার যুদ্ধ

খানুয়ার বিস্তৃত প্রান্তরে রাজপুত ও মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধ হইল। কিন্তু বাবর উৎকৃষ্ট সমর-কৌশল ও বন্দুক কামানের সাহায্যে হিন্দু সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (১৫২৭ খৃঃ)।

এই যুদ্ধের অনতিকাল পরে মহারাণা সংগ্রামসিংহ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে রাজপুত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শেষ আশা চূর্ণ হইল।

সম্রাট বাবর। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বাবর রাজপুতবীর মেদিনী রায়ের সুদৃঢ় দুর্গ চান্দেরী অধিকার করেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদীর অধীনে বিহার প্রদেশের পাঠানগণ বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় কিন্তু বাবর সহজেই তাহাদিগকে পরাজিত করেন। পরাজিত মাহ্মুদ লোদী বঙ্গদেশের সুলতান নসরৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোগরা নদীর তীরে বাবর ইঁহাদিগকে পরাজিত করেন। কিন্তু নসরৎ শাহ নিজের সম্মান ও রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাবরের সহিত সন্ধি করেন। এই সমুদয় যুদ্ধ জয়ের ফলে বাবর পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে বিহার এবং দক্ষিণে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিলেন। এই অসাধারণ বিজয়াবলীর ফলভোগ করা কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে আগ্রা নগরীতে তিনি পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত এক অদ্ভুত জনপ্রবাদ বিজড়িত হইয়াছে। কথিত আছে যে, একদা তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের কঠিন পীড়া হইলে বাবর তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া এই প্রার্থনা করিলেন যে, হুমায়ুনের রোগ যেন তাঁহাতে সংক্রামিত হয় এবং হুমায়ুন যেন রোগমুক্ত হইয়া উঠেন। ফলে সত্য সত্যই তাহা ঘটিল; হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিলেন এবং কয়েক মাস পরে বাবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

বাবরের মৃত্যু

বাবর একখানা আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। এই আশ্চর্য গ্রন্থ বাবরের প্রকৃত জীবনের এমন সুন্দর পরিচয় প্রদান করে যে, কোনও ইতিহাস পাঠেই তেমন পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। বাবর একদিকে যেরূপ সাহসী, উদ্যোগী এবং নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন, অন্যদিকে আবার তেমনি জ্ঞানী, শিল্পানুরাগী এবং সকলের সহিত ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ সাহিত্যানুরাগ ছিল এবং তিনি পারস্য ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তুর্কী ভাষায় রচিত নিজের জীবন-চরিত হইতে দেখা যায় যে, তিনি সুন্দর গদ্যও লিখিতে পারিতেন। যুদ্ধ তাঁহার নিত্যসহচর ছিল, কিন্তু তবুও সংগীত ও অন্যান্য সুকুমার বিদ্যায়ও তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সমর-কৌশলে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং মানবচরিত্রের জ্ঞানও তাঁহার অসাধারণ ছিল। তাঁহার এমনি সুন্দর স্বভাব ছিল যে, অনায়াসে তিনি সকলের বন্ধু হইয়া উঠিতে পারিতেন। উপসংহারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, তাঁহার বীরত্বের অন্তরালে একখানি স্নেহ ও করুণামাখা হৃদয় ছিল।

বাবরের চরিত্র

হুমায়ুন। বাবরের মৃত্যুর পর ২৩ বৎসর বয়সে হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ভ্রাতা কামরান্‌কে পঞ্জাব ও অপর দুই ভ্রাতা হিন্দল ও আস্‌কারিকে অন্যান্য ভূ-ভাগ দান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কামরান্ পূর্বেই কাবুল ও কান্দাহারের অধিপতি ছিলেন। রাজত্বের প্রারম্ভেই হুমায়ুন কামরান্‌কে পঞ্জাব দান করিয়া এক বিষম ভুল করিলেন। এই সকল প্রদেশ হইতে মুঘলগণের যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্যসামন্ত সংগৃহীত হইত।

কামরান্‌কে পঞ্জাব প্রদান

শীঘ্রই সৈন্যসংগ্রহের গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইল, কিন্তু কামরানের প্রতিবন্ধকতায় তাহা পাইবার আর কোন উপায় রহিল না।

হুমায়ুনের বিপদ

মুঘলশক্তি তখনও ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনতি-বিলম্বে হুমায়ুনকে প্রবল শত্রুসমূহের সম্মুখীন হইতে হইল। ইহাদের মধ্যে গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর শাহ এবং বিহারের পরাক্রান্ত আফগান নায়ক সের খাঁই ছিলেন প্রধান।

সের খাঁ। সের খাঁর পিতৃদত্ত নাম ফরিদ। তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম সুর কর্মোপলক্ষে পিতৃভূমি তক্তি-সুলেমান পর্বতের নিকটবর্তী ভূ-ভাগ হইতে আসিয়া দিল্লী জিলার অন্তর্গত হিস্‌সার ফিরোজা নামক স্থানে বসবাস করেন। এই স্থানে আনুমানিক ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরিদের জন্ম হয়। কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা হাসান সাসারাম নামক স্থানে জাগীর লাভ করিয়া সপরিবারে সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

বাল্যজীবন

হাসানের চারি স্ত্রীর গর্ভে আটটি পুত্রসন্তান জন্মে। তন্মধ্যে ফরিদ জ্যেষ্ঠ। তাঁহার বিমাতা তাঁহার সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিতেন এবং পিতার স্নেহলাভও কখনও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। এইভাবে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি পনর বৎসর বয়সে জৌনপুরে গমন করেন এবং কয়েক বৎসর সেখানে মনোযোগের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করেন। অতঃপর তাঁহার পিতা সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় জাগীরের শাসনভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। পরবর্তীকালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শাসন ও রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে সের খাঁ যে অপূর্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এইখানেই তাহার সূত্রপাত হয়। কিন্তু

ফরিদের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য বেশি দিন টিকিল না। তাঁহার বিমাতার প্ররোচনায় তাঁহার পিতা তাঁহার হস্ত হইতে জাগীর কাড়িয়া লইলেন এবং ফরিদ জীবিকান্বেষণে আগ্রা গমন করিলেন (১৫১৯ খৃঃ)। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি বিহার প্রদেশে বাহার খানের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কার্যতৎপরতায় তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করেন। একদিন বাহার খানেব সঙ্গে

সের খাঁ উপাধি প্রাপ্তি

শিকার করিতে যাইযা তিনি একটি ব্যাঘ্র নিহত করেন, এবং প্রভুর নিকট হইতে সের খাঁ এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সেব সম্রাট্ বাবরের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন,

পৈতৃক জাগীর লাভ

এবং তাঁহার অনুগ্রহে পৈতৃক জাগীর পুনবায় লাভ কবিতে সমর্থ হন। অনতিকাল পরেই তিনি বিহার প্রদেশেব নাবালক

বিহারের প্রতিনিধি-শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত

শাসনকর্তাব প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত ইহার শাসনভার পরিচালন কবেন। এই সমযে সুদৃঢ চুণাব দুর্গেব অধিকর্ত্রী মালিকানাম্নী একটি বিধবাকে বিবাহ করিয়া সেব অতুল ধনসম্পত্তিসহ এই দুর্গেব অধিকাব লাভ করেন (১৫৩০ খৃঃ)। সম্রাট্ বাবরের মৃত্যুব পব পূর্বভারতের পাঠান সামন্তগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সের এই বিদ্রোহে যোগদান না করিলেও মুঘল সম্রাট্ হুমায়ুন বিদ্রোহীগণকে যুদ্ধে পরাজিত

মুঘলের বশ্যতা স্বীকার

করিযা চুণার দুর্গ অবরোধ করেন। চারি মাস অবরোধের পব সের তাঁহার বশ্যতা স্বীকাব করেন।

ইতিমধ্যে বিহারের নাবালক শাসনকর্তা এবং রাজ্যের পাঠান ওমরাহ্‌গণ সেরের কর্তৃত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশের রাজা হোসেন শাহের পুত্র রাজা ঘিয়াসুদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহের সহিত ষড়যন্ত্র করিল এবং বঙ্গ ও বিহারের

সৈন্যদল একত্র হইয়া সেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। সেরের সৈন্যসংখ্যা বিপক্ষ পক্ষের তুলনায় নিতান্ত অল্প হইলেও সুরজগড়ের যুদ্ধে সের তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন।

সুরজগড়ের যুদ্ধে জয়

এই যুদ্ধের ফলে সের খাঁর যশ ও ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং তিনি মনে মনে বঙ্গদেশ জয় করিবার আশা পোষণ করিতে লাগিলেন; অপূর্ব রণকৌশলের বলে তিনি সহসা সসৈন্যে বঙ্গের রাজধানী গৌড় নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং বঙ্গ-অধিপতি বহু ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া কোনমতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন (১৫৩৬ খৃঃ)।

বঙ্গে অভিযান

হুমায়ুন ও সের খাঁ। এই সময়ে সম্রাট্ হুমায়ুন পশ্চিম প্রদেশে ব্যস্ত থাকাতেই সের খাঁ এইরূপে স্বীয় ক্ষমতা ও রাজ্য বিস্তারের সুযোগ পাইয়াছিলেন। গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর শাহ একজন বিদ্রোহী নায়ককে আশ্রয় প্রদান করায় হুমায়ুন ক্রুদ্ধ হইয়া গুজরাট আক্রমণ করেন (১৫৩৫ খৃঃ)। তিনি বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিয়া মাণ্ডু ও চম্পানীর দখল করেন, এবং গুজরাট প্রদেশ জয় করিতে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার ভ্রাতা মিরজা আস্‌কারি তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। হুমায়ুন দ্রুতগতিতে আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন। কিন্তু ইত্যবসরে বাহাদুর শাহ মালব ও গুজরাট পুনরায় অধিকার করিলেন।

হুমায়ুন ও বাহাদুর শাহ

১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সের খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। এবারে হুমায়ুন এই দুর্দান্ত পাঠান নায়ককে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত

সের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা

করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া হুমায়ুন আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন এবং জানুয়ারী মাসে চুণার দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সের একদল সুশিক্ষিত সৈন্য দুর্গের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়া নিজের ও পাঠান ওমরাহ্‌বর্গের পরিবারদিগকে দুর্গমধ্য হইতে সরাইয়া এক নিরাপদ স্থানে রাখিলেন।

হুমায়ুন দীর্ঘকাল পর্যন্ত চুণার দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার রক্ষকগণ অশেষ অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে সের খাঁ রোটাস্‌ দুর্গ অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু হুমায়ুন যখন চুণার দুর্গ অধিকার করিয়া বঙ্গদেশের রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন সের খাঁ যুদ্ধ না করিয়াই সরিয়া গেলেন। বঙ্গের রাজধানী গৌড় সহজেই হুমায়ুনের হস্তগত হইল, এবং হুমায়ুন জয়লাভের পর আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন। এমন সময় তাঁহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, সের খাঁ চুণার পুনরধিকার ও জৌনপুর অবরোধ করিয়াছেন, এবং বিহার ও বারাণসী প্রদেশ জয় করিয়া কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। এই সংবাদে ব্যস্ত হইয়া হুমায়ুন আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; সের খাঁ গঙ্গাতীরে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দুই মাস কাল সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিল। অবশেষে একদা প্রাতঃকালে অপ্রত্যাশিতরূপে সের-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে

হুমায়ুনের পরাজয়

পরাজিত হইলেন (১৫৩৯ খৃঃ)। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া হুমায়ুন প্রাণরক্ষার্থ গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এক ভিস্তি তাহার বায়ুপূর্ণ মশকের সাহায্যে সম্রাট্‌কে গঙ্গার অপর পারে লইয়া গেল। মুঘলসৈন্যের কতক হত হইল, কতক জলে ডুবিয়া মরিল, অতি অল্প সংখ্যক পলাইয়া রক্ষা পাইল। হুমায়ুনের বেগম এবং অন্যান্য মুঘল মহিলাগণ পর্যন্ত সের খাঁর হস্তে বন্দী হইলেন। সের খাঁ প্রকৃত বীরের মত সসম্মানে তাঁহাদিগকে হুমায়ুনের নিকট ফিরাইয়া দিলেন।

এবং পলায়ন

সের সাহ। সের খাঁ এইবার সের সাহ নাম ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। পর বৎসর আবার কনৌজের নিকটবর্তী বিলগ্রাম নামক স্থানে হুমায়ুন সের সাহ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, লাহোরে কামরানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মুঘলসৈন্য আবার সেখানে পরাজিত হইল; সের শাহ সমগ্র পঞ্জাব অধিকার করিলেন।

কনৌজের যুদ্ধ

হুমায়ুনের পুনঃ পরাজয়

এইবার স্থির হইয়া সিংহাসনে বসিয়া সের রাজ্যবিষয়ে এবং বিজিত রাজ্যের সুশৃংখলাবিধানে মনোযোগ প্রদান করিলেন। হুমায়ুন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য যখন তিনি গাক্কারদের অধিকৃত রাওলপিণ্ডির চতুর্দিকস্থ ভূ-ভাগ বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহার নিকট সংবাদ পৌছিল যে, বঙ্গদেশের শাসনকর্তা খিজির খাঁ বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতেছেন। সের সাহ দ্রুতগতিতে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া খিজির খাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদটিই উঠাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশ ১৯টি জেলায় বিভক্ত হইল এবং

বঙ্গদেশের ব্যবস্থা

প্রত্যেক জেলা ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তার হস্তে ন্যস্ত হইল। এই শাসনকর্তাগণকে স্বয়ং সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করিতে হইত, এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারও অধীন ছিল না। এইরূপ ব্যবস্থায় অতঃপর সমগ্র বঙ্গদেশের একযোগে বিদ্রোহী হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল।)

এইরূপে বঙ্গদেশে বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করিয়া সের সাহ মালব বিজয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। মালব প্রদেশ এই সময়ে **মালব-বিজয়** তিনজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রায়সিনের চৌহানবংশীয় রাজপুত পুরণমল সের সাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া রক্ষা পাইলেন। অপর দুইটি মুসলমান-প্রধান পরাজিত এবং দেশ হইতে দূরীভূত হইলেন।

এই সময়ে মারবার রাজ্যের রাজা মালদেব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং হুমায়ুনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। আশ্বাস পাইয়া হুমায়ুন মারবার রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সের সাহ মালদেবের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মালদেব হুমায়ুনের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন এবং হুমায়ুন হতাশ হইয়া **হুমায়ুনের প্রস্থান** ফিরিয়া গেলেন। ইহারই কিছু পূর্বে হুমায়ুণ হামিদাবানুকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মারবার হইতে প্রস্থানের পথে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত উমরকোট নামক স্থানে হামিদাবানুর পুত্র মুঘলসম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ আকবরের জন্ম হয়। হুমায়ুনের প্রস্থানের পরে সের সাহ বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ বিহার মিলাইয়া একটি সুবাতে পরিণত করিলেন। এই সময়েই

তৎকর্তৃক প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষের নিকট বর্তমান পাটনা নগরী সংস্থাপিত হয়।

অতঃপর সের সাহ রায়সীনের পুরণমলকে পরাজিত করিয়া মালব প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিলেন।

মালব জয়ের পর সের সাহ মুলতান ও সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করেন। রণথম্ভোর দুর্গও বিনাযুদ্ধে তাঁহার করতলগত হয়।

এক্ষণে মারবারের মালদেব ভিন্ন সের সাহের আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য সের সাহ মারবার ও রাজপুতানা পদানত করিতে সংকল্প করিলেন। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে অসংখ্য সৈন্য লইয়া তিনি মারবার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রাজপুত বীরগণের সহিত যুদ্ধে, বিশেষত বিদ্যুদ্‌গতি অশ্বারোহীর পরাক্রমে, সের সাহ প্রথমত বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে বহু কৌশলে তিনি মালদেবের মনে তাঁহার সেনাপতিগণের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ জন্মাইলেন এবং মালদেব সেনাপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর দিকে চলিয়া গেলেন। ক্ষুব্ধ সেনাপতিগণ নিজেদের রক্তে এই অন্যায় কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং একযোগে ভীমবেগে সের সাহের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। একে একে যখন এই দলের সমস্ত নিঃশেষে হত হইল, তখন সের সাহ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি কুকাজই করিয়াছিলাম, একমুষ্টি বজ্‌রার জন্য গোটা হিন্দুস্থানটা হারাইতে বসিয়াছিলাম।" মারবার বিজয়

এইরূপে মালদেব পরাজিত হইলে, সের সাহকে বাধা দিবার জন্য রাজপুতানায় আর কেহ রহিল না। আজমীর হইতে আবু-

পর্বত পর্যন্ত সমস্ত ভূ-ভাগ তিনি জয় করিলেন এবং চিতোর দুর্গও তাঁহার হস্তগত হইল। রাজপুতানা পদানত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি কালঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন (১৫৪৪ খৃঃ)। এই অবরোধকালে একটি বোমা দুর্গ-দেয়ালে প্রতিহত হইয়া নিকটে রক্ষিত বোমার স্তূপে আসিয়া পড়ে এবং তাহাতে সমস্ত গোলা একত্র জ্বলিয়া উঠে। সের সাহ নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি এই বোমার আগুনে গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়া অল্পক্ষণ পরেই প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সেরের সৈন্যদল কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করে (১৫৪৫ খৃঃ)।

মৃত্যু

সের সাহের চরিত্র। সের সাহ ভারতীয় শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যে আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি তাঁহার সাহস, যোগ্যতা, সতর্কতা ও সমর-কৌশলে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। মুঘলগণ তাঁহাকে সিংহাসনে অনধিকারী মনে করিত, কিন্তু তাহারাও সের সাহের অভ্যুদয়ের মাত্র ১৪ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল এবং এই ভারতীয় পাঠান-বীর অপেক্ষা ভারতের সিংহাসনে তাহাদের স্বত্ব কিছুতেই বলবত্তর ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক তাঁহাকে অনধিকারী না বলিয়া মুঘলের হস্ত হইতে পাঠান সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারকারী বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়।

দেশ-শাসন কার্যে সুশৃংখলা বিধান

সের সাহের রাজ্যশাসন-প্রণালী। রাজ্যের শাসন-প্রণালীর উন্নতি বিধানেই সের সাহের গৌরব সমধিক প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিজিত প্রদেশসমূহ অনেকগুলি সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক সরকার আবার বহুতর পরগণায়

বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক সরকার ও পরগণার ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য নির্বাহের জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। সের সাহ জরিপদ্বারা তাঁহার সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি মাপাইয়া প্রত্যেক প্রজার জমির সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। মোট উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ জমির খাজানারূপে নির্দিষ্ট হইত। প্রজাগণ ইচ্ছামত শস্যদ্বারা অথবা অর্থদ্বারা খাজানা দিতে পারিত। সের সাহ কবুলিয়ত ও পাট্টার প্রথা প্রবর্তন করেন। এইরূপে প্রজাগণ এই প্রথমে তাহাদের জমির সীমানা ও তাহাদের দেয় খাজানা সম্বন্ধে ভূস্বামীর নিকট হইতে লিখিত দলিল প্রাপ্ত হইল।

দেশমধ্যে যাতায়াতের বন্দোবস্তের তিনি বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড তাঁহারই কীর্তি। রাস্তা নির্মাণ করিয়া তিনি রাস্তার দুই ধারে গাছ পুঁতিয়া দিলেন, এবং কতক দূরে দূরে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য সরাইখানা স্থাপিত করিলেন।

যাতায়াতের বন্দোবস্তের উন্নতি

সের সাহই সর্বপ্রথমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ দেশটা একা হিন্দুরও নহে, একা মুসলমানেরও নহে, উভয়েরই; তাই তিনি এই উভয় সম্প্রদায়কে একতাসূত্রে মিলাইতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দেশের প্রচলিত মুদ্রার উন্নতি সাধন করিলেন এবং প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। মুদ্রার উপরে তিনি পারস্য ও হিন্দি উভয় ভাষায়ই নিজের নাম লিখাইলেন।

সের সাহের রাজনীতি

তিনি সৈন্যদলেরও উন্নতিবিধান করিলেন এবং কঠোর নিয়ম শৃংখলায় তাহাদিগকে সুনিয়ন্ত্রিত করিলেন। বিচারকালে তিনি সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। প্রজাসাধারণের

সৈন্যদলে শৃংখলাবিধান

স্বার্থরক্ষায় তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বহু ইমারৎ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সাসারামে তাঁহার নিজের জন্য নির্মিত সমাধিমন্দির স্থাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দিল্লীতেও তিনি একটি নূতন নগরী নির্মাণ করেন।

যখন আমরা চিন্তা করিয়া দেখি যে, স্বল্প পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে সের সাহ এত কাজ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, তখন আমরা তাঁহার অপূর্ব প্রতিভা এবং অদ্ভুত শ্রমশীলতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে বাধ্য হই। সময় সময় বিশ্বাস-ঘাতকতা তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা নিক্ষেপ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও তাঁহাকে মধ্যযুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

সের সাহের পরবর্তিগণ। সের সাহের পরে তাঁহার পুত্র ইস্‌লাম সাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহাকে সর্বদাই বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার শিশুপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করে। সের সাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ আদিল এই শিশুকে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার হিমু নামে এক হিন্দু সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন। আদিল রাজ্য পরিচালনের ভার তাঁহারই হস্তে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু সের সাহের বংশের রাজত্ব আর বেশী দিন টিকিল না। বঙ্গ ও মালব স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এদিকে সের সাহের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র সিকন্দর শূর পঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দিল্লী ও আগ্রা পর্যন্ত এই বিদ্রোহিগণের হস্তগত হইল। সের সাহের প্রতিষ্ঠিত

সাম্রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা।

সাম্রাজ্যের যখন এই অবস্থা তখন হুমায়ুন আবার ভারতবর্ষে দেখা দিলেন।

হুমায়ুনের দুর্দশা

হুমায়ুন। সের সাহ পঞ্জাব অধিকার করিলে হুমায়ুন গৃহহীন হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। সিন্ধু, রাজপুতানা এবং কান্দাহারে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা বিফল হওয়ায়, অশেষ দুঃখ, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করার পর তিনি অবশেষে পারস্যরাজের সভায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। এই দুঃখ দারিদ্র্যের সময় কিরূপে উমরকোট নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয় (২৩শে নবেম্বর, ১৫৪২ খৃঃ) তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

আকবরের জন্ম

পারস্যের রাজা হুমায়ুনের প্রকৃত বন্ধুর কার্য করিলেন। তৎকর্তৃক প্রদত্ত একদল সৈন্যের সাহায্যে তিনি কান্দাহার জয় করিয়া অবশেষে কাবুলও জয় করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতবর্ষে অরাজকতা দেখিয়া তিনি আবার ভারতের সিংহাসন উদ্ধার করিতে যত্নবান হইলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হুমায়ুন লাহোর অধিকার করিলেন এবং কিছুদিন পরে সিকন্দর শূরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। কিন্তু রাজ্যে শৃংখলা বিধান করিবার পূর্বেই তিনি একদিন তাঁহার পুস্তকাগারের সোপান হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন (১৫৫৬ খৃঃ)।

হুমায়ুনের পুনরাগমন

মৃত্যু

হুমায়ুন অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্রস্বভাবের লোক ছিলেন এবং যোগ্যতা ও সাহসেও তিনি হীন ছিলেন না। কিন্তু পিতার উদ্যম, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম-ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি আফিং খাওয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন; তাঁহার শোচনীয় উদ্যম-হীনতার বোধ হয় ইহাই প্রধান কারণ। ভ্রাতৃস্নেহ হুমায়ুনের চরিত্রের

হুমায়ুনের চরিত্র

একটি বিশেষত্ব। বাবর মৃত্যুকালে হুমায়ুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতারা অপরাধ করিলেও হুমায়ুন যেন তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট না করেন। হুমায়ুন প্রাণপণে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃগণের পুনঃপুন বিশ্বাস-ঘাতকতা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কামরান্ পুনঃপুন তাঁহার বিদ্রোহাচরণ করায় অবশেষে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার্থ তিনি তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্য

১। আকবর

আকবরের অভিষেক। পিতার মৃত্যুতে যখন আকবর ভারতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন, তখন তিনি পঞ্জাবে বাস করিতেছিলেন। গুরুদাসপুর জেলার কালনৌর নামক স্থানে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। আকবরের বয়স তখন ১৪ বৎসর মাত্র। বৈরাম খাঁ আকবরের অভিভাবকস্বরূপ রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। বৈরাম খাঁ

আকবরের সংকট। রাজা হইয়া আকবর বিষম সংকটে পতিত হইলেন। হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার শত্রুদল তখনও সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় নাই। পুনরায় রাজা হইয়া যে সাত মাস তিনি বাঁচিয়াছিলেন, তাহাতে অতি সামান্য ভূ-ভাগের উপরই তিনি স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। আকবরের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন হিমু। তিনি দিল্লী ও আগ্রা অধিকারপূর্বক বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বৈরাম খাঁ ও আকবর হিমুর বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং পানিপথের বিখ্যাত ক্ষেত্রে দুই সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হইল (৫ই নবেম্বর, ১৫৫৬ খৃঃ)। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় হিমুর জয়ের সম্ভাবনা (১) হিমুর দিল্লী অধিকার

দেখা গেল। কিন্তু সহসা একটি বাণ চক্ষুতে বিদ্ধ হওয়ায় হিমু অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন; নায়কের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল। আকবরের সম্পূর্ণ জয় হইল।

পাঠানগণের পরাজয়। বিজয়ী আকবর সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। মুহম্মদ শাহ আদিল আকবরকে বাধা দিবার কোনও চেষ্টাই করিলেন না, এবং শীঘ্রই বঙ্গের স্থলতানের সহিত এক যুদ্ধে তিনি হত হইলেন। সিকন্দর শূর আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালাইলেন বটে, কিন্তু অবশেষে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আকবর সসম্মানে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে সের সাহ প্রতিষ্ঠিত পাঠান সাম্রাজ্য লোপ পাইল।

পাঠান রাজ্যের লোপ

বৈরাম খাঁর পতন। পরবর্তী তিন বৎসরে আকবর গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর জয় করিলেন। এখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর হইল, এবং বৈরাম খাঁর অধীনে থাকা আর তিনি পছন্দ করিলেন না। তাঁহার মাতা, ধাত্রীমাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে বৈরামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে আকবর বৈরামকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। বৈরাম এই অপমানে বিদ্রোহী হইলেন, কিন্তু পঞ্জাবে পরাজিত হইলেন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, এবং মক্কা যাইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু পথে এক শত্রুর হস্তে বৈরাম প্রাণ হারাইলেন (১৫৬০ খৃঃ)।

আকবরের বিজয়

বৈরামের পদচ্যুতি

বৈরামের বিদ্রোহ ও মৃত্যু

আকবরের মাতা, ধাত্রীমাতা মহম অনাগা এবং রাজান্তঃপুরের কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারিণী স্ত্রীলোক এখন বৈরামের স্থান গ্রহণ

করিলেন, এবং তাঁহাদের ব্যবস্থায় শাসনকার্যে বিষম বিশৃংখলা উপস্থিত হইল। ছয়বৎসর পর্যন্ত এইরূপ চলিল। অবশেষে আকবর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, রাজ্য শাসনের ভার সম্পূর্ণরূপে নিজের হস্তে গ্রহণ করিলেন।

আকবরের শাসনভার গ্রহণ

আকবরের রাজ্য জয়। আকবর প্রথম হইতেই সমস্ত শত্রুরাজ্য জয় করিয়া ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার উচ্চাকাংক্ষা পোষণ করিতেন। প্রথমে মালবদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হইল (১৫৬০)। দুই বৎসরের মধ্যেই মালবরাজ বাজবাহাদুর মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তখন বর্তমান মধ্য-প্রদেশের উত্তর ভাগ জুড়িয়া গণ্ডোয়ানা নামক রাজ্য বর্তমান ছিল। আকবরের পূর্ব প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খাঁ গণ্ডোয়ানা রাজ্য আক্রমণ করিলেন (১৫৬৪)। এই রাজ্যের বিধবা রাণী বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী আসফ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিলেন। যখন দেখিলেন আর কোন আশা নাই, তখন অপমানের হাত এড়াইবার জন্য নিজের ছুরিকা বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার বীরপুত্রও যুদ্ধ করিয়া বীরের মত প্রাণ দিলেন। অন্তঃপুরিকাগণ ভীষণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পুড়িয়া মরিলেন। গণ্ডোয়ানা মুঘলের পদানত হইল।

গণ্ডোয়ানা জয়

রাণী দুর্গাবতী

নিজ সেনাপতিগণের কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করিয়া আকবর এইবার মেবার রাজ্য অধিকারে মনোযোগ প্রদান করিলেন। রাজপুত রাজাদের মধ্যে মেবারের রাণা সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। হিন্দু রাজাদিগকে ঘনিষ্ঠতর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য আকবর হিন্দু রাজগণের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

মেবার রাজ্য

মেবারের গর্বিত রাণা কিন্তু আকবরকে কন্যাদানে অস্বীকৃত হইলেন। আকবর মেবার আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী চিতোর নগরী অবরুদ্ধ করিলেন। বিখ্যাত সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহ তখন মেবারের রাণা। এই ভীরু রাজা আকবরের আক্রমণে পাহাড়ে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু রাজপুতবীর জয়মল্ল ও পুত্ত চিতোর রক্ষার্থ প্রাণপণ যুঝিতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচ মাস ধরিয়া অবরোধ চলিল; অবশেষে সহসা একদিন আকবরের গুলিতে জয়মল্ল প্রাণ হারাইলেন। চিতোরের রক্ষকগণ জয়মল্লের মৃত্যুতে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। যখন চিতোর রক্ষার আর কোনও আশা রহিল না, তখন রাজপুত রমণীগণ জহরব্রতের অনুষ্ঠানপূর্বক পুড়িয়া মরিলেন, এবং রাজপুতবীরগণ চিতোরের দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া উন্মুক্ত অসিহস্তে মুসলমান সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিল। চিতোরের বীরগণ মরিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের বীরত্বের কীর্তিকাহিনী আজিও অমর হইয়া আছে। রাজপুতগণের বীরত্বের সম্মান করা দূরে থাকুক, আকবর চিতোরে প্রবেশ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে ত্রিশ হাজার অধিবাসীকে হত্যা করিলেন। আকবরের চরিত্রের এই বিষম কলঙ্কের কালিমা কখনও মুছিবার নহে। এইখানে বলা আবশ্যক যে, রাজপুতবীরত্বের সম্মানার্থ আকবর জয়মল্ল ও পুত্তের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করিয়া আগ্রার দুর্গদ্বারের দুইপার্শ্বে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

চিতোর অবরোধ

চিতোরের পতন

ত্রিশ সহস্র চিতোরবাসীর হত্যা

এইরূপে চিতোরের পতন হইল, এবং পরে রণথম্ভোর ও কালঞ্জর দুর্গ আত্মসমর্পণ করিলে (১৫৬৯) প্রায় সমগ্র রাজপুতানা আকবরের পদানত হইল। কিন্তু রাজপুতানা তিনি কখনও

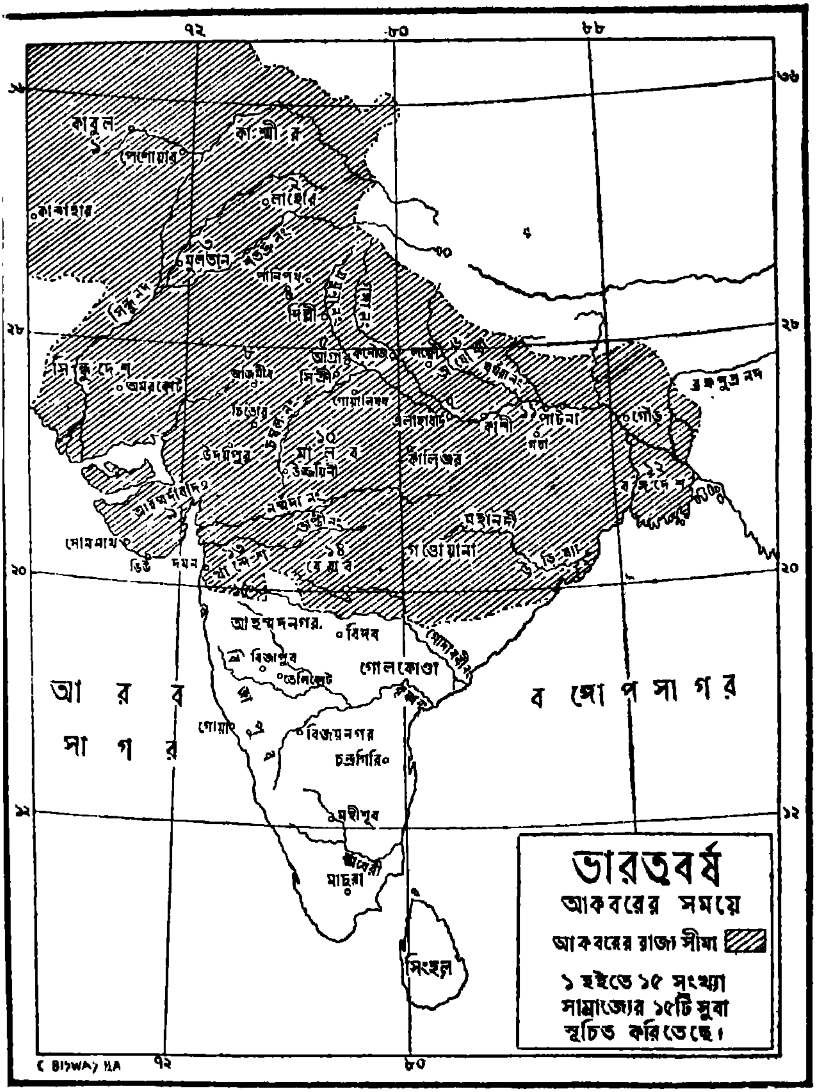
ভারতবর্ষ
আকবরের সময়ে
আকবরের রাজ্য সীমা
১ হইতে ১৫ সংখ্যা
সাম্রাজ্যের ১৫টি সুবা
সূচিত করিতেছে।
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
কাবুল
কাশ্মীর
পেশোয়ার
লাহোর
কান্দাহার
মুলতান
পানিপথ
দিল্লী
সিন্ধু নদ
সিন্ধুদেশ
অমরকোট
আজমীর
আগ্রা
কনৌজ
লক্ষ্ণৌ
গোয়ালিয়র
চিতোর
উদয়পুর
মালব
উজ্জয়িনী
এলাহাবাদ
কাশী
পাটনা
গয়া
গৌড়
কালিঞ্জর
ব্রহ্মপুত্র নদ
বঙ্গদেশ
আহম্মদাবাদ
সোমনাথ
দমন
নর্ম্মদা নঃ
মহানদী
গণ্ডোয়ানা
আহম্মদনগর
বিদর
বিজাপুর
গোলকোণ্ডা
গোয়া
বিজয়নগর
চন্দ্রগিরি
মহীশূর
মাদুরা
সিংহল
৭২
৮০
৮৮
৩৬
২৮
২০
১২

সম্পূর্ণরূপে স্বীয় শাসনাধীনে আনিতে পারেন নাই। রাজপুত জাতি বহু পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী ছিল।

রাণা প্রতাপসিংহ। মারওয়ার, অম্বর (জয়পুর), বিকানীর ও বুন্দী প্রভৃতি অধিকাংশ রাজপুত রাজ্য আকবরের অধীনতা স্বীকার করিল বটে, কিন্তু মেবার কিছুতেই মস্তক অবনত করিল না। উদয়সিংহের মৃত্যুর পরে (১৫৭২) প্রতাপ যখন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, তখন আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে জয়পুররাজ মানসিংহকে (vi) প্রেরণ করিলেন। মেবারের রাজধানী তখন আকবরের হস্তগত, কিন্তু তবুও মেবারবাসী উদয়সিংহের পুত্র বীরবর প্রতাপসিংহের অধীনে মুঘলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইল। মুঘলের বেতনভোগী রাজপুত মানসিংহ রাজপুত-স্বাধীনতার শেষ শিখাটি নির্বাপিত করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। হল্‌দিঘাটের গিরিসংকটে উভয় সৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ হইল। প্রতাপ বার বার যুদ্ধতরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিলেন, বার বার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মানসিংহকে স্বহস্তে বধ করার জন্য নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এক প্রভুভক্ত অনুচরের আত্মবিসর্জনে কোন মতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ক্ষুদ্র রাজপুত সৈন্যদল অগণ্য মুসলমানবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিল না। প্রতাপ পরাজিত হইয়া (১৫৭৬ খৃঃ) পর্বতের দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শত দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যেও একদিনের জন্য এই স্বাধীনতার সমর হইতে বিরত হইলেন না।

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ

প্রতাপের অপূর্ব বীরত্ব ও পরাজয়

এই বীরশ্রেষ্ঠের জীবন-কাহিনী ভারতের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁহার অপূর্ব সাহস, অনন্যসাধারণ বীরত্ব, অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। এখনও রাণা প্রতাপের নামে সমস্ত ভারত-বাসীর মস্তক সম্ভ্রমে অবনত হয়। রাণা প্রতাপ মুঘলের অসংখ্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, পর্বত হইতে পর্বতান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ অনাহারে অর্ধাহারে দিনের পর দিন কাটাইয়াছেন, তথাপি আকবরের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গের এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাঁহার আজীবন সাধনা ও স্বদেশ উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টার ফল অবশেষে ফলিল। ১৫৯৭ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষের গৌরবের রাজধানী চিতোর তিনি আর উদ্ধার করিয়া যাইতে পারিলেন না। প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, চিতোরের উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তিনি তৃণশয্যায় ভিন্ন শুইবেন না, বৃক্ষপত্রে ভিন্ন আহার করিবেন না। আমরণ তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি নিকটবর্তী এক পর্বত-শিখর হইতে চিতোরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া উত্থিত হইত এবং অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষদেশ প্লাবিত হইয়া যাইত। এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, যে, এই অপূর্ব বীরত্ব আকবরেরও হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপসিংহের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন। সময় সময় শতমুখে তিনি তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন।

প্রতাপের রাজ্যের পুনরুদ্ধার

প্রতাপের মৃত্যু

আকবর কর্তৃক প্রতাপের প্রশংসা

গুজরাট বিজয়। হুমায়ুন একবার গুজরাট-বিজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সের সাহকে দমন করিতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইলে, গুজরাট পুনরায় স্বাধীনতা অবলম্বন করে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আকবর গুজরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং এক বৎসর যুদ্ধের পর সমস্ত গুজরাট প্রদেশ অধিকার করিলেন। এই সমরাভিযানে আকবর অসাধারণ সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

বঙ্গবিজয়। বঙ্গদেশ তখন সুলেমান কর্‌রাণী নামক পাঠান রাজার অধীনে ছিল। সুলেমান সের সাহের পুত্র পাঠান সম্রাট ইস্‌লাম শাহের অধীনে দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু উক্ত রাজার মৃত্যুর পরে বঙ্গ ও বিহার অধিকার করেন। তিনি উড়িষ্যা জয় করেন ও বঙ্গের রাজধানী গৌড় হইতে তাণ্ডায় স্থানান্তরিত করেন। নামে আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভাবেই রাজ্য চালাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে (১৫৭২ খৃঃ অঃ) আকবর বঙ্গদেশ জয় করিতে উদ্যোগ করিলেন। সুলেমানের পর তাঁহার দুই পুত্র বায়াজিদ ও দাউদ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারা আকবরের অধীনতা অস্বীকার করায় আকবর বঙ্গদেশ জয় করিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহাতে বিশেষ কোন ফল না হওয়ায় ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং বঙ্গদেশে এক সমরাভিযান করিলেন। পাটনা হইতে তাড়িত হইয়া দাউদ খাঁ উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করিলেন। আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দাউদকে আবার তুকারোইর যুদ্ধে পরাজিত করিলেন, কিন্তু সুবিধাজনক সর্তে সন্ধি করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। দাউদ

দাউদ খাঁর পরাজয়

আবার বিদ্রোহী হইয়া ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজমহলের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হন এবং বঙ্গদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বঙ্গদেশের মুঘল শাসনকর্তা রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের পাঠান ও হিন্দু জমিদারগণ বহুদিন পর্যন্ত আকবরের বিদ্রোহাচরণ করেন এবং কেহ কেহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল পর্যন্ত মুঘলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ইঁহাদিগকে বার-ভূঞা বলে। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের ঈশা খাঁ ও কেদার রায় এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্য সমধিক প্রসিদ্ধ।

কাশ্মীর বিজয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরের হিন্দু রাজ্যটি উহার মুসলমান মন্ত্রী হস্তগত করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আকবর কাশ্মীর জয় করিয়া উহা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন।

কাবুল। কাবুল মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও ইহার শাসনকর্তা আকবরের ভ্রাতা মির্জা মুহম্মদ হাকিম স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতেন। আকবরের ধর্মসংস্কারের ফলে যখন গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় বিরক্ত হন—তখন তাঁহারা উক্ত মির্জার সহিত আকবরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন এবং মির্জা পঞ্জাব আক্রমণ করেন। আকবর সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং কাবুল অধিকার করেন (১৫৮১)। মির্জা পুনরায় কাবুলের অধিপতি হন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কাবুল মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১৫৮৫ খৃঃ)।

আকবরের সাম্রাজ্য। আকবর ১৫৯১ খৃঃ দক্ষিণ সিন্ধুদেশ, ১৫৯২ খৃঃ উড়িষ্যা, ১৫৯৪ খৃঃ বেলুচিস্থান এবং ১৫৯৫ খৃঃ

কান্দাহার জয় করেন। এইরূপে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি সমগ্র উত্তর ভারত এবং কাবুল, কান্দাহার, গজনী ইত্যাদি লইয়া এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়। কিন্তু উত্তর ভারত জয় করিয়াই আকবরের রাজ্য বিস্তারের পিপাসা নিবৃত্ত হইল না। এইবার নর্মদার দক্ষিণদিকস্থ রাজ্যসমূহে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত (XII) হইল। আহম্মদনগর রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরিত হইল। আহম্মদনগরের বীর্যবতী রাণী চাঁদ সুলতানা অসীম সাহসের সহিত আহম্মদনগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে বেরার প্রদেশ আকবরকে প্রদান করিয়া চাঁদ সুলতানা সন্ধি স্থাপন করিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি দুর্বিনীত আহম্মদনগরবাসীর ষড়যন্ত্রে চাঁদ সুলতানা হত হইলে, আহম্মদনগরের সহিত আকবরের আবার যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং আহম্মদনগর আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এবারেও আকবর উক্ত রাজ্যের উত্তরাংশ মাত্র অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আহম্মদনগরের অবশিষ্টাংশ আকবরের পৌত্র শাহ্‌জাহানের আমলে বিজিত হয়। আকবর খান্দেশ রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করেন। পরে ইহার অভেদ্য দুর্গ আসিরগড়ও তাঁহার হস্তগত হইল (১৬০১ খৃঃ)। উৎকোচ প্রদান ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারাই আকবর ইহা জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

আহম্মদনগরে অভিযান

চাঁদ সুলতানা

আহম্মদনগরের পতন

খান্দেশ বিজয়

সেলিমের বিদ্রোহ। আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয় আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। কারণ ইতিমধ্যে রাজকুমার সেলিম বিদ্রোহী হইলেন (১৬০০)। সেলিম

সেলিমের বিদ্রোহ

আবুল ফজলের হত্যা

স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, এমন কি ষড়যন্ত্র করিয়া আকবরের মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত বন্ধু আবুল ফজলকে পর্যন্ত হত্যা করাইলেন (১৬০২)। অবশেষে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে পিতাপুত্রের মিলন হইল বটে, কিন্তু সেলিমকেই আকবর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিবেন কিনা, তাহা শেষ পর্যন্ত সন্দেহস্থল ছিল।

পিতার সহিত পুনর্মিলন

আকবরের শেষ জীবন। আকবরের শেষ জীবন বড় শোচনীয় হইয়াছিল। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে, তাঁহার পুত্র মুরাদ ও দানিয়েল অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিম নিজের আচরণে আকবরের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশেষে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া দিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি সেলিমকেই নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া গেলেন।

আকবরের মৃত্যু

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব। মুঘল সম্রাট্‌গণের মধ্যে আকবরকেই সাধারণত সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়। বিস্তৃত দিগ্বিজয়, শাসনকার্যের সৌকর্যবিধান, রাজসভায় বহু গুণিগণের সমাবেশ, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি এবং সর্বোপরি আকবরের আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের বিষয় বিবেচনা করিলে, আকবরের এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

আকবরের শাসনবিধান। আকবর শাসন-বিভাগের সুশৃংখলাবিধান করিয়াছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যটি তিনি ১৫টি সুবাতে বিভক্ত করেন; যথা—দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, লাহোর, কাবুল, মুলতান, আহম্মদাবাদ (গুজরাট), মালব, খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, বিহার এবং

শাসন-সংস্কার

পঞ্চদশ সুবা

বঙ্গদেশ। প্রত্যেক সুবাতেই প্রায় একই রকমের শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হইল। প্রত্যেক সুবাতে শাসন ও সামরিক বিভাগে অসীম ক্ষমতাপন্ন এক একজন সুবাদার * প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইঁহারা অনেকটা বর্তমান কালের গবর্ণরের তুল্য। সুবাদারের অধীনে একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন, এবং রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। বিচারের জন্য মীর আদল এবং কাজী নামে দুই শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন, এবং শান্তিরক্ষার ভার কোতোয়ালের উপর অর্পিত হইল। অন্যান্য কর্মচারীর মধ্যে বক্সী (বেতন-বিভাগের কর্তা), মীর বহর (নৌবহর, ডাক-বিভাগ ও ফেরীঘাটের কর্তা), বাকিয়া নবিস (দলিল-বিভাগের কর্তা) ও সদর (মস্‌জিদ ও দানদাতব্য-বিভাগের কর্তা) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমর-বিভাগে ক্রমোচ্চ মর্যাদা অনুসারে মন্‌সবদারগণ নিযুক্ত হইলেন এবং সমস্ত সামরিক বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত হইল। পূর্বকালে কর্মচারিগণকে বেতনের পরিবর্তে জাগীর দেওয়া হইত। আকবর সেই নিয়ম উঠাইয়া দিয়া নগদ টাকায় বেতন দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত করেন।

সুবার শাসন-প্রণালী

মন্ত্রী টোডরমল্লের সহায়তায় আকবর রাজস্ব-বিভাগেরও আমূল সংস্কার করেন। তিনি প্রথমত সাম্রাজ্যের সমস্ত জমির জরিপ করাইলেন; উর্বরতা অনুসারে জমিগুলি তিনভাগে বিভক্ত হইল। উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ রাজকর বলিয়া ধার্য হইল এবং এই রাজস্ব প্রজা ইচ্ছামত নগদ টাকা বা শস্যদ্বারা দিতে পারিত। এই সকল বিষয়ে আকবর সের সাহ কর্তৃক প্রবর্তিত

টোডরমল্ল ও রাজস্ববিভাগের সংস্কার

* আকবরের সময় ইহাকে 'সিপাহ্ সলর' বলিত। পরবর্তীকালে সুবাদার নামই সুপরিচিত ছিল।

প্রথারই উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তাঁহার এই বিধান স্থায়িত্বলাভ করায় প্রজাসাধারণের অশেষ উপকার সাধিত হইল।

আকবরের রাজসভা। আকবরের রাজসভা ঐ যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তি কর্তৃক অলংকৃত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন—ফৈজী ও আবুল ফজল নামে ভ্রাতৃদ্বয়; বিদ্যাবত্তার জন্য ফৈজী বিখ্যাত ছিলেন, আর আবুল ফজল একাধারে বিদ্বান্, গ্রন্থকার, সভাসদ এবং বিষয়কার্যে সুনিপুণ ছিলেন। আবুল ফজল আকবরের বিশ্বস্ত বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন এবং তিনি তাঁহার প্রভুর রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণ আকবর-নামা এবং আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেলিমকর্তৃক আবুল ফজলের হত্যা, আকবরের বুকে শেলের মত বিঁধিয়াছিল।

ফৈজী

আবুল ফজল

রাজা মানসিংহ

অম্বররাজ মানসিংহ আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। সর্বাপেক্ষা দুরূহ সমরাভিযানগুলি তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইত। অনেকবার অনেক প্রদেশে তিনি সুবাদারের কার্যে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

টোডরমল্ল

যোগ্য লোক নির্বাচনে আকবরের কিরূপ নিপুণতা ছিল, রাজা টোডরমল্লের উন্নতিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। টোডরমল্ল অত্যন্ত সামান্য অবস্থা হইতে শুধু নিজের যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। সেনাপতির কার্যেও তাঁহার দক্ষতা কম ছিল না। কিন্তু রাজস্ব-বিভাগের সুশৃংখলা বিধানের জন্যই তিনি বিখ্যাত। আকবরের রাজত্বে রাজস্ব-বিভাগের সংস্কারগুলি টোডরমল্লের সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

আকবরের সভায় অন্যান্য গুণিগণের মধ্যে বিখ্যাত হাস্যরসিক রাজা বীরবল ও সুপ্রসিদ্ধ সংগীতবিৎ তানসেনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বীরবল তানসেন

শিল্প ও সাহিত্য। আকবরের রাজত্বকালে অনেক সুরম্য হর্ম্য নির্মিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির এবং ১৫৭০ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আকবরের প্রিয় বাসস্থান ফতেপুর সিক্রির সুরম্য প্রাসাদ ও মসজিদগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। চিত্রশিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এবং তাহার অনেক উৎকৃষ্ট নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। সংগীতবিদ্যারও অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

আকবরের রাজত্বকাল হিন্দি সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির যুগ। বিখ্যাত কবি ও সাধক তুলসীদাসের নাম ভারতবিখ্যাত। তৎপ্রণীত "রামচরিত মানস" অথবা হিন্দি রামায়ণ লক্ষ লক্ষ হিন্দু কর্তৃক এখনও শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরূপে আদৃত ও সম্মানিত হয়। এই যুগের অন্যান্য হিন্দি কবির মধ্যে আগ্রার অন্ধ কবি সুরদাসই সমধিক বিখ্যাত। আকবরের রাজত্বকালে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়।

হিন্দুগণের প্রতি আকবরের ব্যবহার। ভারতে মুঘলসাম্রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে আকবর ভারত-শাসনে নূতন নীতির প্রবর্তন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শুধু রাজ্যজয়েই রাজ্য রক্ষা হয় না। হিন্দু ও মুসলমান প্রজাসাধারণের হৃদয় জয় করিতে না পারিলে, রাজ্য অধিক কাল স্থায়ী হইবে না। তিনি দেখিলেন, ভারতে মুসলমান রাজ্যের আরম্ভ হইতেই হিন্দুগণ এত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে আকবরের হিন্দুনীতি

যে, এই ভিন্নধর্মী হিন্দুগণের হৃদয় জয় করা কঠিন ব্যাপার। তিনি এই কঠিন ব্যাপারেই প্রথম হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি অম্বররাজ বিহারীমল্লের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন (১৫৬২ খৃঃ) এবং এইরূপে আরও কয়েকটি রাজপুত রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। মুসলমান রাজ্যে অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে জিজিয়া নামক একটি কর দিতে হইত। আকবর এই কর উঠাইয়া দিলেন। হিন্দুতীর্থযাত্রিগণের উপর একটি কর ধার্য ছিল, আকবর তাহাও উঠাইয়া দিলেন। হিন্দুদের প্রতি ব্যবহারে আকবর তাঁহার রাজত্ব ভরিয়াই এই সকল উদারনীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি যোগ্য হিন্দু কর্মচারিগণকে রাজ্যের উচ্চতম পদসমূহে নিযুক্ত করিতেন এবং নিয়োজিত কার্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। ফলে মুসলমানবিদ্বেষী হিন্দুগণ মুঘল-সাম্রাজ্যের একান্ত হিতাকাংক্ষী হইয়া দাঁড়াইল, এবং সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিতে লাগিল।

হিন্দু রাজ-কন্যা বিবাহ

জিজিয়া রদ

যোগ্য হিন্দু-গণকে উচ্চতম পদে নিয়োগ

আকবরের চরিত্র। একজন বিদেশীয় লেখক আকবরের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, আকবরের চরিত্রে বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ ছিল। "তাঁহার স্বভাব সরল ও অমায়িক কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। তিনি দয়ার্দ্রহৃদয় অথচ কঠোর ছিলেন। তাঁহার নিজের পক্ষের লোকেরা তাঁহাকে যেমন ভালবাসিত, তেমনি ভয় করিত। আবার শত্রুগণের তিনি আতঙ্কস্থল ছিলেন।" আকবরের কতকগুলি মনোহর গুণ ছিল। এই গুণের প্রভাবে তিনি নিজের কর্মচারিগণের এবং প্রজাসাধারণের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নিতান্ত সাধারণ লোকও তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইত না, এবং তাঁহার ন্যায়বিচারের কাছে ছোট

বড় ভেদ ছিল না। তাঁহার স্বভাবের প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল, যে, জ্ঞানলাভের স্পৃহা তাঁহার কিছুতেই মিটিত না। তিনি লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না। কিন্তু মানবের জ্ঞানভাণ্ডারের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার অদম্য আগ্রহ ছিল। ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ের পুস্তক তাঁহার নিকট সর্বদা পঠিত হইত, এবং অসাধারণ স্মরণশক্তির সাহায্যে, কাণে শুনিয়া তিনি যাহা শিখিতেন, সাধারণ লোকের পক্ষে চোখে দেখিয়াও তাহা শেখা অসম্ভব ছিল। তিনি সাহিত্য, দর্শন এবং ধর্ম সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং নিজেও তাহাতে যোগ দিতেন।

আকবরের জ্ঞানপিপাসা

আকবরের ধর্মজীবন। আকবরের অদম্য জ্ঞান-পিপাসা হইতেই, আমরা তাঁহার অপূর্ব ধর্মজীবনের মূলসূত্র ধরিতে পারি। তিনি সুন্নী মুসলমানরূপে শৈশবকাল হইতেই প্রতিপালিত। কিন্তু সুফীগণের অপূর্ব রহস্যময় ধর্মমতের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার গোঁড়ামি কমিয়া গেল। সর্ববিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান তাঁহার ধর্মমতকে অত্যন্ত উদার করিয়া তুলিল এবং তিনি সমস্ত ধর্মের মূলতত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইলেন। ধর্ম-বিষয়ক বিচার-বিতর্কের জন্য ইবাদৎখানা (পূজাবাড়ী) নামে একটি পৃথক্ গৃহ নির্মিত হইল। সেখানে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সম্রাট্ পরম ধৈর্যের সহিত জৈন, হিন্দু, খৃষ্টান ও জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত-গণের নিকট বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন।

আকবর যে কেবল এই সমুদয় ধর্মমত শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিতেন, তাহা নহে, এই সকল ধর্মের কোন কোন অনুষ্ঠান নিজে পালন করিতেন। তিনি প্রাচীন পারসীক ধর্মের চতুর্দশটি

ধর্মোৎসব অনুষ্ঠান করিতেন এবং অগ্নি ও সূর্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। জৈন ধর্মাচার্যগণের প্রভাবে এক সময় তিনি অহিংস নীতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তিনি পূর্বে মৃগয়া করিতে বিশেষ ভালবাসিতেন; তাহা একেবারে বন্ধ করিলেন, মাছ ধরাও অনেক কমাইয়া দিলেন। নিজে নিরামিষ আহার আরম্ভ করিলেন, এবং বৎসরের প্রায় অর্ধেক দিনে পশুবধ নিষেধ করিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন। এইরূপে হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মের অনেক অনুষ্ঠান তিনি পালন করিতেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করিয়া বিধবাদিগকে সহমরণ দেওয়া প্রভৃতি কয়েকটি নিষ্ঠুর হিন্দুপ্রথা উদার ও প্রাজ্ঞ আকবরের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া বোধ হওয়ায় উহা রহিত করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল সামান্য সামান্য বিষয় ছাড়া, আকবর কাহারও ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তৎকালে এইরূপ পরধর্মসহিষ্ণুতা অত্যন্ত বিরল ছিল।

১৮ কিন্তু আকবর শেষ পর্যন্ত এইরূপ নিরপেক্ষ থাকিতে পারিলেন না, এবং শীঘ্রই সর্বধর্মে সমদৃষ্টি ধীরে ধীরে মুসলমানধর্মে বিদ্বেষরূপে পরিণত হইতে লাগিল। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এক হুকুম জারি করিলেন যে, মুসলমান ধর্মবিষয়ে সম্রাটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অবশেষে তিনি প্রকাশ্যরূপে মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজে এক ধর্মমতের প্রবর্তন করিলেন (১৫৮২)। সমস্ত ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি লইয়া এই ধর্মমতের গঠন হইয়াছিল। ইহার প্রধান কথা ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস, এবং আকবরকে গুরু বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার। কিন্তু এই ধর্মমত হিন্দু, এবং মুসলমান কোন সম্প্রদায়েই প্রসার লাভ করিল না।

আকবরের নূতন ধর্মপ্রচার

আকবরের ব্যক্তিত্ব। পরিশ্রমে আকবরের কখনও ক্লান্তি ছিল না এবং দেশশাসন ব্যাপারের সমস্ত বিভাগের কার্য তিনি স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি প্রায়ই এককালে তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমাইতেন না এবং কিছুতেই কখনও যেন তাঁহার ক্লান্তি হইত না। সৌহৃদ্যে স্নেহময়, শত্রুতায় উদার, এই অসাধারণ পুরুষ সত্যসত্যই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

২। জাহাঙ্গীর

খস্রুর বিদ্রোহ। আকবরের মৃত্যুর পরে কুমার সেলিম নুরুদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র খস্রু মনে করিয়াছিল, পিতামহের মৃত্যুর পরে সে-ই রাজা হইবে। নিরাশ হইয়া সে পঞ্জাবে বিদ্রোহী হইল। শীঘ্রই সে বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হইল এবং তাহার চক্ষু দু'টি উৎপাটিত করা হইল। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে কারাগারেই খস্রুর মৃত্যু হয়। রাজকুমার খুরম্ (পরবর্তী কালে সম্রাট্ শাহ্‌জাহান) কর্তৃকই এই হত্যাকার্য নিষ্পন্ন হয়, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। খস্রু যখন প্রাণের ভয়ে পলাইতেছিল, তখন শিখগুরু অর্জুন দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করেন। এই অপরাধে অর্জুনের অর্থদণ্ড হয়; উহা দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় জাহাঙ্গীর অর্জুনকে হত্যা করেন।

খস্রুর পরাজয়

নুরজাহান। এই শোচনীয় ঘটনার অব্যবহিত পরেই আর একটি শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। কয়েক বৎসর পূর্বে

জাহাঙ্গীর মিহ্‌রউন্নিসা নামক একটি অপূর্ব সুন্দরী পারস্যদেশীয়া রমণীর প্রতি অনুরক্ত হন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে আকবর অসম্মত হন, এবং শের আফ্‌গান উপাধিধারী আলীকুলী নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। জাহাঙ্গীর কিন্তু মিহ্‌রউন্নিসাকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি শের আফ্‌গানকে হত্যা করাইলেন, এবং মিহ্‌রউন্নিসাকে নিজের অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। এই তেজস্বিনী রমণী প্রথমে তাঁহার স্বামীহন্তার পাণিগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু দীর্ঘ চারি বৎসর কাটিয়া গেলে, নানা দিক বিবেচনা করিয়া অবশেষে তিনি জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিলেন (১৬১১ খৃঃ অঃ) এবং অচিরেই তাঁহার প্রধানা মহিষীর পদ অধিকার করিলেন। তখন তাঁহার উপাধি হইল নূরজাহান বা জগতের আলো। তাঁহার সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও মনোহরণ-ক্ষমতায় শীঘ্রই তিনি জাহাঙ্গীরের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিলেন। রাজকীয় মুদ্রায় জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার নামও মুদ্রিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার পিতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণ রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে উন্নীত হইলেন। এক রকম নূরজাহানই জাহাঙ্গীরের নামে সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে যুদ্ধ। আকবরের রাজত্বকালে আরব্ধ যুদ্ধসমূহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও চলিয়াছিল।

বঙ্গে বিদ্রোহের অবসান

জাহাঙ্গীর ইসলাম খাঁকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইসলাম খাঁ হিন্দু ও পাঠান জমিদারগণকে পরাজিত করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশের

উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কুচবিহার রাজ্যও বিজিত হইয়া মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইসলাম খাঁ শাসনের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিলেন। সম্রাটের নাম অনুসারে এই নগরীর নাম হইল জাহাঙ্গীর-নগর। বর্তমান ঢাকা সহরের ইসলামপুর এখনও ইসলাম খাঁর স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিতেছে।

মেবার বিজয়

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেবার বিজয়। বীর প্রতাপসিংহের অযোগ্য পুত্র অমর সিংহ কুমার খুরমের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অবশেষে মুঘলের অধীনতা স্বীকার করিলেন (১৬১৪ খৃঃ)। জাহাঙ্গীর রাণা ও তাঁহার পুত্রের প্রতি অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যবহার করিলেন সত্য, কিন্তু রাণার অধীনতা স্বীকারেই সমগ্র রাজপুতানায় মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মেবারের রাণা মুঘলসম্রাটের হস্তে কন্যা প্রদানে কখনও স্বীকৃত হন নাই বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্যান্য অধীন রাজপুত রাজার সহিত তাঁহার আর বিশেষ কোন প্রভেদ রহিল না।

আহম্মদনগরের সহিত যুদ্ধ

আকবর শেষ জীবনে আহম্মদনগরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও আহম্মদনগরের সহিত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু আহম্মদনগরের হাব্‌সী জাতীয় মন্ত্রী মালিক অম্বরের চেষ্টার ফলে প্রথম প্রথম মুঘলসৈন্য সেখানে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। অতঃপর কুমার খুরম্ আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন এবং কতক সাফল্য লাভ করিলেন। আহম্মদনগরের দুর্গ আত্মসমর্পণ করিল এবং খুরম্ 'শাহ্‌জাহান' উপাধিতে ভূষিত হইলেন (১৬১৬)। চারি

আহম্মদ-নগরের পতন

কাংগারা দুর্গ অধিকার

বৎসর পরে, যে কাংগারা দুর্গ আকবরও জয় করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা জাহাঙ্গীরের হস্তগত হইল এবং এই বিজয়ে সম্রাট্ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন। ভারতের বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে নিজেদের হস্তে রাখাই পর্তুগীজদের প্রথম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক এশিয়া মহাদেশে তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবারও সংকল্প করিলেন। মিশরী, তুরস্কদেশীয় এবং গুজরাটের মুসলমান বণিক্‌গণের সহিত কয়েকটি জলযুদ্ধে জয়ী হইয়া, তাহারা ভারত সমুদ্রে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিল এবং কয়েকটি বন্দরও অধিকার করিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তাহারা গোয়া নামক স্থান অধিকার করিল, এবং ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে সল্‌সেট ও ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বেসিনও তাহাদের অধিকারে আসিল। পর্তুগীজগণ এবার কংকন প্রদেশে রীতিমত লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। তাহারা বিজাপুর রাজ্যের বন্দরগুলি পোড়াইয়া দিল এবং বিজাপুর ও আহম্মদনগরের মিলিত সৈন্যদলও যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিল না। এইরূপে পর্তুগীজগণ পশ্চিম ভারতে বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। ভারতের পশ্চিম কূলে গোয়া ও চউল এবং পূর্বকূলে হুগলী ও চট্টগ্রাম তাহাদের প্রধান বন্দর ছিল।

পর্তুগীজদের অভ্যুদয়

ভারতে পর্তুগীজ অধিকার

কিন্তু পর্তুগীজগণ ক্রমশই জনসাধারণের বড় বিরাগভাজন হইয়া উঠিতে লাগিল। খৃষ্টীয় গোঁড়ামিবশত তাহারা হিন্দু ও

মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর সমান অত্যাচার করিতে লাগিল, এবং জলপথে তাহাদের দস্যুতার উপদ্রবে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি হইতে লাগিল। গোয়ার বিখ্যাত "ইন্‌কুইজিশন" বা ধর্মাধিকরণ হিন্দুমন্দির ও হিন্দুদের পবিত্র দেবমূর্তিসমূহ ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে চারিখানা মুসলমান তীর্থযাত্রীপূর্ণ জাহাজ পর্তুগীজগণ বলপূর্বক অধিকার করিল। এই ব্যাপারে সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্যস্থিত সমস্ত পর্তুগীজগণকে কারারুদ্ধ করিতে হুকুম দিলেন। খৃষ্টীয় ধর্মের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়া গেল এবং খৃষ্টীয় গীর্জাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। পর্তুগীজগণের ভারত-উপকূলের বাণিজ্য একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য জাহাঙ্গীর ওলন্দাজদের সহিত পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সন্ধি করিলেন (১৬১৫ খৃঃ অঃ)।

পর্তুগীজ অত্যাচার

পর্তুগীজ দমন

শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহ। জাহাঙ্গীর শেষ জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। পারসিকগণ কান্দাহার আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লইল (১৬২৩)। জাহাঙ্গীর পুত্র শাহ্‌জাহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু শাহ্‌জাহান পিতার সেই আজ্ঞা অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হইলেন।

পারসিকগণের কান্দাহার অধিকার

শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহের কারণ সহজেই বুঝা যায়। তাঁহার আশা ছিল, পিতার অবর্তমানে তিনিই পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইবেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার যোগ্যতায় তিনি পিতার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ; অধিকন্তু তিনি নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মমতাজমহলকে

শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহের কারণ

বিবাহ করায়, অসীম প্রতিপত্তিশালিনী নূরজাহানও তাঁহার পক্ষে ছিলেন। সিংহাসনের পথে বিঘ্ন দূর করিবার জন্য তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া বন্দী খসরুর হত্যা সাধন করাইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে নূরজাহানের মন শাহ্‌জাহানের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শারীয়র নূরজাহান ও শের আফ্‌গানের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নূরজাহান এখন শারীয়রের জন্য সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নূরজাহানের এই ব্যবহারে শাহ্‌জাহান চিন্তিত হইলেন, এবং যখন পিতা তাঁহাকে সুদূর কান্দাহারে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ দিলেন, তখন তাঁহার ভয় হইল যে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নূরজাহানের প্রতিপত্তি ও ষড়যন্ত্রের ফলে না জানি তাঁহাকে সিংহাসন হারাইতে হয়। তাই তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন; কিন্তু দিল্লীর নিকটে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে যাইয়া আশ্রয় লইলেন, এবং সেখান হইতে বঙ্গদেশে চলিয়া আসিলেন। অবশেষে ১৬২৫ খৃঃ পিতাপুত্রের বিরোধ মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যেই রহিয়া গেলেন।

শাহ্‌জাহানের পরাজয় ও ক্ষমা লাভ

মহবৎ খাঁর বিদ্রোহ। পর বৎসর শাহ্‌জাহানের পরাজয়-কারী মুঘল সেনাপতি মহবৎ খাঁ নূরজাহানের ষড়যন্ত্রে অস্থির হইয়া স্বয়ং বিদ্রোহী হইলেন। এই সময়ে ঝিলাম নদীর তীরে জাহাঙ্গীরের শিবির সংস্থাপিত ছিল। মহবৎ অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া একদিন জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিলেন। নূরজাহান মহবতের হাত হইতে জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় বন্দী জাহাঙ্গীরের সঙ্গিনী হইলেন। অবশেষে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী

মহবতের পরাজয়

রমণী একদিন কৌশলে মহবতের হাত হইতে জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করিলেন। মহবৎ দাক্ষিণাত্যে শাহ্‌জাহানের নিকট পলাইয়া গেলেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ও চরিত্র। এই অপমান ভোগ করার পর জাহাঙ্গীর আর বেশী দিন বাঁচিয়াছিলেন না। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হইল।

জাহাঙ্গীরের বহুবিধ স্বাভাবিক সদ্‌গুণ ছিল; কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানে ঐগুলি বহুপরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সময় সময় তিনি ন্যায়পরায়ণ ও ভদ্র আচরণ করিতেন, কিন্তু এক এক সময় আবার হৃদয়হীন বর্বরোচিত নিষ্ঠুর ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি কবিতা ও চিত্র রচনা করিতে ভালবাসিতেন এবং স্বভাবের সৌন্দর্য উপভোগ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের আদর করিতেন এবং একজন রসজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। তিনি নিজের জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

৩। শাহ্‌জাহান

শাহ্‌জাহানের সিংহাসনে আরোহণ। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র শাহ্‌জাহান ও শারীয়র সিংহাসন দাবি করিলেন। নূরজাহান তখন লাহোরে ছিলেন। শারীয়র সেখানে চলিয়া গেলেন এবং সম্রাট্ পদবী গ্রহণ করিলেন। শাহ্‌জাহান দূর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পত্নী মমতাজমহলের পিতা এবং নূরজাহানের ভ্রাতা

আসফ্ খাঁ তাঁহার পক্ষে ছিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদে শাহ্‌জাহান দ্রুতগতিতে আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শাহ্‌জাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ভবিষ্যতে সিংহাসনের দাবি করিতে পারে, সম্রাট্ বংশের এইরূপ পুরুষদিগকে নিহত করিলেন। নূরজাহান তাঁহার নিকট সম্মানপূর্ণ ব্যবহারই পাইলেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাইল।

শাহ্‌জাহানের রাজত্বে বিদ্রোহ। বুন্দেলখণ্ডের রাজা এবং খাঁজাহান লোদী নামক একজন আফগান আমীর শাহ্‌জাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগেই বিদ্রোহী হইলেন। খাঁজাহান আহম্মদনগরের সুলতানের নিকট হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সম্রাট্ এই সকল বিদ্রোহ সহজেই দমন করিলেন।

পর্তুগীজ দমন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ হুগলিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা যে ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়াছিল, তাহাতে মুঘলসাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল। তাহার উপর আবার তাহারা ভারতবাসিগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিত। বিশেষত তাহারা ক্রীতদাসের ব্যবসায় চালাইত এবং অনাথ হিন্দু ও মুসলমান শিশুগণকে অপহরণ করিয়া খৃষ্টানধর্মে দীক্ষা দিত। একবার তাহারা মমতাজমহলের দুইটি বাঁদীকে পর্যন্ত আটক করিল। শাহ্‌জাহান এই ঘৃণ্য বিদেশীয়গণকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং এই উদ্দেশ্যে কাশিম খাঁকে বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণের প্রধান আশ্রয়স্থল হুগলি

পর্তুগীজগণের অত্যাচার

নগর অবরুদ্ধ হইল এবং তিনমাস পরে উহা মুঘল অধিকারে আসিল। কাশিম খাঁ হুগলি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন এবং চারি হাজার পর্তুগীজ বন্দী আগ্রায় প্রেরিত হইল।

পর্তুগীজ দমন ও হুগলি অধিকার

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ। আকবরের দাক্ষিণাত্য-বিজয়নীতি জাহাঙ্গীরের রাজত্বে বড় বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। আকবর যে কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এইবার শাহ্‌জাহান তাহা সম্পূর্ণ কবিতে চেষ্টা করিলেন। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আহম্মদনগর সম্পূর্ণরূপে জয় করিলেন এবং উহার অধিকাংশ মুঘলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন। আহম্মদনগর বিজয় সমাপ্ত করিয়া শাহ্‌জাহান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয়কে মুঘলসম্রাটের অধীনতা স্বীকাব করিতে আহ্বান কবিলেন। গোলকুণ্ডা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া করদ রাজ্যে পরিণত হইল, কিন্তু বিজাপুর মুঘলসম্রাটের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। মুঘলসৈন্য বিজাপুর আক্রমণ করিল, এবং অত্যন্ত নৃশংসতার সহিত বিজাপুর রাজ্য ছারখার করিতে লাগিল। অবশেষে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান কুড়ি লক্ষ টাকা দণ্ড প্রদান করিয়া মুঘল-সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন। তিনি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন, এবং ইহার পরিবর্তে বিজিত আহম্মদনগর রাজ্যের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন কর দিতে হইত না।

আহম্মদনগরের পতন

গোলকুণ্ডার মুঘলের অধীনতা স্বীকার

বিজাপুরের সহিত সন্ধি

শাহ্‌জাহানের সীমান্ত নীতি। কান্দাহার প্রদেশটি লইয়া ভারত ও পারস্যের বিরোধ লাগিয়াই ছিল। আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভে গোলযোগের সুযোগে পারস্যরাজ উহা দখল করেন (১৫৫৮)। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবর উহা জয় করেন,

কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে পারসিকগণ পুনরায় উহা কাড়িয়া লয়। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জাহান আবার উহা উদ্ধার করেন। কিন্তু ইহার এগার বৎসর পরে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ আবার কান্দাহার অধিকার কবিলেন। শাহ্‌জাহান ক্রমান্বয়ে তিনটি অভিযান পাঠাইয়া কান্দাহাব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। ইহার মধ্যে দুইটি অভিযানের নায়ক ছিলেন ঔরঙ্গজেব এবং তৃতীয় অভিযান দারার নায়কত্বে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন বারেই মুঘলসৈন্য সফলতা লাভ করিতে পারিল না। কান্দাহার পারস্যের অধিকারেই বহিয়া গেল।

পারস্যরাজ কর্তৃক কান্দাহার অধিকার

হিন্দুকুশ ও অক্ষু নদীর মধ্যবর্তী বাহ্লীক বা বাল্‌ক্‌ প্রদেশ এবং কাফিরিস্থানের উত্তরদিগস্থ পার্বত্য বাদাক্‌সান প্রদেশ শাহ্‌জাহান ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে অধিকার করেন। কিন্তু মুঘলগণ সেইখানে টিকিতে পারিল না; দুইবৎসব পরেই বহু ক্ষতি সহ্য করিয়া বাল্‌ক্‌ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেব। বিজাপুরের সহিত সন্ধির অব্যবহিত পরেই শাহ্‌জাহান তাঁহাব তৃতীয় পুত্র ঔবঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। আট বৎসর দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি করিয়া তিনি আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রথমে গুজরাট, পরে বাল্‌ক্‌ ও বাদাক্‌সানের সুবাদারিতে নিযুক্ত হইলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের প্রথম দুইবারের চেষ্টা তাঁহার নায়কত্বেই হইয়াছিল। সেখানে বিফলমনোরথ হইয়া ঔরঙ্গজেব পুনরায় ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া যান। এইবার তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব-বিভাগের সুবন্দোবস্তে মনোযোগী হইলেন এবং মুর্শিদ কুলি খাঁ

দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত

মুর্শিদ কুলি খাঁ

নামক পারস্যদেশীয় একজন কর্মচারীর সাহায্যে এই কার্যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করিলেন। মুর্শিদ কুলি দাক্ষিণাত্যে টোডরমল্লের জরিপ ও জমাধার্যের প্রথা প্রবর্তিত করিলেন।

উচ্চাভিলাষী ঔরঙ্গজেব এইবার দাক্ষিণাত্যের শেষ দুইটি স্বাধীন রাজ্য—গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর—অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়া প্রবল উদ্যমের সহিত নগর অবরোধ করিলেন। এই সময়ে মীরজুম্‌লা নামে পারস্য-দেশীয় একজন সৈনিক গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মীরজুম্‌লা ঔরঙ্গজেবের সহিত যোগ দিলে, গোলকুণ্ডার পতন আসন্ন হইয়া আসিল। শাহ্‌জাহান কিন্তু সহসা যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন এবং গোলকুণ্ডার সুলতান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হইয়া এবং রাজ্যের কিয়দংশ মুঘলসম্রাট্‌কে ছাড়িয়া দিয়া এই যাত্রায় নিষ্কৃতি পাইলেন।

ঔরঙ্গজেবের গোলকুণ্ডা আক্রমণ

মীরজুম্‌লা

গোলকুণ্ডার সহিত সন্ধি

ইহার পরে ঔরঙ্গজেব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং বিজাপুরের পতনও আসন্ন হইয়া আসিল। এক্ষেত্রেও বিজাপুরের সুলতান ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হইলে এবং বিদর ইত্যাদি স্থান মুঘলসম্রাট্‌কে ছাড়িয়া দিলে, শাহ্‌জাহান যুদ্ধ থামাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন (১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে)। দারার পরামর্শেই শাহ্‌জাহান ঔরঙ্গজেব কর্তৃক বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয় সম্পূর্ণ হইতে দিলেন না। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের জয়ে দারার মনে বিষম ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছিল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডারাজ্য ঔরঙ্গজেবের হস্তগত হইলে ভবিষ্যতে সিংহাসন লইয়া বিবাদে ঔরঙ্গজেবের বিশেষ সুবিধা হইবে, সম্ভবত এ আশংকাও দারার মনে ছিল। এতদ্ব্যতীত

ঔরঙ্গজেবের বিজাপুর আক্রমণ

বিজাপুরের সহিত সন্ধি

দাক্ষিণাত্যের রাজগণ দারাকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের পুত্রগণ। শাহ্‌জাহানের চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দারা সেকো নামত পঞ্জাবের সুবাদার ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পিতার নিকটেই বাস করিতেন, এবং শাহ্‌জাহান তাঁহাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়াছিলেন। দারা বিদ্বান্ ও গুণবান্ ছিলেন। তাঁহার ধর্মমত অত্যন্ত উদার ছিল; তিনি খৃষ্টান্ পাদ্রীগণের সহিত সর্বদা মিশিতেন এবং পারস্য ভাষায় কয়েকখানি উপনিষদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, কোরাণ হইতেও উপনিষদের ভগবদ্ভক্তি প্রাচীনতর। গোঁড়া মুসলমানগণ তাঁহার এই সকল মতের জন্য তাঁহার উপর বড় বিরূপ ছিল। বিশেষত মুসলমান ধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। সাংসারিক বিষয়ে দারার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা খুবই কম ছিল।

দারা সেকো

তাঁহার উদার ধর্মমত ও বিদ্যাবত্তা

শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র ভোগবিলাসপ্রিয় সুজা বঙ্গ ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব চারি ভ্রাতার মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাস পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বক্স গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সাহসী ও সমর-কুশল, কিন্তু চরিত্রহীন, নির্বোধ ও একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিলেন; সাংসারিক বুদ্ধি তাঁহার মোটেই ছিল না।

সুজা

ঔরঙ্গজেব

মুরাদবক্স

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শাহ্‌জাহান গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সুজা রাজমহলে

শাহ্‌জাহানের পীড়া

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা ছাপিতে লাগিলেন। মুরাদ বক্সও গুজরাটে নিজকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং কিছুদিন ইতস্তত করিয়া ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঔরঙ্গজেবও স্বাধীন রাজার ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া নিবার সর্তে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ গোপনে সন্ধি করিলেন। তারপর তাঁহারা সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া উজ্জয়িনীর অনতিদূরে মিলিত হইলেন (এপ্রিল, ১৬৫৮)।

ইতিমধ্যে শাহ্ জাহান কতকটা আরোগ্য লাভ করিয়া দারা যাহাতে সিংহাসন পাইতে পারেন, তাহার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের গতিরোধ করিবার জন্য মারবারের রাজা যশোবন্ত সিংহ এবং কাশিম খাঁকে পাঠাইলেন। কিন্তু উজ্জয়িনীর চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ধর্মৎ নামক স্থানে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদকর্তৃক সম্রাট্-প্রেরিত সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ দ্রুতবেগে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আগ্রার আট মাইল পূর্বে শামুগড় নামক স্থানে দারা সসৈন্যে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। বহুক্ষণব্যাপী অবিরাম যুদ্ধের পর দারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন (২৯শে মে, ১৬৫৮ খৃঃ), এবং ১০ দিন পরে আগ্রার দুর্গ বিজেতাগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

সম্রাট সৈন্য ঔরঙ্গজেব কর্তৃক ধর্মতের যুদ্ধে পরাজিত

শামুগড়ের যুদ্ধে দারার পরাজয়

ঔরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করিয়া পিতাকে আগ্রা দুর্গে সারা জীবনের জন্য বন্দী করিয়া রাখিলেন। নির্বোধ মুরাদ অচিরেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে আটক করিয়া রাখিলেন, এবং

শাহ্ জাহান বন্দী

মুরাদ নিহত

তিন বৎসর পরে একটা মিথ্যা অভিযোগের ছল করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। দারা তখনকার মত প্রাণ লইয়া পলাইলেন; ঔরঙ্গজেব মুলতান পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সুজার গতিরোধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, তখন শাহ্‌জাহান দারার পুত্র সুলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুলেমান সুজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন (মে, ১৬৫৮)। কিন্তু ফিরিয়া তাঁহার পিতার সহিত যোগ দিবার পূর্বেই দারা ঔরঙ্গজেবের হস্তে শামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন।

খাজোয়ার যুদ্ধ

যখন ঔরঙ্গজেব দারার পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত, তখন সুজা পুনরায় আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে রোটাস্, চুণার, বারাণসী, জৌনপুর ও এলাহাবাদ দখল করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ঔরঙ্গজেব তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্য মুলতান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ফতেপুর জেলার অন্তর্গত খাজোয়া নামক স্থানে সুজাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (জানুয়ারী, ১৬৫৯)। সুজা বাঙলার দিকে পলাইয়া গেলেন। ঔরঙ্গজেব মীরজুম্‌লাকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে পাঠাইলেন। সুজা বিতাড়িত হইয়া অবশেষে আরাকানে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহার শেষ জীবনের কাহিনী সঠিকরূপে জানা যায় না, কিন্তু সম্ভবত আরাকানেই তিনি সপরিবারে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সুজার পশ্চাদ্ধাবনের কালে ঔরঙ্গজেবের পুত্র মুহম্মদ সুজার পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই পিতার নিকট ফিরিয়া

সুজার পরাজয় এবং আরাকানে মৃত্যু

আসিলেন এবং যাবজ্জীবন বন্দী অবস্থায় কাটাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

দারার দুরদৃষ্ট। দারা দিল্লী হইতে লাহোরে যাইয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করেন। তিনি যেখানেই যান ঔরঙ্গজেবের অনুচরগণ সেইখানে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে বোলান গিরিসংকটের নিকটবর্তী দাদর নামক স্থানের নায়ক জিহন খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ঔরঙ্গজেবের হাতে ধরাইয়া দিল। দারাকে বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইল; ভিক্ষুকের মলিন বস্ত্র পরাইয়া এক কদাকার হস্তীর পৃষ্ঠে চড়াইয়া তাঁহাকে সমস্ত দিল্লী নগরে ঘুরাইয়া আনা হইল। বিচারের একটি অভিনয়ও অনুষ্ঠিত হইল,—বিচারক ধর্মদ্রোহের অপরাধে দারার প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন (১৬৫৯)। দারার পুত্র সুলেমান গাঢ়ওয়ালের পার্বত্য প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে ঔরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী ও নিহত হন। এইরূপে ঔরঙ্গজেব ক্ষমতাশালী প্রতিপক্ষগণকে একে একে দূর করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু দারা ও মুরাদের শিশু পুত্রগণকে তিনি রক্ষা করিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নিজের কন্যাদের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিলেন।

দারা বন্দী

দারার প্রাণদণ্ড

দারার পুত্র সুলেমান নিহত

শাহ্‌জাহানের চরিত্র। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি শাহ্‌জাহানের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আগ্রার দুর্গে কঠোর পাহারায় নজরবন্দী ছিলেন। শাহ্‌জাহানের শেষ জীবনের দুর্ভাগ্যের জন্য সকলেরই মনে গভীর সহানুভূতির উদয় হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একথাও মনে রাখা কর্তব্য যে শাহ্‌জাহান

নিজেও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই রাজবংশের সমস্ত পুরুষের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের ত্রিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে (১৬২৮-১৬৫৮) ভারতবর্ষে মোটের উপর সুখ শান্তি বিরাজ করিত। শাহ্‌জাহান ন্যায় ও সততার সহিত রাজ্য শাসন করিতেন এবং দয়ালু প্রজা-বৎসল রাজা ছিলেন। রাজকর্মচারীরা প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিলে তিনি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতেন। কিন্তু শাসন-দণ্ড পরিচালনে তিনি খুব যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক ছিলেন। বৈদেশিক ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার ও পিটার মাণ্ডি লিখিয়া গিয়াছেন যে, শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে বিদ্রোহীর ভয়ে এবং চোর ডাকাতের অত্যাচারে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। শাহ্‌জাহান পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন, এবং বিধর্মীদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও শাহ্‌জাহানের চরিত্রে গুণের অভাব ছিল না, এবং এই দোষের তুলনায়ই গুণরাশি আরও উজ্জ্বল দেখায়। প্রথমত তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত স্নেহময় ছিল। পত্নী মমতাজের প্রতি তাঁহার প্রেম জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের উনিশ বৎসরকাল পতিপত্নী পরস্পরের প্রেমে বিভোর ছিলেন। শেষ জীবনে শাহ্‌জাহানের চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছিল। অনুমান হয় তাঁহার অসাধারণ পত্নীপ্রেমই প্রথম জীবনে তাঁহাকে এইরূপ দুশ্চরিত্রতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। পুত্রগণের, বিশেষত জ্যেষ্ঠ পুত্রের

স্নেহশীল

প্রতি তাঁহার অন্ধ বাৎসল্যই তাঁহার শোচনীয় পরিণামের আংশিক কারণ।

রাজোচিত ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর প্রদর্শন, এবং সূক্ষ্ম শিল্পানুরাগ শাহ্‌জাহানের চরিত্রের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। আজ তাঁহার রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনসমূহ দেখিয়াই আমরা শাহ্‌জাহানকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য শাহ্‌জাহান যে অপূর্ব সমাধি-মন্দির তাজমহল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ পত্নীপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ আজিও আগ্রায় যমুনার কূলে বিশ্বের বিস্ময়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুসলমান সম্রাট্‌গণ ভারতে হিন্দু-পারস্য স্থাপত্য-রীতির প্রচলন করিয়াছিলেন, এবং আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ঐ প্রথায় বহু মনোহর অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বে নির্মিত নূরজাহানের পিতা ইতিমাদ্‌-উদ্দৌল্লার সমাধি-মন্দির শিল্প হিসাবে চমৎকার। কিন্তু তাজমহলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা হয়। পৃথিবীর অল্প কয়েকটি আশ্চর্য পদার্থের মধ্যে তাজমহলও একটি। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তাজমহলের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। আগ্রায় শাহ্‌জাহানের আর একটি উল্লেখযোগ্য ইমারৎ মতি মস্‌জিদ। ইহাও ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। সের সাহের নির্মিত দিল্লীর অতি নিকটেই শাহ্‌জাহান এক নূতন নগরীর পত্তন করেন এবং উহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিয়া উহার নাম রাখেন—শাহ্‌জাহানাবাদ। এই নূতন নগরী বহু মনোহর অট্টালিকায় সুশোভিত হইল। বিখ্যাত দিওয়ান্‌-ই-খাস্‌ এবং জুমা-মস্‌জিদ

তাজমহল

হিন্দু-পারস্য স্থাপত্য-রীতি

মতি মস্‌জিদ

শাহ্‌জাহানের নির্মিত নূতন দিল্লী

দিওয়ান্‌-ই-খাস্‌ ও জুমা-মস্‌জিদ

ময়ূরসিংহাসন

এই নূতন দিল্লীতেই অবস্থিত। শাহ্‌জাহানের ময়ূরসিংহাসনও এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই বিখ্যাত সিংহাসনে এত মণি, মুক্তা, হীরকাদি খচিত হইয়াছিল যে তাহা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পৃথিবীর কোনও রাজারই এরূপ মূল্যবান্ সিংহাসন ছিল না। এই সিংহাসনটি অনেকটা সোণার পায়া-ওয়ালা তক্তপোষের আকারে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার মীনা (এনামেল) করা ছাদ দ্বাদশটি মরকত স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল। প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় মণিমাণিক্যখচিত একজোড়া ময়ূর মুখোমুখি করিয়া বসানো ছিল। এক এক জোড়া ময়ূরের মধ্যস্থানে এক একটি মণিমাণিক্য নির্মিত গাছ ছিল; ময়ূর দুইটি যেন ঠোক্‌রাইয়া গাছের ফল খাইতেছে এরূপ দেখা যাইত। অগণিত অর্থব্যয়ে এই সিংহাসনের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে চিত্রবিদ্যাও উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের সমস্ত শিল্প-নিদর্শনই অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত। মুঘলগণের শিল্প যে এই সময়েই চরম উন্নতি লাভ করে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

শিল্পের চরম উন্নতি

৪। ঔরঙ্গজেব

রাজ্যাভিষেক। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই দিল্লী নগরীর বহিঃস্থিত শালিমার উদ্যানে ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ কোন জাঁকজমক হয় নাই। আলমগীর (জগদ্বিজয়ী) এই নাম ধারণ করিয়া ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে উপবেশন করেন। খাজোয়া ও আজমীরের যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদ্বয়কে পরাজিত করিবার পর দিল্লীর দিওয়ান্-ই-আমে খুব জাঁকজমক করিয়া ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয়বার রাজ্যাভিষেক হয় (৫ই জুন, ১৬৫৯)।

শাহ্‌জাহানের মৃত্যুর পর মহাসমারোহের সহিত তৃতীয়বার আগ্রায় ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (মার্চ, ১৬৬৬)।

রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনা। ঔরঙ্গজেবের ৫০ বৎসর-ব্যাপী রাজত্ব (১৬৫৮—১৭০৭) মোটামুটি প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ২৪ বৎসর তিনি হিন্দুস্থানে যাপন করেন, দ্বিতীয় ২৬ বৎসর তিনি দাক্ষিণাত্যেই কাটান।

রাজত্বের প্রথম বৎসর ভ্রাতৃবিরোধ এবং তার পরের দুই তিন বৎসর ছোটখাট বিদ্রোহ দমন করিতেই কাটে। তারপরে কুড়ি বৎসরে, কাবুল হইতে আসাম ও তিব্বত হইতে বিজাপুর—নানাস্থানে সমরাভিযান প্রেরিত হয়। ইহাদের মধ্যে রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজীর সহিত যুদ্ধই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ নীতিই এই উভয় যুদ্ধকে ঘোরতর করিয়া তোলে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বিতীয় ভাগ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য এবং মহারাষ্ট্রজাতির সহিত যুদ্ধে ব্যয়িত হয়।

বঙ্গদেশ। ঔরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজুম্‌লা বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। মীরজুম্‌লা আসাম আক্রমণ করেন, এবং ইহার রাজাকে পরাজিত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। আসামবাসিগণের আক্রমণে, গুরুতর বর্ষায় এবং মড়ক লাগিয়া মীরজুম্‌লার প্রায় সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল এবং প্রত্যাবর্তন পথে মীরজুম্‌লা নিজেও আমাশয় রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন (১৬৬৩ খৃঃ)। মীরজুম্‌লার পরে নবাব শায়েস্তা খাঁ বাঙলার সুবাদার হইলেন। শায়েস্তা খাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কালের শাসন বাঙলার এক স্মরণীয় যুগ। তিনি চাটগাঁও অধিকার করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গ মগদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন।

মীরজুম্‌লা

শায়েস্তা খাঁ

প্রবাদ এই যে তাঁহার সময় টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাটের পৌত্র আজিম উশ্‌শান যখন বাঙলার সুবাদার ছিলেন, তখন মুর্শিদ কুলি খাঁ নামে একজন যোগ্য ব্যক্তি দেওয়ান নিযুক্ত হন। কিন্তু দুইজনের মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না এবং অবশেষে একদিন ঢাকা নগরীর প্রকাশ্য রাজপথে দুইজনের অনুচরবর্গের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হয়। মুর্শিদ কুলি খাঁ দেওয়ানী বিভাগ ঢাকা হইতে মুকশুদাবাদে লইয়া যান। ফলে বাঙলার রাজধানীও ঢাকা হইতে মুকশুদাবাদে উঠিয়া যায়। মুর্শিদ কুলির নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

অন্যান্য অভিযান। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে পালামৌ অধিকৃত হয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বত মুঘলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে। ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগে অনেক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, ঔরঙ্গজেব কঠোর হস্তে তাহা দমন করেন। ইহার মধ্যে বিকানীরের রাও করণ ও বুন্দেলখণ্ডের চম্পৎ রায়ের বিদ্রোহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান জাতির বিদ্রোহ দমন করিতে ঔরঙ্গজেবকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

শিবাজীর অভ্যুদয়। দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে শিবাজীর অভ্যুদয় এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। আহম্মদনগর ও বিজাপুর রাজ্যের আমলে নবোদিত মহারাষ্ট্রশক্তি ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। শিবাজীর প্রতিভাবলে এইবার তাহা একতাবদ্ধ ও বিশেষ শক্তিমান হইয়া দাঁড়াইল। শিবাজীর পিতা শাহজী আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে কর্মচারী ছিলেন।

আহম্মদনগরের পতনের পর তিনি বিজাপুরের সুলতানের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পুনা জেলায় শাহজীর বিস্তৃত জাগীর ছিল, এবং সেই জাগীরের অধীন জুন্নারের নিকটবর্ত্তী শিবনের গিরিদুর্গে শিবাজীর জন্ম হয় (১৬৩০ খৃঃ*)। শাহজী তাঁহার অপর এক স্ত্রীর সঙ্গে বাস করায়, শিবাজীর বাল্যজীবন পুনায় তাঁহার মাতার সাহচর্যে দাদাজী কোণ্ডদেবের অভিভাবকত্বেই কাটিয়াছিল। তিনি ঐ স্থানের শক্তিশালী কৃষক মাওলিগণের সহিত অবাধে মিশিতেন এবং বাল্যকাল হইতেই নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রচালনায় ও সমরকৌশলে নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের কল্পনা কিশোর বয়সেই শিবাজীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুতে যখন তাঁহাকে বাধা দিবার আর কেহ রহিল না, তখন পরমাগ্রহে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলেন। কতকগুলি কর্ম্মদক্ষ এবং বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে করিয়া তোরণ, পুরন্দর ইত্যাদি কয়েকটি গিরিদুর্গ তিনি অধিকার করিয়া ফেলিলেন (১৬৪৭ খৃঃ)। তাঁহার পিতার জাগীরের পশ্চিম ভাগ তিনি পূর্ব্বেই স্বীয় অধিকারে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সমুদয় একত্র করিয়া তিনি একটি ছোটখাট রাজ্যের পত্তন করিলেন।

বাল্যজীবন

কৈশোরের শিক্ষা

গিরিদুর্গ অধিকার

বিজাপুর রাজ্যের সহিত শিবাজীর দ্বন্দ্ব। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শিবাজী পশ্চিমঘাট গিরিমালা ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী কোংকন প্রদেশ আক্রমণ করিয়া কিয়দংশ অধিকার করিলেন। বিজাপুরের সুলতান আর শিবাজীকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, শিবাজীর অপরাধে তাঁহার পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন।

* মতান্তরে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ।

কিন্তু কিছুদিন পরে শাহজী মুক্ত হইলেন। অগত্যা শিবাজী কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জাওলি রাজ্য হস্তগত করিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বিজাপুরের সুলতান আফজল খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে বহু সৈন্যসহ পাঠাইলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, শিবাজী ও আফজল খাঁ একস্থানে মিলিয়া সন্ধির সর্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। তদনুসারে শিবাজী ও আফজল খাঁ প্রত্যেকে দুইজন অনুচর সঙ্গে লইয়া প্রতাপ-গড়ের সন্নিহিত একস্থলে সাক্ষাৎ করিলেন। শিবাজী আফজল খাঁর সন্নিহিত হইলে, আলিঙ্গনচ্ছলে আফজল খাঁ বামহস্ত দ্বারা শিবাজীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন, এবং ক্রমশ অধিকতর জোরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণহস্তে ছুরিকাদ্বারা শিবাজীর পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা আছে অনুমান করিয়া, শিবাজী তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মাথায় পাগড়ীর নীচে লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ এবং গায়ে পোষাকের নীচে লৌহবর্ম পরিহিত ছিল। বামহাতের অঙ্গুলীতে লৌহনির্মিত 'বাঘনখ' নামক কৃত্রিম নখ ছিল। আফজল ছুরি দিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলে সেই আঘাত তাঁহার পোষাকের নীচে লুক্কায়িত বর্মে বাধিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। ক্ষিপ্রতায় শিবাজীও কম নহেন; অমনি বিদ্যুদ্গতিতে তিনি বাঘনখ দিয়া আফজলের উদর ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং আস্তিনের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত বিছুয়া নামক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া আফজলের পার্শ্বদেশে বসাইয়া দিলেন। শিবাজীর অনুচর আসিয়া

আফজলের মাথা কাটিয়া ফেলিল। আফজল হত হইলে আফজলের সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।* এইরূপে বিজাপুরের দিক হইতে ভয়মুক্ত হইয়া শিবাজী স্বাধীন নরপতির ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। আফজল খাঁর হত্যা

ঔরঙ্গজেবের সহিত শিবাজীর সংঘর্ষ। ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন তখনই শিবাজী মুঘল-অধিকৃত প্রদেশে লুঠতরাজ করায় উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল (১৬৫৭)। শিবাজীর শক্তি ও সাহস দেখিয়া ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি এই বিষয়ে বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই। ভ্রাতৃ-বিরোধের অবসান হইলে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীকে দমন করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজী একদা রাত্রিকালে সহসা শায়েস্তা খাঁর পুনা নগরীস্থিত আবাস আক্রমণ করিয়া, তাঁহার এক পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। শায়েস্তা খাঁ নিজে দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি হারাইয়া বহুকষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৬৬৩)। অতঃপর ঔরঙ্গজেব কুমার মুয়াজ্জমকে শিবাজীর দমনের জন্য দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। শিবাজী কিন্তু এই সংবাদ পাইয়াই সুরাট ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করিলেন এবং রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৬৬৪ খৃঃ)। অবশেষে হতাশ হইয়া

শায়েস্তা খাঁর পরাজয়

শিবাজীর স্বাধীনতা ঘোষণা

* আফজল যে শিবাজীকে প্রথম আঘাত করিয়াছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাহা স্বীকার করেন না; বস্তুত কোন্ পক্ষের কথা সত্য তাহা নির্ণয় করা কঠিন; বিখ্যাত ঐতিহাসিক সার্ যদুনাথ সরকারের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া উপরের লিখিত বিবরণ সংকলিত হইল।

ঔরঙ্গজেব অম্বরাধিপতি জয়সিংহ এবং বিখ্যাত সেনাপতি দিলির খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহ মুঘলসম্রাটের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিজাপুর এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির সহিত মিলিত হইয়া শিবাজীর পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া শিবাজীকে সন্ধি করিতে হইল। পুরন্দরের সন্ধির সর্তে শিবাজী মাত্র এগারটি দুর্গ নিজের হাতে রাখিয়া, বাকি সমস্ত দুর্গ মুঘলসম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং মুঘলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন (১৬৬৫)।

পুরন্দরের সন্ধি

বিজয়ী জয়সিংহ এইবার বিজাপুর আক্রমণ করিলেন এবং এই অভিযানে তিনি শিবাজীর সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন। শিবাজীর নিকট হইতে বিশিষ্ট সহায়তা লাভে আনন্দিত হইয়া পুরস্কার-স্বরূপ ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে খেলাৎ পাঠাইলেন এবং দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। দরবারে শিবাজীর কোনও বিপদ হইবে না, জয়সিংহ স্বয়ং এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, শিবাজী সম্রাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

ঔরঙ্গজেবের দরবারে শিবাজীর আমন্ত্রণ

দরবারে উপস্থিত হইলে শিবাজী ঔরঙ্গজেবের ব্যবহারে নিজকে অপমানিত বোধ করিলেন। অপমানে অধীর হইয়া রাজদরবারের সমস্ত নিয়ম উপেক্ষা করিয়া, শিবাজী উচ্চকণ্ঠে ঔরঙ্গজেবের এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মনোবেদনায় মারাঠা-বীর সভাস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে সভা হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। পরদিন শিবাজী সবিস্ময়ে দেখিলেন,

শিবাজীর অপমান

তাঁহার বাসভবনের চতুর্দিকে মুঘলসৈন্য পাহারা দিতেছে,—অর্থাৎ তিনি মুঘলসম্রাটের বন্দী হইয়াছেন (১৬৬৬)। **শিবাজীর বন্দিত্ব**

শিবাজী স্বীয় অনুচরগণসহ দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি চাহিলে সম্রাট্ অনুচরগণকে যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু শিবাজীকে কড়া পাহারায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। শিবাজী ঔরঙ্গজেবকে জয়সিংহের প্রতিশ্রুতি এবং বিজাপুর যুদ্ধে নিজের সাহায্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। বাধ্য হইয়া শিবাজী ধূর্ততার আশ্রয় লইলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়িতে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও ওমরাহ্‌গণকে নানাবিধ মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। দ্বাররক্ষকগণ প্রথম প্রথম ঝুড়িগুলি খুলিয়া পরীক্ষা করিত বটে, কিন্তু প্রত্যেক দিনই একই জিনিষ দেখিয়া দেখিয়া, যখন তাহারা পরীক্ষা করা ছাড়িয়া দিল, তখন একদিন এইরূপ দুইটি ঝুড়িতে উঠিয়া শিবাজী ও তাঁহার পুত্র পলায়ন করিলেন। সোজা দাক্ষিণাত্য অভিমুখে না গিয়া, তিনি প্রথমে পূর্বদিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী ইত্যাদি স্থান ঘুরিয়া উড়িষ্যা দিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া গেলেন (ডিসেম্বর, ১৬৬৬ খৃঃ)। **শিবাজীর পলায়ন**

এইবার শিবাজী প্রবলভাবে মুঘলসম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহের মৃত্যু হইলে, রাজকুমার মুয়াজ্জম্ তাঁহার স্থানে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু শিবাজীর বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব শিবাজীর রাজা উপাধি স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করিলেন এবং খান্দেশ প্রদেশ হইতে চৌথ অর্থাৎ রাজার প্রাপ্য করের চতুর্থ ভাগ জোর করিয়া আদায় করিলেন। শিবাজী যে সকল দুর্গ মুঘলদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহার কতক পুনরায় অধিকার করিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘলসৈন্যকে গুরুতররূপে পরাজিত করিলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী রাজধানী রায়গড়ে মহা-সমারোহে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ তাঁহার সহিত মুঘলের বিরুদ্ধে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে শিবাজী দক্ষিণ প্রদেশ লুণ্ঠনে অগ্রসর হইলেন, এবং জিঞ্জি, ভেলোর, বেলারি ইত্যাদি বহুস্থান অধিকার করিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই বিজয়ী মারাঠা-বীরের বিচিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি হয়।

খান্দেশ হইতে চৌথ আদায়

শিবাজীর মৃত্যু

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব। ভারতবর্ষে যে কয়জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শিবাজী যে তাঁহাদের অন্যতম সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রথম জীবনে মাওলিগণের সর্দার শিবাজী শুধু স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমে এক বিস্তৃত স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, বিষম পরধর্মদ্বেষী ঔরঙ্গজেব যখন সম্রাট্‌রূপে মুঘলসিংহাসনে সমাসীন, এবং মুঘলসাম্রাজ্য যখন ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে সমারূঢ়, সেই সময়ে মুঘলসম্রাটের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া শিবাজী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিবাজীর সর্বপ্রধান কীর্তি, মারাঠা জাতিকে নবজীবন প্রদান। এই মারাঠা জাতি তাঁহার তিরোধানের পরও প্রায় একশ পঁচিশ বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত

কৃতিত্ব

ছিল। শিবাজী সর্বতোভাবে একজন অতিমানুষ ছিলেন; তাঁহার সাহস, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা, এবং সর্বোপরি তাঁহার অপূর্ব সমর-কৌশল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। তৎকালের যোদ্ধাগণের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার বিশিষ্টতা লক্ষিত হইত। স্বীয় ধর্মে তিনি প্রগাঢ় আস্থাবান্ ছিলেন সত্য, কিন্তু পরধর্মের উপর তিনি কখনও উৎপীড়ন করেন নাই। ঔরঙ্গজেবের পরধর্মদ্বেষ সর্বজনবিদিত। শিবাজী কিন্তু কখনও কোন মস্‌জিদ অপবিত্র করেন নাই। কোরানের পুথি তাঁহার হস্তে পতিত হইলেই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিয়া, পরে কোনও মুসলমান অনুচরকে ডাকিয়া উহা তাহার হস্তে সমর্পণ করিতেন। তিনি সর্বদা স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষার্থ সচেষ্ট ছিলেন, এবং কেহ স্ত্রীলোকের অমর্যাদা করিয়াছে জানিতে পারিলে, কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতেন না। স্বদেশ ও স্বধর্মকে পরাধীনতার পাশ হইতে মুক্ত করিবার কল্পনা প্রথমে তাঁহারই মহদন্তঃকরণে উদিত হইয়াছিল, এবং তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টায় সেই উদ্দেশ্য সফল করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে গুরুতর দুষ্কর্ম করিয়াছেন সত্য,—কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কালধর্মে আত্মরক্ষার্থ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার গুণমুগ্ধ কৃতজ্ঞ দেশবাসীরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। এখনও শিবাজীর নামে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত হিন্দুর ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবলতর বেগে বহিতে থাকে। **বিশিষ্টতা**

মারাঠা রাজ্যশাসন-প্রণালী। শিবাজী নিজে নিরক্ষর হইলেও রাজ্যশাসনের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রাজা সমস্তের উপর ছিলেন বটে, কিন্তু আটজন মন্ত্রী তাঁহাকে রাজকার্যে

সহায়তা করিতেন, এবং পরামর্শ দিতেন। পুরাতন হিন্দু-প্রথানুযায়ী রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল, এবং মন্ত্রিগণ এই সমুদয় বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন মন্ত্রী সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদেও নিযুক্ত হইতেন। প্রত্যেক জেলার ভার একজন প্রধান কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং এইরূপ আটজন নিম্নতর কর্মচারী তাঁহাকে কার্য-পরিচালনে সহায়তা করিতেন।

সামরিক বিভাগ। পদমর্যাদা অনুসারে সামরিক কর্মচারিগণ নির্দিষ্ট শ্রেণীসমূহে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের অধীনে দশ জন পদাতিক অথবা পচিশ জন অশ্বারোহী হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ হাজার পর্যন্ত সৈন্য থাকিত। সমগ্র অশ্বারোহীসৈন্যের উপর একজন এবং সমগ্র পদাতিকের উপর আর একজন সর্নৌবৎ বা সেনাপতি নিযুক্ত হইতেন। অশ্বারোহীদলের কতককে বলিত বর্গীর, ইহারা রাজার নিকট হইতে অশ্ব ও নিয়মিত বেতন পাইত। বাকি অশ্বারোহিগণকে শীলাদার বলা হইত। যে কোনও মারাঠা অশ্ব ও অস্ত্রাদি লইয়া কিছুদিনের জন্য সেনাদলে ভর্তি হইতে পারিত। ইহারা শীলাদার আখ্যা প্রাপ্ত হইত। শিবাজী সৈন্যদিগকে নগদ বেতন দিতেন এবং সেনাদলের মধ্যে কঠোর শৃংখলা রক্ষা করিতেন। ত্বরিতগতিই মারাঠা সেনাদলের প্রধান বল ছিল। তাহাদের সঙ্গে কখনও ভারি দ্রব্যাদি থাকিত না, এবং এড়াইতে পারিলে তাহারা কখনও বড় রকমের সম্মুখযুদ্ধে রত হইত না;—শত্রুর আশে পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অপ্রত্যাশিত স্থানে ও সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। শিবাজীর শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল

গিরিদুর্গগুলি। এই দুর্গগুলি রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহার সামরিক বলের আর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল—যুদ্ধজাহাজ।

রাজস্ব বিভাগ। শিবাজী রাজস্ব বিভাগেরও সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সমস্ত রাজ্য কতকগুলি প্রান্ত' নামক বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল; প্রত্যেক প্রান্ত কয়েকটি পরগণাতে, প্রতি পরগণা কয়েকটি তরফে এবং প্রতি তরফ কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। সমস্ত জমি সযত্নে জরিপ করিয়া উৎপন্ন শস্যের পাঁচভাগের দুইভাগ অথবা উহার মূল্য রাজকর বলিয়া ধার্য হইত। জমি কখনও ইজারা দেওয়া হইত না এবং কৃষকগণের নিকট হইতে যাহাতে খাজানার উপর অতিরিক্ত আর কিছু আদায় না করা হয়, রাজার সেই দিকে লক্ষ্য ছিল।

চৌথ ও সরদেশমুখী। স্বীয় প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব ভিন্ন শিবাজী তাঁহার রাজ্যের বহিঃস্থিত দেশসমূহ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী নামে দুই প্রকার কর আদায় করিতেন। নির্দিষ্ট রাজস্বের চতুর্থাংশ দিতে স্বীকৃত হইলে, শিবাজী অন্য রাজ্যের প্রজাগণকে মারাঠা সৈন্যের লুণ্ঠন হইতে রেহাই দিতেন, ইহার নাম চৌথ। শিবাজীর পূর্বেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল।* শিবাজী স্বীয় সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য এই প্রথা অবলম্বন করেন। এতদ্ব্যতীত শিবাজী দাবী করিতেন, যে, তিনি উত্তরাধিকারক্রমে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশের সরদেশমুখ অর্থাৎ প্রধান কর্মচারী, সুতরাং এই কর্মচারীর ন্যায্য

চৌথ

সরদেশমুখী

* শিবাজীর পূর্বে যে চৌথ প্রথা প্রচলিত ছিল, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন তাহা বিশদভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

প্রাপ্য রাজস্বের দশমাংশও তিনি আদায় করিতেন। তাঁহার এই দাবি আইন-সঙ্গত কিনা তাহার বিচার অনাবশ্যক, কারণ কেবলমাত্র তাঁহার অত্যাচারের হাত হইতে এড়াইবার জন্যই লোকে এই দুইপ্রকার কর দিতে স্বীকৃত হইত। এইরূপে শিবাজীর মৃত্যুর সময় যদিও শিবাজীর রাজ্য থানা জেলার অন্তর্গত কল্যান হইতে দক্ষিণে মাত্র গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের চৌথ ও সরদেশমুখী হইতে মারাঠা রাজ্যের বিস্তর আয় হইত।

ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতি ও মুঘলরাজ্যের ধ্বংসের প্রারম্ভ। মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ই মুঘলরাজ্যের একমাত্র বিপদ ছিল না। শীঘ্রই দেশময় বিদ্রোহ এবং অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই সমুদায়ের প্রধান কারণ ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অনুসৃত নীতি। তিনি অপর ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত অনুদার ছিলেন। আকবরের উদার নীতি অনুসরণ করা তো দূরের কথা, তিনি হুকুম জারি করিলেন, হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া দাও এবং হিন্দুধর্মের প্রচার, পূজা প্রভৃতি বন্ধ কর। কাশীর বিখ্যাত বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার বিখ্যাত কেশবদেবের চমৎকার মন্দির (ইহা নির্মাণ করিতে ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল), এবং অন্যান্য মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে মসজিদ নির্মিত হইল। অবশেষে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দুর উপর জিজিয়া কর পুনরায় স্থাপিত হইল।

ঔরঙ্গজেবের অনুদার নীতি

তাঁহার গোঁড়ামি

হিন্দু মন্দির ধ্বংস

জিজিয়া কর পুনঃ স্থাপন

কিন্তু ধর্মে গোঁড়ামিই ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের একমাত্র দোষ নহে। তাঁহার চিত্ত স্বভাবতই সন্দিগ্ধ ছিল; এই পৃথিবীতে তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না—নিজের পুত্রগণকেও না।

ঔরঙ্গজেবের সন্দেহশীল স্বভাব

মীরজুম্‌লা, জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ ইত্যাদি বিখ্যাত সেনাপতি-গণের মৃত্যুসংবাদে সম্রাট্‌ যেন মুক্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিতেন। এমন কি কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি বিষপ্রয়োগে যশোবন্তের হত্যা সাধন করাইয়াছিলেন। নিষ্ঠুরতা ও ধূর্ততা তাঁহার চরিত্রের দুইটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে শিবাজী এবং নিজের ভ্রাতাগণের সহিত তাঁহার ব্যবহারের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং তাঁহার রাজত্বকালের ঘটনা হইতে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আকবর চেষ্টা করিয়াছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাইতে, হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির উদার ভিত্তির উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে; ঔরঙ্গজেব সেইস্থানে ধরিয়া নিলেন যে, হিন্দুস্থান মুসলমান রাজ্য এবং এই রাজ্যে নানারূপ হীনতা স্বীকার করা ব্যতীত হিন্দুর বাস করা অসম্ভব।

তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও ধূর্ততা

ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতির কুফল। শীঘ্রই ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতির বিষময় ফল ফলিতে লাগিল। অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বহ্নি দেশময় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। জাঠজাতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইল এবং ঔরঙ্গজেবের জীবনকালে সেই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ প্রশমিত হইল না। বুন্দেলা-রাজ ছত্রশাল বিদ্রোহী হইয়া দুইবার মুঘলসৈন্য পরাজিত করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সৎনামী নামক এক হিন্দু সম্প্রদায়ও বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু মুঘলসাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ রাজপুত জাতির অসন্তোষই মুঘলসাম্রাজ্যের পরম বিপত্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। যে সময়ে মারাঠাশক্তি দমনের জন্য রাজপুতের সহায়তা মুঘলসম্রাটের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল,

সেই সময়েই ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের ফলে রাজপুত মুঘলের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

মারবার ও মেবারের সহিত যুদ্ধ। মারবাররাজ যশোবন্ত সিংহ যখন খাইবার গিরিসংকটের নিকটবর্তী জমরুদ নামক স্থানে মারা গেলেন (অথবা, কাহারও মতে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক বিষপ্রয়োগে হত হইলেন), তখন ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। এই উপলক্ষে রাজপুত প্রজাগণের উপর জিজিয়া কর ধার্য হইল ও হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করা হইল। তারপর ঔরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভক্ত অনুচর রাজপুতবীর দুর্গাদাসের বীরত্বে ও কৌশলে অজিত সিংহ কোনমতে রক্ষা পাইলেন। অতঃপর ঔরঙ্গজেব মারবাররাজ্য মুঘলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু রাজপুত প্রজাগণ অজিত সিংহের পক্ষ হইয়া লড়িতে লাগিল। মেবারের রাণা রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের জন্য তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন—আর মারবারের পতন হইলে যে ঔরঙ্গজেব শীঘ্রই মেবারও অধিকার করিবেন. ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না; সুতরাং রাজসিংহও অজিত সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং মেবার ও মারবারের সহিত ঔরঙ্গজেবের বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল (১৬৭৯)। এই রাজপুত যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। দুই পক্ষেরই বহু ক্ষতি হইল। অবশেষে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে জিজিয়া কর রহিত করিয়া এবং তৎপরিবর্তে সামান্য কিছু যায়গা গ্রহণ করিয়া, সম্রাট্ মেবারের সহিত সন্ধি করিলেন। মারবারের সহিত যুদ্ধ সম্রাটের রাজত্ব ভরিয়াই

যশোবন্তের পুত্রগণকে হস্তগত করিতে ঔরঙ্গজেবের চেষ্টা

রাণা রাজসিংহ

মেবারের সহিত সন্ধি

চলিয়াছিল। অবশেষে সম্রাটের মৃত্যুর পর ১৭১০ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তের পুত্র অজিত সিংহের অধিকার স্বীকৃত হইলে, মুঘলসম্রাটের সহিত মারবারের সন্ধি হয়।

শাহ্‌জাদা আকবরের বিদ্রোহ। রাজপুত যুদ্ধের এক অবান্তর ফল, শাহ্‌জাদা আকবরের বিদ্রোহ। ঔরঙ্গজেব আকবরকে রাজপুত দমন করিতে প্রেরণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে সুবিধা করিতে না পারিয়া, আকবর রাজপুতগণের সহিত যোগ দেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ধূর্ত ঔরঙ্গজেব আকবরকে ফিরাইতে না পারিয়া, কৌশলপূর্বক আকবরকে এমন একখানা পত্র লিখিলেন যাহা পড়িয়া স্বতই মনে হয় যেন আকবর শীঘ্রই রাজপুতদিগকে ঔরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই রাজপুতদের সহিত যোগ দিয়াছেন। ঔরঙ্গজেব কৌশলপূর্বক এই পত্র যখন রাজপুতদের হস্তে পৌঁছাইলেন, তখন স্থূলবুদ্ধি রাজপুতগণ আকবরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আকবর অসহায় হইয়া মারাঠারাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং পরে পারস্যে পলাইয়া গেলেন। সেখানে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ঔরঙ্গজেবের কৌশল

আকবরের মৃত্যু

দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেব। আকবর মারাঠারাজ্যে যাইয়া আশ্রয় লওয়াতে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যে পৌঁছিলেন এবং জীবনের বাকী ছাব্বিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যেই কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা বিজয়। এই দুই রাজ্য বিজিত হইলেই, ভূতপূর্ব পরাক্রান্ত বাহ্‌মনি সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইহার

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়

কিছুকাল পরেই তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লী পর্যন্ত মুঘল অধিকার বিস্তৃত হয় (১৬৯১-১৬৯৭)। এইবারে মুঘলসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি চরম সীমায় পৌঁছিল,—এবং আকবরের ভারত-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল।

মুঘলসাম্রাজ্যের চরম বিস্তার

ঔরঙ্গজেব ও মারাঠাগণ। শিবাজীর মৃত্যুর পরে শম্ভাজী মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই দুশ্চরিত্র যুবকের আমলে মারাঠারাজ্যে বিশেষ বিশৃংখলা উপস্থিত হইল। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শম্ভাজী মুঘলসৈন্যের হস্তে পতিত হইলেন এবং সমস্ত অনুচরগণসহ নিহত হইলেন। সম্রাটের আদেশে প্রথমে তাঁহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হইল, এবং এরূপ অন্যান্য পৈশাচিক যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। শম্ভাজীর পুত্র সপ্তবর্ষবয়স্ক সাহু মুঘলরাজ-শিবিরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

শম্ভাজীর সিংহাসনে আরোহণ

মুঘলহস্তে বন্দী ও নিহত

শম্ভাজীর পুত্র সাহু মুঘলশিবিরে প্রতিপালিত

কিন্তু শম্ভাজীর হত্যাতেই মারাঠা শক্তির দমন হইল না। শম্ভাজীর পরে তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাই পুত্র তৃতীয় শিবাজীর প্রতিনিধিরূপে অতি যোগ্যতার সহিত মারাঠারাজ্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মারাঠাদের সহিত লড়িলেন, কিন্তু কোনও স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিলেন না। বহু আয়াসে এবং কোন সময় প্রচুর উৎকোচ দিয়া তিনি একটি একটি করিয়া মারাঠা দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টায় যাহা অধিকার করিতেন, একটু দূরে সরিয়া গেলেই মারাঠাগণ আবার তাহা দখল করিয়া লইত। ঔরঙ্গজেব মারাঠাগণকে

'পার্বত্য মূষিক' বলিতেন। কিন্তু বিপুল মুঘলসাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়াও তিনি এই পার্বত্য মূষিকগণকে দমন করিতে পারিলেন না। ১৬৯৯ হইতে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মারাঠাগণ নর্মদা পার হইয়া মালবে অভিযান করে এবং খান্দেশ ও বেরার লুঠ করিয়া গুজরাটে প্রবেশ করে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে মারাঠাসৈন্য সম্রাটের শিবিরের নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত লুঠ করিত। ঔরঙ্গজেবের বিফলতার প্রধান কারণ মারাঠাগণের জাতিগত বিশেষত্ব। যখনই বিপুল মুঘলসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিত, তখনই তাহারা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের গ্রামে ফিরিয়া গিয়া চাষবাসে মনোযোগ দিত। আবার মুঘলবাহিনী যখন জয় সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া যাইত, অমনি মারাঠাগণ পুনরায় আসিয়া সৈন্যদলে ভর্তি হইয়া যাইত। তাহাদের সাজসজ্জায় কোন আড়ম্বর ছিল না বলিয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে তাহাদের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইত না। জলে আঘাত করিলে জল যেমন প্রতিঘাত করে মাত্র, কিন্তু আঘাতের চিহ্নও সেখানে বেশিক্ষণ থাকে না,—মারাঠাসৈন্যদলও অবিকল সেইরূপ ছিল।

মারাঠাগণের জাতীয় বিশেষত্ব

ঔরঙ্গজেবের চরিত্র। এইরূপে সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর দাক্ষিণাত্যে নিষ্ফল অভিযানের পর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ সম্রাট্ ভগ্নহৃদয়ে আহম্মদনগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। একজন ঐতিহাসিক সত্যই বলিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্য যেমন তাঁহার দেহের সমাধিক্ষেত্র, তেমনি তাঁহার গৌরবেরও সমাধিক্ষেত্র।

ঔরঙ্গজেবের কি কি দোষে মুঘলসাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হইল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের

অপরদিকও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। ঔরঙ্গজেব নিরতিশয় নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ছিলেন এবং মুসলমান ধর্মের আচার নিয়মগুলি অতিশয় যত্নের সহিত পালন করিতেন। তিনি অতি সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করিতেন এবং জীবনে কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। মুঘলসম্রাট্‌গণের মধ্যে সাধারণত যে সমুদয় পাপাচার দেখা যাইত, ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে তাহা খুব কমই ছিল। তাঁহার উদ্যম এবং কর্মদক্ষতাও অনন্যসাধারণ ছিল। কিন্তু এই সমস্ত গুণই তাঁহার নিরতিশয় সন্দিগ্ধ প্রকৃতি এবং সংকীর্ণ গোঁড়ামিতে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না; রাজ্যশাসনের সমস্ত বিভাগের কার্য নিজে দেখিতে চাহিতেন; কিন্তু এই বিপুল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের বিরাট ব্যাপার একজনের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। ফলে রাজ্যশাসনের সমস্ত বিভাগেই বিশৃংখলা ঘটিতে লাগিল এবং অসাধুতা ও উৎকোচ গ্রহণ সর্বত্র অবাধে চলিতে লাগিল। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। ফলে তিনি কাহারও বিশ্বাস বা ভালবাসা অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে যমের মত ভয় করিতেন বটে, কিন্তু ভালবাসিতেন না। মুহম্মদ ও আকবরের বিদ্রোহের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শাহ্‌জাদা মুয়াজ্জম্ এবং কামবক্সও শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই অপরাধে কতককালের জন্য নজরবন্দী ছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের গুণ

উহার দোষ

কর্মচারী ও পুত্রগণের অনুরক্তির অভাব

এইরূপে সংসারের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও, ঔরঙ্গজেব জীবনে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা এমন একাগ্রচিত্তে এবং স্থির লক্ষ্যে জীবনের শেষ দিন

ঔরঙ্গজেবের উচ্চভাব

পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন যে, আমরা তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। মৃত্যুশয্যায় শুইয়া তিনি পুত্রগণের নিকট যে সমুদয় পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এই রাজর্ষি-প্রকৃতি বাদশাহের উপযুক্ত অনেক উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। মুসলমানগণ যে ঔরঙ্গজেবকে মুঘলসম্রাট্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, তাহা একেবারে নিরর্থক নহে। বার্ণিয়ারও ঔরঙ্গজেবকে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঔরঙ্গজেবের নিরভিমান সরল জীবনযাত্রা কখনও কখনও অদ্ভুত ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হইত। তিনি স্বহস্তে টুপি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। মৃত্যুকালে এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তিনি চারি টাকা দুই আনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আদেশ করিয়া যান, মৃত্যুর পরে ঐ চারি টাকা দুই আনা মাত্র ব্যয়ে যেন তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়, এবং তাঁহার স্বহস্তে লিখিত কোরানের বিক্রয়-দ্বারা অর্জিত অপর তিন শত পাঁচ টাকা তাঁহার স্বর্গকামনায় যেন গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। তিনি শিল্প বা সাহিত্যের আদর করিতেন না। তিনি সরকারি ইতিহাস রচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং অন্য লোকেও যাহাতে ইতিহাস না লেখে, সেই উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের সরলতা

অষ্টম অধ্যায়

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইতে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত।

ঔরঙ্গজেবের পরবর্তিগণ এবং মুঘলসাম্রাজ্যের ধ্বংস

বাহাদুর শাহের সিংহাসনে আরোহণ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে অনিবার্য ভ্রাতৃ-বিরোধ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ মুয়াজ্জম্ কাবুলে অবস্থান করিতেছিলেন। অবিলম্বেই ভ্রাতা আজামের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে আজাম পরাজিত ও নিহত হইলে, মুয়াজ্জম্ বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৭০৭ খৃঃ)। দুই বৎসর পরে কনিষ্ঠ কামবক্‌স যুদ্ধে পরাজিত ও গুরুতররূপে আহত হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (জানুয়ারি, ১৭০৯)। বাহাদুর শাহ রাজপুতগণের সহিত সন্ধি করিয়া সুদীর্ঘ রাজপুত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করিলেন।

শিখ জাতি। বাহাদুর শাহের রাজত্বের প্রধান ঘটনা শিখদের সহিত যুদ্ধ। শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নানক ও তাঁহার পরবর্তী তিনজন শিখগুরু শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রচারক মাত্র

শিখসম্প্রদায়ের উৎপত্তি
গুরু নানক

ছিলেন। আকবর তাঁহাদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে অমৃতসর নামক স্থান দান করিয়াছিলেন (১৫৭৯)। এই অমৃতসরই শিখদের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। পঞ্চম গুরু অর্জুনের আমলে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। এখন হইতে উত্তরাধিকারী ক্রমে গুরুর পদ পূর্ণ হইতে থাকে। অর্জুন সন্ন্যাসজীবনের পরিবর্তে ভোগ-বিলাস আরম্ভ করেন ও অর্থ সংগ্রহের জন্য ভক্তগণের উপর রীতিমত কর ধার্য করেন। শিখদের "আদিগ্রন্থ" নামক ধর্মপুস্তক তিনিই প্রথমে প্রচার করেন। এই পঞ্চম গুরু অর্জুনকে জাহাঙ্গীর হত্যা করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ঘটনায় শিখ-জাতির মধ্যে একটা পরিবর্তন আসিল। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়কে যোদ্ধাসম্প্রদায়ে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন। নবম গুরু তেগ বাহাদুর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে হত্যা করেন। ইহার ফলে শিখগণের মুসলমান বিদ্বেষ ও সামরিক উত্তেজনা বাড়িয়া গেল। এই সময়ে দশম গুরু গোবিন্দসিংহের অভ্যুদয় হয়। গুরুগোবিন্দ শিখগণকে দৃঢ় একতাসূত্রে বাঁধিলেন, এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সামরিক শক্তির ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি নিয়ম করিয়া দিলেন যে, কোন শিখই তামাক খাইতে পারিবে না, তাহাদিগকে দীর্ঘ কেশ রাখিতে হইবে, খাটো পাজামা পরিতে হইবে, এবং লৌহবলয়, ক্ষুদ্র ছুরিকা ও চিরুনি ধারণ করিতে হইবে। এই ধর্মসংঘের একতা ও ভ্রাতৃভাব দৃঢ় করিবার জন্য গুরুগোবিন্দ তাহাদের ভিতর হইতে জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দিলেন; একত্র বসিয়া আহার তাহাদের

জাহাঙ্গীর ও ঔরঙ্গজেব কর্তৃক শিখ-গুরু হত

গোবিন্দসিংহ কর্তৃক সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত

ধর্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইল। এই ভ্রাতৃসংঘের নাম হইল খাল্‌সা অর্থাৎ পবিত্র। গুরুগোবিন্দ আরও ব্যবস্থা করিলেন যে, অতঃপর শিখদের আর কোন গুরু থাকিবে না। শিখদের আদিগ্রন্থই গুরুর স্থান অধিকার করিবে। গুরুগোবিন্দ ১৬৭৫ হইতে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গুরুর আসনে আসীন ছিলেন।

বাহাদুর শাহের সহিত শিখগণের সংঘর্ষ। গুরুগোবিন্দ বাহাদুর শাহকে সিংহাসন লাভ করিতে সহায়তা করেন। কিন্তু ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে এক আততায়ীর হস্তে গুরুগোবিন্দ প্রাণ হারাইলে, শিরহিন্দের মুঘলসেনাপতি গুরুগোবিন্দের শিশুপুত্রগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। গুরুগোবিন্দের পরে শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন—বান্দা। বান্দা অকথ্য নিষ্ঠুরতা সহকারে শিরহিন্দ লুণ্ঠন করিয়া গুরুগোবিন্দের পুত্রগণের হত্যার প্রতিশোধ লইলেন।

বান্দা কর্তৃক শিরহিন্দ লুণ্ঠন

এইরূপ নৃশংসতা সহ্য করিতে না পারিয়া বাহাদুর শাহ শিখদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। শিখগণ পরাজিত হইল বটে, কিন্তু বান্দা ধরা পড়িলেন না।

শিখদের পরাজয়

ফররুখ সিয়র। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ পরলোক গমন করেন। অমনি তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিয়া গেল এবং অবশেষে জ্যেষ্ঠ জাহান্দর শাহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই দুশ্চরিত্র অপদার্থ সম্রাট্ এগার মাস রাজত্ব করিবার পর বাহাদুর শাহের পৌত্র ফররুখ সিয়র কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন (১৭১৩)।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। বিহারের সুবাদার সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ এবং তাঁহার ভ্রাতা এলাহাবাদের সুবাদার সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ

ফররুখ সিয়রকে রাজ্যলাভে সহায়তা করিয়াছিলেন। ফররুখ সিয়র সম্রাট্ হইয়া প্রথম জনকে করিলেন প্রধান সেনাপতি, এবং দ্বিতীয় জনকে করিলেন প্রধান মন্ত্রী। ফররুখ সিয়রও তাঁহার পূর্ববর্তী জাহান্দর শাহের মত অপদার্থ এবং দুশ্চরিত্র ছিলেন। এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ই এখন প্রকৃতপক্ষে শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজপুত, শিখ ও জাঠদের সহিত যুদ্ধ। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিবাদের সুযোগ পাইয়া মারবাররাজ অজিত সিংহ মুঘল কর্মচারিগণকে যোধপুর হইতে বিতাড়িত করেন এবং মুঘলসাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া আজমীর অধিকার করেন। হোসেন আলি মারবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অজিত সিংহ বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং সম্রাটের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিলেন (১৭১৫ খৃষ্টাব্দ)।

অজিত সিংহের পরাজয়

সাম্রাজ্যের বিশৃংখলার সুযোগে শিখনায়ক বান্দা পঞ্জাবের পূর্বাংশ লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করিতেছিলেন। এবার তিনি ধরা পড়িলেন, এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরগণকে হত্যা করা হইল। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে জাঠেরা বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হইল।

বান্দার নৃশংস হত্যা

জাঠদের পরাজয়

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় এইরূপে অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমশই তাঁহাদের অধীনতা সম্রাটের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইহা টের পাইয়া একদা হোসেন আলি রাজপ্রাসাদ অধিকার করিলেন। হতভাগ্য সম্রাট্ বেগম মহলে যাইয়া পলাইলেন, কিন্তু সেখান হইতে

ফররুখ সিয়রের শোচনীয় হত্যা

তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল এবং কিছুদিন পরে তাঁহাকে হত্যা করা হইল (১৭১৯ খৃষ্টাব্দ)।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্বের অবসান। সম্রাট্ ফররুখ সিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করার পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ক্রমান্বয়ে বাহাদুর শাহের দুই পৌত্র রাফিউদ দরজাৎ ও রাফিউদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাদের নামে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে নেকুসিয়র নামে ঔরঙ্গজেবের এক পৌত্র সম্রাট্ পদবী গ্রহণ করায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে পরাভূত করেন। তারপর রাফিউদ্দৌলার মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহের আর এক পৌত্র মুহম্মদ শাহকে তাঁহারা সিংহাসনে স্থাপন করেন (সেপ্টেম্বর, ১৭১৯)। মুহম্মদ ওমরাহ্‌গণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া হোসেন আলি খাঁকে হত্যা করেন। অপর ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ নূতন এক রাজাকে সিংহাসনে বসাইলেন, কিন্তু মুহম্মদ শাহ এই নূতন রাজা এবং আবদুল্লা খাঁ উভয়কেই বন্দী করিলেন। এইরূপে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্বের অবসান হইল।

মুহম্মদ শাহ (১৭১৯—১৭৪৮)। মুহম্মদ শাহ এইবার চিন্‌-কিলিচ খাঁ এবং আসফ্ জাহ্ নামে পরিচিত ঔরঙ্গজেবের আমলের একজন বিচক্ষণ কর্মচারীকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

চিন্‌-কিলিচ খাঁ

চিন্‌-কিলিচ খাঁ দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে বিজাপুরের সুবাদার ছিলেন। বাহাদুর শাহ তাঁহাকে অযোধ্যার সুবাদার করেন এবং ফররুখ সিয়রের রাজ্যারম্ভে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি ও নিজাম উল মুলক্ উপাধি প্রাপ্ত হন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার

প্রতি সন্তুষ্ট না থাকায় দুই বৎসর পরেই তিনি পদচ্যুত হন। পরে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মালবের সুবাদার নিযুক্ত হন, কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় আবার তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে মালবের সুবাদারি পদ হইতে অপসৃত করেন এবং দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠান। এবার নিজাম উল মুল্‌ক্ বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন এবং কয়েকটি বড় দুর্গ অধিকার করেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু নিজাম এই সৈন্য পরাজিত করেন। ইহার কিছুদিন পরেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হন এবং মুহম্মদ শাহ্ নিজাম উল মুল্‌ক্‌কে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শাসনকার্যের সুশৃংখলা বিধানে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্রাট্ তাঁহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করায়, বিরক্তিভরে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিয়া দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন (১৭২৪)। সেখানে তিনি স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বর্তমান হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

স্বাধীন নিজাম রাজ্য স্থাপন

মুঘলসাম্রাজ্যের ধ্বংস। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও নিজাম উল মুল্‌কের উদাহরণ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার সুবাদার সাদৎ আলি খাঁ এবং বাঙলার সুবাদার আলিবর্দ্দী খাঁ একরকম স্বাধীনই হইয়া গেলেন। এদিকে জাঠেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। অন্যান্য প্রদেশও শীঘ্রই স্বাধীন হইল, এবং আফ্‌গান জাতীয় রোহিলাগণ বর্তমানে রোহিলাখণ্ড বলিয়া পরিচিত প্রদেশ অধিকার করিল।

বিভিন্ন প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

মারাঠা জাতি

মারাঠাগণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিগণিত হইল। মুঘলসাম্রাজ্য যখন এইরূপে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন মারাঠাগণ ক্রমশ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল। কিন্তু শিবাজীর বংশধরগণের কর্তৃত্ব মারাঠারাজ্যে আর বেশি দিন টিকিল না।

পেশোয়াগণের উত্থান। শিবাজীর পৌত্র রাজা সাহু ~~কিরূপে~~ ধৃত হইয়া ঔরঙ্গজেবকর্তৃক মুঘল শিবিরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, ~~তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।~~ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুক্ত হইয়া তিনি নিজের দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তারাবাই প্রথমে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি অনায়াসেই সাতারার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৭০৮)। তারাবাইয়ের সহিত বিরোধের সময় বালাজি বিশ্বনাথ নামে একজন কোংকনদেশীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। সাহু ইঁহাকে মন্ত্রী অথবা পেশোযার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা রাজ্যে বিষম বিশৃংখলা ঘটিযাছিল। বালাজী বিশ্বনাথ সমস্ত বিশৃংখলা দূর করিয়া, রাজ্যশাসনে পুনরায় শৃংখলা ফিরাইয়া আনিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি পেশোয়া পদকে রাজ্যের সর্বপ্রধান পদে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাজীরাও মারাঠা নায়কগণের মধ্যে একজন যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পেশোয়া পদের গৌরব আরও বাড়াইলেন। সাহু এক দানপত্রের দ্বারা রাজকীয় সমস্ত

বালাজী বিশ্বনাথ

প্রথম বাজীরাও

ক্ষমতা বাজীরাওর হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর শিবাজীর বংশধরগণ নামে মাত্র রাজা রহিলেন, কিন্তু পেশোয়াই প্রকৃতপক্ষে মারাঠা রাজ্যের নায়ক হইয়া দাঁড়াইলেন।

পেশোয়াই প্রকৃত রাজা

পেশোয়াদের অধীনে মারাঠা জাতির শক্তি সঞ্চয়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মারাঠা রাজ্য আয়তনে বেশি বড় ছিল না, কিন্তু মারাঠাগণ বহু বিস্তৃত স্থানের উপর চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিত। বালাজী বিশ্বনাথ এই প্রথাকে সুনিয়মিত করেন। সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ মারাঠাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। অবশেষে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মুঘলসম্রাট্ সন্ধি দ্বারা তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপলি, মহীশূর ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের ঐ দুই প্রকার কর আদায় করিবার অধিকার স্বীকার করিলেন। শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার অধীনে যে রাজ্য ছিল, তাহাও সনদদ্বারা বাদশাহ সাহুকে প্রদান করিলেন। ইহার পরিবর্তে সাহু বাদশাহকে দশলক্ষ টাকা দিতে ও যুদ্ধের সময় পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যের শান্তির জন্য দায়ী থাকিলেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যের কর্তৃত্ব মুঘল-হস্ত হইতে মারাঠা-হস্তে চলিয়া গেল।

দাক্ষিণাত্যে মারাঠা কর্তৃত্ব

প্রথম বাজীরাও। দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাও মুঘলদের হস্ত হইতে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিবার বিরাট কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। তিনি রাজা সাহুকে বলিলেন "মুঘলসাম্রাজ্য এখন এক বিশাল মৃতপ্রায় শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায়—একবার যদি তাহার মূলদেশ নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে ইহার

শাখাপ্রশাখা আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে—এবং তখন মহারাষ্ট্র বিজয়-পতাকা সিন্ধু নদ হইতে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত উড্ডীন হইবে।” এই মহৎ ও অসমসাহসিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া বাজীরাও উত্তর ভারতবর্ষে বারংবার অভিযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন

মালব বিজয়

এবং স্বয়ং মালব আক্রমণ করিলেন। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুঘলগণ মালবের অধিকার মারাঠাদের হস্তে ছাড়িয়া দিল। গুজরাটে মুঘলসম্রাটের দুই শাসনকর্তার মধ্যে বিবাদ বাধিল। ইঁহাদের একজন স্বীয় পক্ষ সমর্থন কবিবার জন্য

গুজরাট বিজয়

মারাঠাশক্তির সাহায্য ভিক্ষা করিলেন, এবং গুজরাট ক্রমশ মারাঠা অধিকারে চলিয়া গেল। এই সকল সাফল্যে উৎসাহিত

বুন্দেলখণ্ড জয়

হইয়া মারাঠাগণ রাজপুতানা আক্রমণ করিল। শীঘ্রই তাহারা বুন্দেলখণ্ড লুণ্ঠন করিয়া যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইল। মুঘলসম্রাটের ক্ষমতা যে এখন নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সুতরাং বাজীরাও এইবার মুঘল রাজধানী জয় করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য প্রকাণ্ড একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু মারাঠার সুপরিচিত সামরিক নীতি অবলম্বনপূর্বক তিনি তাহাদিগকে এড়াইয়া সহসা দিল্লীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন

দিল্লী অভিযান

(১৭৩৭ খৃঃ)। এইবার কিন্তু তিনি দিল্লী অধিকার না করিয়াই আসফ্‌জাহ নিজাম উল মুল্‌কের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিলেন। নিজাম মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধিতে শংকিত হইতেছিলেন, সুতরাং দিল্লীর সম্রাট্ যখন মারাঠাদিগকে দমন করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, তখন তিনি সানন্দে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বাজীরাওকে আঁটিয়া উঠা

তাঁহার সাধ্য ছিল না। তিনি অচিরেই বাজীরাওর সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৩৮ খৃঃ)। সন্ধির সর্ত হইল—(১) সমগ্র মালব দেশ বাজীরাওর হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে, (২) নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগে বাজীরাওর আধিপত্য স্বীকার করিতে হইবে, (৩) উক্ত মর্মে বাদশাহ স্বয়ং বাজীরাওকে সনদ দিবেন এবং (৪) যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য যাহাতে সম্রাট্ বাজীরাওকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেন নিজাম তাহারও চেষ্টা করিবেন। এইরূপে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই শিবাজী প্রতিষ্ঠিত মারাঠা জাতির হস্তে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল। **নিজামের পরাজয়**

মারাঠাদিগের পাঁচটি রাজ্যের উৎপত্তি। মারাঠাগণ এখন দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং উত্তর ভারতবর্ষেও তাঁহাদের অধিকার বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের দূর প্রদেশগুলিকে শাসনাধীনে রাখিতে এবং খাজানা ইত্যাদি রীতিমত আদায় করিবার জন্য বাজীরাও এই বিস্তৃত রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁহার এক এক প্রধান সেনাপতিকে স্থাপিত করিলেন। এইরূপে রণোজি সিন্ধিয়া এবং মল্হর রাও হোল্কার মালবে নিযুক্ত হইলেন। বেরারে ভোঁস্লা বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুজরাটে প্রথমে প্রধান সেনাপতি দাভারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহকারী পিলাজী গাইকোয়াড় শীঘ্রই তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। এই নূতন নীতির ফলেই কালক্রমে সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র রাজ্য, হোল্কারের ইন্দোর রাজ্য, ভোঁস্লার নাগপুর রাজ্য এবং গাইকোয়াড়ের বরোদা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পেশোয়ার অধীন পুণা রাজ্য লইয়া এইরূপে মারাঠা সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রধান রাজ্যে **সিন্ধিয়া, হোল্কার ও ভোঁস্লা** **গাইকোয়াড়**

বিভক্ত হইয়া গেল। কিন্তু পেশোয়া বাজীরাওর সময়ে এই পাঁচটি রাজ্যই তাঁহার কর্তৃত্ব মানিয়া চলিত। বাজীরাওই এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কবে পতনোন্মুখ মুঘলসাম্রাজ্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মারাঠাগণ তাহার স্থান অধিকার করিবে, বাজীরাও আগ্রহে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নাদির শাহের আক্রমণ হইতে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত

নাদির শাহের আক্রমণ। এই সময়ে এক বিষম বিপৎপাতে ভারতবর্ষ অস্থির হইয়া উঠিল। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে নাদির কুলী খাঁ নামে একজন বীর যোদ্ধা নাদির শাহ নাম ধারণ করিয়া পারস্যের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিন বৎসর পরে তিনি সসৈন্যে ভারত জয়ের অভিলাষে যাত্রা করেন এবং বিনা বাধায় কর্ণাল পর্যন্ত অগ্রসর হন। এইখানে মুঘলসৈন্য তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। যুদ্ধে মুঘলসৈন্যের পরাজয় হইল এবং কুড়ি হাজার মুঘলসৈন্য হত হইল। সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ নাদিরকে বাধা দেওয়া অসম্ভব দেখিয়া নাদিরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, এবং উভয়ে একত্র দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল নিরুপদ্রবেই কাটিল বটে, কিন্তু সহসা নাদিরের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদে উত্তেজিত হইয়া দিল্লীর নাগরিকগণ নাদিরের কয়েক সহস্র অনুচরকে হত্যা করিল। নাদির শীঘ্রই ইহার ভীষণ প্রতিশোধ লইলেন। তিনি আদেশ দিলেন, নির্বিচারে দিল্লীর কয়েক মহল্লার সমস্ত অধিবাসীর প্রাণবধ করা হউক। ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়া গেল—৫ ঘণ্টা

কর্ণালে সম্রাট্ সৈন্যের পরাজয়

দিল্লীর হত্যাকাণ্ড

পর্যন্ত নাদির বসিয়া বসিয়া এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড দেখিলেন। অবশেষে সম্রাট্ মুহম্মদ শাহের অনুনয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্থগিত হইল। অতঃপর নাদির ধীরে ধীরে দিল্লীর অধিবাসিগণের ধন লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, এবং সাতান্ন দিন দিল্লীতে অবস্থান করিয়া দিল্লী-সম্রাটের ময়ূরসিংহাসন এবং আরও অশেষ ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সিন্ধুনদের পশ্চিমদিকস্থ প্রদেশও নাদির স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন (১৭৩৯)।

দিল্লী লুণ্ঠন

আহম্মদ শাহ দুরানীর ভারত আক্রমণ। নাদির শাহের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মুঘলসাম্রাজ্যের অবসান হইল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ পরলোক গমন করিলেন, এবং তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মুঘলসম্রাটের ক্ষমতা এখন নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছিল। সম্রাটের দরবারে ওমরাহ্‌গণের মধ্যেও কলহের অন্ত ছিল না। আহম্মদ শাহ দুরানী নামক একজন আফগান সর্দার নাদিরের মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্যের পূর্বাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। এখন তিনি পঞ্জাব হইতে রীতিমত খাজানা আদায় করিতে লাগিলেন, এবং অসহায় সম্রাট্ অবশেষে সমগ্র পঞ্জাব তাঁহার হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী স্বীয় প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত এবং অন্ধ করিয়া দ্বিতীয় আলমগীরকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে আহম্মদ শাহ দুরানী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন এবং অশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত মথুরা ও দিল্লী লুণ্ঠন করিলেন (১৭৫৬-১৭৫৭ খৃঃ)।

আহম্মদ শাহ

আহম্মদ শাহ দুরানীকর্তৃক পঞ্জাব অধিকার

দুরানীর ভারত আক্রমণ

মারাঠাগণ। এই সময়ে এই সমস্ত বিপদ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল একমাত্র মারাঠাগণের!

বালাজী বাজীরাও

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বাজীরাওর মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়া হইয়াছিলেন। বালাজী বাজীরাও মারাঠা-শক্তি আরও দৃঢ়সংবদ্ধ করিলেন এবং পুনা নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ্ দুরানী পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে, পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথের নায়কত্বে একদল মারাঠাসৈন্য পঞ্জাব অধিকার করিল (১৭৫৮ খৃঃ)।

মারাঠা সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি

মারাঠা জাতির এই সময়ে চরম উন্নতি হইয়াছিল। তাহারা সিন্ধু ও হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই বিস্তৃত রাজ্য পেশোয়ার শাসন মানিয়া চলিত। শিবাজীর স্বপ্ন এতদিনে সফল হইল। অশোকের পরে এত বড় হিন্দু সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে আর স্থাপিত হয় নাই।

দুরানীর পুনরায় পঞ্জাব অধিকার

কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশি দিন স্থায়ী হইল না। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ দুরানী পুনরায় পঞ্জাব অধিকার করিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সেখানে মারাঠা-অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মারাঠা-সরকার হইতে এক বিপুল সৈন্যদল প্রেরিত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ এই সৈন্যদলের সেনাপতি হইতে অস্বীকার করিলেন, এবং পেশোয়ার সপ্তদশবর্ষবয়স্ক পুত্র বিশ্বাসরাও এই বিপুল সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। সদাশিবরাও ভাও বিশ্বাসরাওর পরামর্শদাতা হইলেন। সদাশিবের সাহস ছিল বটে, কিন্তু সেনাপতির যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না।

মারাঠাদের উত্তরে অভিযান

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। মারাঠাসৈন্য সহজেই দিল্লী অধিকার করিয়া পানিপথে আহম্মদ শাহ দুরানীর সৈন্যদলের

সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষই পানিপথে উপস্থিত হইয়া, শিবিরের চারিদিকে গড়খাই কাটিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রোহিলাগণ এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা সুজাউদ্দৌল্লা আহম্মদ শাহের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। কারণ তাঁহারা এই হিন্দু-শক্তির অভ্যুত্থানে সশংকিত হইয়া কালযাপন করিতেছিলেন।

দুরানীর পক্ষাবলম্বিগণ

মারাঠাগণের প্রচলিত যুদ্ধপ্রথা ত্যাগ

অনেকেই মারাঠা-সেনাপতিকে মারাঠাগণের চিরপ্রচলিত সমর-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন, অর্থাৎ একটি বড় যুদ্ধের ফলাফলের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, ভারি জিনিষপত্র দূরে রাখিয়া, লঘুগতি বর্গীর অশ্বারোহীর সাহায্যে শত্রুকে সমস্ত দিক হইতে আক্রমণ করিয়া পীড়ন করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এই সকল উপদেশ না শুনিয়া সদাশিবরাও ভাও এবং বিশ্বাসরাও পানিপথে বিপুল সৈন্যদল ও অসংখ্য ভৃত্যাদিসহ তাঁবু গাড়িয়া বসিলেন।

শীঘ্রই তাঁবুতে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল এবং একটি বৃহৎ যুদ্ধের ফলাফলের উপরই মারাঠাগণকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী ভোরবেলা মারাঠা-সেনাপতি সমস্ত সৈন্য লইয়া আহম্মদ শাহ দুরানীকে আক্রমণ করিলেন। মারাঠাসৈন্যগণ অসীম সাহসের সহিত পার্বত্য আফগানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ছয় ঘণ্টা ঘোর যুদ্ধের পরে, মারাঠাপক্ষের জয় হইবে, এমন বুঝা যাইতে লাগিল। কিন্তু আহম্মদ শাহ দুরানীর শ্রেষ্ঠতর সমর-কৌশলে যুদ্ধের ফল অন্যরূপ দাঁড়াইল। বেলা প্রায় একটার সময় পশ্চাৎস্থিত নূতন এক সৈন্যদল লইয়া আহম্মদ শাহ দুরানী প্রবলবেগে মারাঠাগণকে আক্রমণ করিলেন। দুই ঘণ্টা ঘোর

যুদ্ধের পর বিশ্বাসরাও আহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন, এবং অমনি সমস্ত মারাঠাসৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতে লাগিল। প্রায় কুড়ি মাইল পর্যন্ত আফগানগণ মারাঠাগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং যাহাকে পাইল তাহাকেই হত্যা করিল। প্রায় দুই লক্ষ মারাঠা এইভাবে হত হইল। বিশ্বাসরাও, সদাশিবরাও ভাও এবং প্রায় সমস্ত মারাঠা-সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেন।

মারাঠাদের সম্পূর্ণ পরাজয়

মারাঠাগণের বিপুল ক্ষতি

যুদ্ধের ফলাফল। এই যুদ্ধে মারাঠাদের নিদারুণ পরাজয়ের ফলে তাহাদের উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া গেল। পেশোয়ার প্রাধান্য ও গৌরব হ্রাস হইয়া গেল, এবং ইহার ফলে পরিণামে অন্যান্য মারাঠা-শক্তির উপর পেশোয়ার প্রভুত্ব ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে আরম্ভ করিল। সত্য বটে, ইহার পরেও ভিন্ন ভিন্ন মারাঠা-নায়কগণ বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, এবং অন্যান্য নানাবিধ সাফল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু মারাঠা জাতির ভারতে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রহিল।

মুঘলসাম্রাজ্য পূর্বেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, মারাঠাগণও নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইল না,—এইবার ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভার এক তৃতীয় শক্তির হাতে যাইয়া পড়িল। এই শক্তিমান জাতির নাম ইংরাজ। ইহারা দূর দেশ হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল। অতঃপর সেই অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত হইবে।

মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের কারণ। উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিবার পরেই যে সমুদয় কারণে বিশাল মুঘলসাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত ঔরঙ্গজেবের ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে বহু সৈন্য নাশ ও অগণিত অর্থব্যয়; দ্বিতীয়ত, এই সুদীর্ঘকাল সম্রাটের অনুপস্থিতিতে হিন্দুস্থানে শাসন-প্রণালীর বিশৃংখলা; তৃতীয়ত, ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের ফলে সমগ্র হিন্দুজাতির বিশেষত রাজপুত জাতির বিরাগ উৎপাদন; চতুর্থত, রাজ্যের ওমরাহ্ ও সৈন্যগণের চরিত্রের অবনতি ও যোগ্যতার হ্রাস। ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ প্রায় সকলেই অপদার্থ ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তের বৎসরের মধ্যে সিংহাসন লইয়া সাতটি ভীষণ যুদ্ধ হয়। তার পরে ওমরাহ্‌গণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ তো লাগিয়াই ছিল। ইহাই ওমরাহ্ ও সৈন্যদলের অবনতির মূল কারণ। যে মারাঠা জাতির হস্তে মুঘলসাম্রাজ্যের ধ্বংস হইল, তাহাদের শক্তি ও সফলতার মূলে ছিল ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে পীড়িত সমগ্র হিন্দু জাতির আশা ও সহানুভূতি। নাদির শাহ্ যখন স্বল্পায়াসে দিল্লী অধিকার করিলেন এবং বিনা বাধায় যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তখনই বিস্মিত জগৎ প্রথমে বুঝিতে পারিল, মুঘলসাম্রাজ্য কত অন্তঃসারহীন। নাদির শাহের আক্রমণ মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের কারণ নহে, স্পষ্ট পরিচয় মাত্র।

নবম অধ্যায়

মুঘলযুগে ভারতবর্ষ

শাসন প্রণালী। মুশলমান রাজত্বের প্রথমভাগে যে কোন উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১৫৯-১৬০ পৃঃ)।

সের সাহই প্রথম ভারত-শাসনের সমস্যা সম্যক্ উপলব্ধি করেন, এবং সমস্যার মীমাংসাও খুঁজিয়া বাহির করেন। তিনি ভারতবর্ষকে, হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই দেশ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, এবং এই উভয় সম্প্রদায়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু সামরিক শক্তিতে ভারতবাসিগণকে দমন করিয়া যে ভারত শাসনের কোনও সার্থকতা নাই, তাহা তিনি বেশ্ বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

সের সাহের উদার নীতি

আকবর সের সাহেরই অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার সময়ে একটি সুদৃঢ় সুশৃংখল মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাস্তবিক এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি এরূপ সুদৃঢ় হইয়াছিল যে, জাহাঙ্গীরের দুর্বল শাসন অথবা শাহ্জাহানের পুত্রগণের সিংহাসন লইয়া ঘোরতর বিবাদ, এমন কি, ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারেও উহা অটুট ছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষবশত আকবরের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন এবং বিপুল মুঘলসাম্রাজ্য অল্পদিনের মধ্যেই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল।

আকবর কর্তৃক সের সাহের পদাঙ্ক অনুসরণ

সাহিত্য। মুঘল যুগে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীদাস এবং ভারতচন্দ্র বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। এদিকে তুকারাম ও রামদাসের রচনায় মারাঠি এবং সুরদাস ও তুলসীদাসের রচনায় হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

মুঘল যুগে ফেরিস্তা, আবুল ফজল ও মুহম্মদ হাসিম (খাফি খাঁ) নামক তিনজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথম দুইজন আকবরের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন এবং তৃতীয় জন ঔরঙ্গজেবের কালের ঐতিহাসিক। ফেরিস্তা নিজের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের এক বিস্তৃত ইতিহাস সংকলন করিয়া গিয়াছেন; আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী এবং আকবর-নামা নামক দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থে আকবরের রাজত্বের এক বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ভীমসেন, ঈশ্বরদাস নাগর প্রভৃতি হিন্দুও পারস্য ভাষায় সমসাময়িক ইতিহাস লিখিয়াছেন। মুসলমান রাজগণ নিজেদের জীবন-চরিত লিখিয়া ইতিহাসের উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ফিরোজ তুঘ্‌লক, বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মুহম্মদ হাসিম

ফেরিস্তা

আবুল ফজল

বিদেশীয়গণের বিবরণ। বিদেশীয়গণের বিবরণ হইতেও আমরা মুঘল যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি।

সার্ টমাস রো। সার্ টমাস্ রো ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের দরবারে আগমন করেন। সম্রাট্, তাঁহার দরবার এবং তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি অতি চিত্তাকর্ষক এক

বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীর খুব মদ্যপায়ী ছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে খুব সাবধান হইয়া চলিতেন। তাঁহার মতে, জাহাঙ্গীরের সদয় অন্তঃকরণ ও সদসৎ বিবেচনা শক্তি ছিল। সম্রাটের দরবারে জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। সম্রাট্ দরবারে একটি অত্যোচ্চ সিংহাসনে বসিতেন। সিংহাসনটি আগাগোড়া হীরক, মুক্তা ও পদ্মরাগ মণিতে খচিত ছিল। তাঁহার বিবিধ মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণনির্মিত বহুসংখ্যক ভোজন ও পানপাত্র ছিল।'

রাজদরবারের জাঁকজমক

সার্ টমাস্ রোর মতে আকবরের সময় হইতে জাহাঙ্গীরের সময়ে শাসন-শৃংখলার অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল। সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরগুলিতে এই অবনতি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যাইত; ঐসব বন্দরের শাসনকর্তারা নিজের ইচ্ছামত মূল্যে বণিকগণের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। রাজ্যের উচ্চকর্মচারী মাত্রই অত্যন্ত স্বেচ্ছাচরী ছিল এবং উৎকোচ গ্রহণ করিত। কিন্তু রাজ্যের ওমরাহ্‌গণের সম্ভ্রমজনক মুখশ্রী এবং ব্যবহারে সার্ টমাস্ রো মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

রাজকর্ম্মচারিগণের দুশ্চরিত্রতা

শিল্প ও কারুকার্য তখন বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রো সম্রাট্‌কে একটি শকট উপহার দেন। সম্রাটের শিল্পিগণ উহা দেখিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐরকম আরও কয়েকটি শকট তৈয়ার করিয়া ফেলিল। এগুলির উপকরণ মূল শকটের উপকরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, শিল্পনৈপুণ্যেও সেগুলি মূল শকট হইতে নিকৃষ্ট হইল না। রো সম্রাট্‌কে একখানা ছবি উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাটের শিল্পিগণ অবিলম্বে উহার অনেকগুলি নকল তৈয়ার করিয়া ফেলিল, এবং কোন্‌টি আসল কোন্‌টি নকল

শিল্পের উন্নতি

তাহা স্থির করিতে টমাস্ রোকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সামরিক শক্তির হ্রাস

কিন্তু মুঘলগণের বলবীর্য এবং সামরিক শক্তি ও প্রবৃত্তি অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। কেবল পাঠান ও রাজপুতগণের মধ্যেই সাহসী সৈন্য পাওয়া যাইত।

বার্নিয়ারের বিবরণ

বার্নিয়ার। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষ অবস্থায় সিংহাসন লইয়া যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন বার্নিয়ার নামে একজন ফরাসি পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এই ভ্রাতৃবিরোধের আমূল বিবরণ বার্নিযার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বার্নিয়ার ঔরঙ্গজেবকে তাঁহাব বুদ্ধি, কৌশল ও কার্যদক্ষতার জন্য বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বার্নিয়ার লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সতেজে চলিতেছে, দেশের ধন-সম্পদের সীমা নাই এবং ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকে মুঘল রাজদরবারের তুলনাই হয় না।' দেশের ধনসম্পদের অধিকাংশ কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ভোগ করিত এবং সাধারণ লোকের মধ্যে দারিদ্র্যই বিরাজ করিত। রাজকর্মচারিগণের অত্যাচারেও তাহারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট ছিল। দেশে অনেক কলাকুশলী শিল্পী ছিল, কিন্তু ওমরাহ্‌গণ তাহাদের উপর বড় অত্যাচার করিত। মোটকথা, মুঘলসাম্রাজ্য যে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, বার্নিয়ার তাহার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের বিবরণ

বাঙলা দেশের অবস্থা কিন্তু অন্যান্য দেশের অবস্থা হইতে অনেক ভাল ছিল। ফল ও শস্যের প্রাচুর্যে এই দেশ সুখ ও শান্তির আগার ছিল। কেবল এই সময়ে পর্তুগীজ দস্যুগণের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গে অশান্তি বিরাজ করিতেছিল, এবং

বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার কতকাংশ জনবিরল হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল।

টেভারনিয়ারের বিবরণ

টেভারনিয়ার ও মেন্নুসী। বার্নিয়ারের কয়েক বৎসর পূর্বে টেভারনিয়ার নামে আর এক ফরাসি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি হীরক-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং হীরক বিক্রয় করিতে ভারতের অনেক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ পাঠে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপন্নদ্রব্য, রপ্তানি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মেন্নুসীর বিবরণ

মেন্নুসী নামে একজন ইটালীয় পর্যটক ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালে ভারতে আসিয়া একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থে ভারতবর্ষের সর্ববিধ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মুঘল রাজ-অন্তঃপুরের অনেক সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর বিবরণে বহু অকিঞ্চিৎকর গল্পও যেমন আছে, খাঁটি ইতিহাসের বিবরণও তেমনি অনেক আছে।

শিল্প ও স্থাপত্য। মুঘল সম্রাটগণ প্রায় সকলেই শিল্পানুরাগী ছিলেন এবং দেশময় তাঁহারা সুন্দর সুন্দর ইমারৎ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আকবর ও শাহ্‌জাহানের নির্মিত মস্‌জিদ, স্মৃতি-সৌধ ও প্রাসাদের বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দিল্লীতে কুতব্‌মিনার ও ঘিয়াসুদ্দিন তুঘ্‌লকের সমাধি মন্দির, আগ্রায় নূরজাহানের পিতা ইতিমাদ-উদ্দৌল্লার সমাধি-মন্দির, সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি-মন্দির এবং লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি-মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশে চিত্রবিদ্যার চর্চাও ছিল, এবং উহাও বিশেষ উন্নতিলাভ

কবিয়াছিল। মুঘল ও বাজপুত বীতিতে অংকিত চিত্রগুলি এই যুগেব চিত্রেব উৎকৃষ্ট নিদর্শন। উৎকৃষ্ট চিত্র সংবলিত বহু হস্তলিখিত গ্রন্থ এই যুগেব চিত্র-শিল্পেব বিশিষ্ট নিদর্শন বলিযা গণ্য হয।

অমোর্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
দশম শ্রেণী ১৩৫১.

তৃতীয় খণ্ড

ইংরাজ আমল

প্রথম অধ্যায়

ভারতে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ—
ইংরাজ ও ফরাসির দ্বন্দ্ব

বিদেশীয় বণিক্ কোম্পানিগণের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা। পর্তুগীজ বণিক্‌গণের কার্যাবলী পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামা ইউরোপ হইতে জাহাজে চড়িয়া সোজাসুজি ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিয়া যে সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সুবিধা একমাত্র পর্তুগীজগণই ভোগ করে নাই।

ইউরোপীয়গণের ভারতে আগমন

সত্বরই অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি ঐ পথে ভারতে আসিয়া উপনীত হইল, এবং ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কয়েকজন ইংরাজ বণিক্ মিলিয়া ইংলণ্ডে এক বণিক্-সমিতি গঠন করেন। ইহা সাধারণত "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামে পরিচিত। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পূর্বদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দিয়া, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ এই কোম্পানিকে এক সনদ প্রদান করিলেন। দুই বৎসর পরে

ওলন্দাজগণও এক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। ডেইন্‌গণের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসিগণও এক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করে। বিভিন্ন কোম্পানী স্থাপন

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা লাভ। পর্তুগীজগণ সর্বাগ্রে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। এই পর্তুগীজগণের প্রাণপণ বাধাসত্ত্বেও বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর এক সময়ে পর্তুগীজগণের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজগণকে সুরাটে বাণিজ্য করিবার জন্য কুঠি স্থাপন করিতে সনদ দিলেন। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের নিকট হইতে সার্ টমাস্ রো দূতস্বরূপ জাহাঙ্গীরের সভায় আগমন করেন, এবং সম্রাটের অনুগ্রহে ইংরাজ কোম্পানির জন্য নানারূপ সুবিধাজনক বিধিব্যবস্থা করেন (১৬১৫)। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জাহান বঙ্গদেশ হইতে পর্তুগীজগণকে বিতাড়িত করেন। ইহার অনতিকাল পরেই ইংরাজেরা হুগলিতে কুঠি স্থাপন করে এবং বার্ষিক এককালীন কিছু টাকা দিয়া বাঙলা দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করে। ইংরাজ কোম্পানির অধিকার লাভ; বঙ্গদেশে ইংরাজের কুঠি প্রতিষ্ঠা

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ মাদ্রাজে এক কুঠি প্রতিষ্ঠা করে এবং উহা রক্ষার জন্য এক দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার নাম রাখে ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ্জ। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ পর্তুগীজ রাজকন্যার সহিত বিবাহের যৌতুকস্বরূপ, এখন যেখানে বোম্বাই নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই স্থানটুকু প্রাপ্ত হন। তিনি ১৬৬৮ খৃঃ উহা দশ পাউণ্ড বাৎসরিক জমায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কায়েমি ইজারা কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রতিষ্ঠা

দেন। ১৬৯০ হইতে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারী জব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা নগরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের পশ্চিম, দক্ষিণ এবং পূর্ব প্রান্তে ইংরেজগণের বাণিজ্যের তিনটি প্রধান কেন্দ্রস্থল স্থাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে বাণিজ্যলোলুপ স্বদেশবাসিগণের প্রতিযোগিতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। কিছুকাল আর এক কোম্পানির সহিত তীব্র রেষারেষির ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রায় নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবশেষে প্রতিযোগী কোম্পানির সহিত পুরাতন কোম্পানি মিলিয়া এক হইয়া গেল। এই নূতন কোম্পানির নাম হইল "ইউনাইটেড্ কোম্পানি"।

প্রতিযোগী কোম্পানির সহিত মিলন

পর্তুগীজ শক্তির ক্রমাবনতি। ইউরোপীয় বণিক্গণের মধ্যে পর্তুগীজদিগের ক্ষমতা খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতেই দ্রুতবেগে হ্রাস পাইতে লাগিল। স্বদেশের রাজনৈতিক গোলযোগ এবং খৃষ্টধর্মের নামে তাহারা ভারতবাসিগণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাই তাহাদের পতনের কারণ। তাহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে মাত্র তিনটি ক্ষুদ্র স্থান তাহাদের অধিকারে আছে—গোয়া, দামন (বোম্বাইর উত্তরস্থ) এবং ডিউ (কাঠিয়াবার উপদ্বীপের দক্ষিণস্থ)।

পর্তুগীজগণের পতনের কারণ

ওলন্দাজ উপনিবেশ। ভারতবর্ষের ওলন্দাজ উপনিবেশ কখনও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয় নাই। ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের দিকেই তাহারা অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিল, এবং সেখানে তাহারা পর্তুগীজগণের অধিকৃত স্থানগুলি একে একে দখল করিয়া লইল। ডেইন্ জাতির উপনিবেশও ভারতে

প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা শ্রীরামপুরে এবং ট্র্যাংকুইবার নামক স্থানে (তাঞ্জোরের বন্দর, নাগপত্তনের ১৮ মাইল উত্তরে) দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই উপনিবেশ দুইটি কখনও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয় নাই এবং অবশেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ উহা কিনিয়া লয়।

ইংরাজের প্রতিযোগী ফরাসি কোম্পানি। এইরূপে ইংরাজদের প্রতিযোগিতা করিতে টিকিয়া রহিল একমাত্র ফরাসিগণ। তাহারা বিলম্বে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু শীঘ্রই বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের প্রধান উপনিবেশ মাদ্রাজের দক্ষিণস্থ পঁদিচেরি ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক বৎসর পরেই দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত হয়। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী নদীর উপর চন্দননগর নামক স্থানে তাহারা এক কুঠি স্থাপন করে এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থানটি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা মালাবার উপকূলে মাহে নামক স্থানে দুর্গদ্বারা রক্ষিত এক উপনিবেশ স্থাপন করে। নাগপুরের ভোঁস্‌লা রাজার বিরুদ্ধে কর্ণাটের নবাবকে আশ্রয় প্রদান করিয়া, ফরাসিগণ শীঘ্রই প্রবল সামরিক শক্তিরূপে খ্যাতি লাভ করিল।

ফরাসিগণের অভ্যুদয়

ডুপ্লে। কিন্তু ফরাসি শক্তির আরও উন্নতি বিধানের জন্য শীঘ্রই এক প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব হইল—ইঁহার নাম ডুপ্লে। ডুপ্লে প্রথমে চন্দননগরের শাসনকর্তা ছিলেন, পরে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পঁদিচেরির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই তীক্ষ্ণদর্শী রাজপুরুষ শীঘ্রই ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, এদেশীয় পদ্ধতিতে

শিক্ষিত সৈন্যের দল যুদ্ধকার্যে একেবারে অকর্মণ্য এবং ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলে ইহাদের অল্পসংখ্যক সৈন্যই প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত বহু সৈন্যকে পরাজিত করিতে পারে। তিনি আরও দেখিলেন, ভারতে কোন রাজবংশই স্থায়ী হয় না, এবং রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া রাজবংশীয়গণের মধ্যে গোলমাল লাগিয়াই আছে। কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যদি তিনি অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত দেশীয় সৈন্য লইয়া, কোন সিংহাসনের দাবিদারগণের মধ্যে একজনের পক্ষ সমর্থন করেন, তবে তাঁহার জয় অনিবার্য, এবং এইরূপেই তিনি ভারতে ফরাসি শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন।

ডুপ্লের নূতন সামরিক নীতি

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহাতে ভারতবর্ষেও ইংরাজ ও ফরাসি কোম্পানিতে বিবাদ বাধিল। ফরাসি নৌ-বলাধ্যক্ষ লা বুরদোনেস্ সমুদ্র হইতে মাদ্রাজের উপর গোলা বর্ষণ করিলেন; প্রতিশ্রুত অর্থ পাইলেই স্থানটি ফিরাইয়া দিতে হইবে এই সর্তে মাদ্রাজ আত্মসমর্পণ করিল। ডুপ্লে কিন্তু এই চুক্তি মানিলেন না এবং মাদ্রাজ দখল করিয়াই রহিলেন।

ফরাসিগণের মাদ্রাজ অধিকার

কর্ণাটের নবাব আনওয়ার উদ্দিন্* ফরাসি জাতির সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে শংকিত হইয়া উঠিতেছিলেন। নবাব যাহাতে ফরাসিদের উপর বিরূপ না হন, সেইজন্য ডুপ্লে বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এমন কি, তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, নবাবকে দিবার জন্যই তিনি ইংরাজদের হাত হইতে মাদ্রাজ কাড়িয়া লইয়াছেন। কিন্তু নবাব এই সকল কথায় ভুলিয়া

* আর্কট নামক স্থানে ইহার রাজধানী ছিল।

থাকিলেও শীঘ্রই তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং ফরাসিদের বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লের উদ্ভাবিত নূতন সামরিক নীতির এইবার পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং এই পরীক্ষায় ডুপ্লে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। মাত্র পাঁচশত লোক লইয়া তিনি নবাবের দশ হাজার সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দিলেন।

ফরাসি কর্তৃক কর্ণাটের নবাবের পরাজয়

অতঃপর ডুপ্লে মাদ্রাজের একশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ইংরাজদের সেণ্ট্ ডেভিড্ নামক দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ইহার কিছু পরেই ইংরাজদের রণতরী পন্দিচেরি অবরোধ করিল, কিন্তু পঞ্চাশ দিন পরে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যুদ্ধ থামিয়া গেল, কাজেই ভারতবর্ষেও যুদ্ধ থামিল। ইংরাজদিগকে মাদ্রাজ ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধের শেষ

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ। ডুপ্লে এইবার দেশীয় রাজাদের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করিবার নীতি কার্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজামের* মৃত্যু হইলে, সিংহাসন লইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাজির জঙ্গ এবং দৌহিত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গের বিবাদ বাধিয়া গেল। ডুপ্লে মুজফ্‌ফরের পক্ষ লইলেন এবং চাঁদা সাহেব নামক এক ব্যক্তিকে কর্ণাটের নবাব আন্‌ওয়ার উদ্দিনের বিরুদ্ধে সিংহাসনের দাবিদাররূপে দাঁড়া করিয়া দিলেন। মুজফ্‌ফর জঙ্গ এবং চাঁদা সাহেব মিলিত হইয়া ফরাসি সৈন্যের সহায়তায় আন্‌ওয়ার উদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত

দেশীয় রাজাদের গৃহ-বিবাদে ডুপ্লের হস্তক্ষেপ

* ২৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নিজাম উল মুল্‌ক। তাঁহার উপাধি অনুসারে 'নিজাম' হায়দ্রাবাদের অধিপতিগণের বংশগত উপাধি হইল।

করিলেন (১৭৪৯)। আনওয়ার উদ্দিনের পুত্র মুহম্মদ আলি ত্রিচিনোপলিতে পলাইয়া গেলেন।

এদিকে নাজির জঙ্গ বৃটিশ সৈন্যের সহায়তায় সিংহাসন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে মুজফ্‌ফরের অধিকার সাব্যস্ত হইল। তিনি ডুপ্লেকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থিত সমুদয় মুসলমান রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং মসলিপত্তন ও ইহার অধীনস্থ ভূ-খণ্ড ফরাসিদিগকে দান করিলেন। ডুপ্লের অধীনে চাঁদা সাহেব কর্ণাটের নবাব নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই মুজফ্‌ফর জঙ্গ নিহত হন। তখন ফরাসিগণ ভূতপূর্ব নিজামের তৃতীয় পুত্র সলবৎ জঙ্গকে সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল (১৭৫১)। ফরাসি সেনাপতি বুশী একদল ফরাসি সৈন্যসহ হায়দ্রাবাদে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থ "উত্তর সরকার" নামক ভূ-খণ্ডের রাজস্ব নিজাম তাঁহাকে দান করিলেন। সাত বৎসর যাবৎ বুশী নিজামের রাজ্যে ছিলেন এবং সেখানে ফরাসি শক্তির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপে কূটনীতি এবং যুদ্ধের সহায়তায় ডুপ্লে সর্বত্র সাফল্য লাভ করিতে লাগিলেন, এবং ফরাসি জাতি ক্ষমতা ও গৌরবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসি শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী

ফরাসিদের এইরূপ সাফল্য দেখিয়া ইংরাজগণ তাহাদের ক্ষমতা খর্ব করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ত্রিচিনো-পলিতে চাঁদা সাহেব মুহম্মদ আলিকে অবরোধ করিয়া বসিয়া-ছিলেন। ইংরাজগণ মুহম্মদ আলিকে সাহায্য করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে রবার্ট ক্লাইবের

প্রতিভাবলে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক নূতন যুগ উপস্থিত হইল।

রবার্ট ক্লাইব। ১৮ বৎসর বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন সামান্য কেরানিরূপে রবার্ট ক্লাইব মাদ্রাজে পদার্পণ করেন। ফরাসিদের সহিত যুদ্ধের সময় তিনি নিজের ইচ্ছায় সৈন্যদলে যোগ দেন, এবং ক্ষুদ্র একটি সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত হন। মুহম্মদ আলির অবরোধ লাঘব করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, অবরোধকারী চাঁদা সাহেবের রাজধানী আর্কট আক্রমণ করা হউক। মাদ্রাজের শাসনকর্তা এই দুঃসাহসিক প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ক্লাইব তিনশত দেশীয় এবং দুইশত ইংরাজ সিপাহি লইয়া, এমন অতর্কিতে আর্কটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন যে, বিনা রক্তপাতেই আর্কট অধিকৃত হইল।

ক্লাইবের অভ্যুদয়

আর্কট অধিকার

ত্রিচিনোপলি অবরোধে নিযুক্ত চাঁদা সাহেব এই সংবাদ পাইয়া আর্কট নগরী পুনরধিকার করিবার জন্য চারি হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। নানারূপ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ক্লাইব ৫৩ দিন পর্যন্ত নবাবের সৈন্যগণকে বাধা দিয়া রাখিলেন। অবশেষে নিরাশ হইয়া নবাবের সৈন্য যখন অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন ক্লাইব তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাদলসহ সদর্পে বাহিরে আসিয়া, নবাব-সৈন্যের উপর নিপতিত হইলেন এবং তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। আর্কট রক্ষার এই অদ্ভুত বীরত্বে এবং নবাব-সৈন্যের পরাজয়ে, দেখিতে দেখিতে ইংরাজের ভাগ্য ফিরিয়া গেল এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্যে তাহাদের গৌরব ছড়াইয়া পড়িল। ক্লাইবের চেষ্টায় শীঘ্রই চাঁদা

আর্কট রক্ষা

উহার ফল

সাহেবকে ত্রিচিনোপলির অবরোধ পরিত্যাগ করিতে হইল এবং মুহম্মদ আলি সমগ্র কর্ণাটের অধিপতি হইলেন।

ডুপ্লের শেষ জীবন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও বুদ্ধি-কৌশল সহকারে ডুপ্লে ইংরাজদের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা তাঁহার দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিল না। ডুপ্লে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার পরবর্তী ফরাসি গবর্নর ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়

বঙ্গে বৃটিশ শক্তির প্রসার। ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যে প্রভূত পরিমাণে সাফল্য লাভ করিলেও তাহাদের প্রতিষ্ঠার মূলকেন্দ্র ছিল বঙ্গদেশ। সুতরাং এইবার বঙ্গদেশের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

আলিবর্দি খাঁ। বাঙলার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন তাঁহার স্থান অধিকার করেন। সুজাউদ্দিন একজন ধার্মিক ও যোগ্য শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি কঠোর ন্যায়-বিচারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; এবং কখনও দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙলার নবাব হন। এই অক্ষম নবাবকে পদচ্যুত করিয়া বিহারের সুবাদার আলিবর্দি খাঁ বাঙলার মস্‌নদে উপবেশন করেন। আলিবর্দি নবাব হইয়াই দিল্লীর সম্রাটকে কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং বাঙলা দেশে স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মারাঠাদের উৎপাতে বাঙলা দেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আলিবর্দি মারাঠাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করিলেন, এবং বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন (১৭৫১)।

মারাঠাদের উৎপাত

সিরাজউদ্দৌল্লা। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা বাঙলার নবাব হন। সিরাজউদ্দৌল্লা যখন বাঙলার মসনদে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত মন্দ ছিল বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। ইংরাজদের সহিত অবিলম্বেই তাঁহার বিবাদ বাধিল এবং তিনি ইংরাজদের কাশিমবাজারের কুঠি অধিকার করিলেন। তাহার পর তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। সামান্য মাত্র আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াই কলিকাতার অধ্যক্ষ তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কতক ইংরাজ বন্দীকে রাত্রিতে এক ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে দেখা গেল, তাহাদের অনেকে দূষিত বাতাসে শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া গিয়াছে। এই ঘটনার নামই অন্ধকূপ হত্যা। অন্ধকূপ হত্যার এ বিবরণ সত্য কিনা, তাহা অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, যদি এই ঘটনা সত্যও হইয়া থাকে, তথাপি এই নৃশংস ব্যাপারের জন্য সিরাজ বিন্দুমাত্রও দায়ী ছিলেন না।

ইংরাজদের সহিত সিরাজ-উদ্দৌল্লার বিবাদ

কলিকাতার পতন

অন্ধকূপ হত্যা

এই সকল দুর্ঘটনার সংবাদ মাদ্রাজে পৌছিবামাত্র সেনাপতি ক্লাইব এবং নৌবলাধ্যক্ষ ওয়াট্‌সন বাঙলা দেশ অভিমুখে রওনা হইলেন। এক প্রকার বিনা বাধায় ইংরাজগণ কলিকাতা অধিকার করিল (জানুয়ারি, ১৭৫৭)।

কলিকাতার পুনরুদ্ধার

পলাশির যুদ্ধ। এই সময়ে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন একযোগে ফরাসিদের অধিকৃত চন্দননগর দখল করিতে অগ্রসর হইলেন এবং

সিরাজউদ্দৌল্লার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহা অধিকার করিলেন। ইহার পরেই ইংরাজদের সাহায্যে সিরাজউদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার সেনাপতি মীরজাফরকে তাঁহার স্থলে সিংহাসনে বসাইবার জন্য সিরাজউদ্দৌল্লার মন্ত্রিগণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। ক্লাইব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তিন হাজার সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নবাব সিরাজ-উদ্দৌল্লাও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও আঠার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে বাহির হইলেন। ভাগীরথীর তীরে পলাশিক্ষেত্রে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্লাইব সহজেই জয়লাভ করিলেন (২৩শে জুন, ১৭৫৭)। সিরাজউদ্দৌল্লা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ধৃত হইয়া নিহত হইলেন। মীরজাফর বাঙলার মসনদে বসিলেন বটে, কিন্তু নামে মাত্রই বাঙলার নবাব হইলেন, সমস্ত ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের হাতে যাইয়া পড়িল। ইংরাজদের সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ মীরজাফর তাহাদিগকে চব্বিশ পরগণার জমিদারি প্রদান করিলেন।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়

মীরজাফর নবাব

তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ ও ফরাসি শক্তির বিলোপ। বঙ্গদেশ এইরূপে ইংরাজকর্তৃক বিজিত হইবার অল্পকাল পরেই দাক্ষিণাত্যে ফরাসি শক্তির উচ্ছেদ হইল। ইংরাজকর্তৃক চন্দননগর অধিকারেই ফরাসিদের সহিত ইংরাজদের বিবাদ আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসি গবর্নর কাউণ্ট্ লালীর আগমনের পূর্বে বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। লালী আসিয়াই সেণ্ট্ ডেভিড্ দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং

কাউণ্ট্ লালী

উহা এক মাসের মধ্যে ফরাসিদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু স্বদেশ হইতে লালী প্রয়োজনানুরূপ সমর্থন ও সাহায্য পাইলেন না। অথচ ইংরাজ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভারতীয় ইংরাজগণকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ফলে সর্বত্র ফরাসিদের পরাজয় ঘটিতে লাগিল। অবশেষে লালী নিজামের রাজধানী হইতে বুশীকে সরাইয়া লইয়া আসিলেন; অমনি নিজামের রাজ্যে ফরাসিদের যাহা কিছু প্রতিপত্তি ছিল, সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। ক্লাইব বঙ্গদেশ হইতে ফরাসি-অধিকৃত মসলিপত্তন দখল করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যেই মসলিপত্তনের পতন হইল, অমনি নিজাম ফরাসিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং ফরাসিরা এ পর্যন্ত যে জাগীর ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহা ইংরাজকে অর্পণ করিলেন।

নিজামের রাজ্যে ফরাসি প্রতিপত্তির অবসান

সেনাপতি কুট

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব আয়ার কুট নামক একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে কর্ণাট প্রদেশস্থ ইংরাজ সৈন্যের সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কুট বন্দিবাসের যুদ্ধে লালীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন এবং একটির পর একটি করিয়া ফরাসি অধিকৃত সমস্ত স্থান দখল করিয়া লইলেন। অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পঁদিচেরির পতন হইল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইয়া ফরাসি-ইংরাজের যুদ্ধ থামিল বটে, কিন্তু ফরাসি শক্তি চিরকালের জন্য ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে পঁদিচেরি ফরাসিদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু উহার দুর্গ ভূমিসাৎ করা হইল।

বন্দিবাসের যুদ্ধে ফরাসির পরাজয়

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গে ও মাদ্রাজে ইংরাজের প্রতিষ্ঠালাভ

ইংরাজগণ বাঙলার প্রকৃত কর্তা হইল

মীরজাফর নামে মাত্র নবাব

মীরজাফরকে বাঙলার সিংহাসনে বসাইয়া ক্লাইব কঠোরহস্তে বাঙলা দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন মুঘলসম্রাটের পুত্র শাহ আলম্ অযোধ্যার নবাবের সহিত মিলিত হইয়া পাটনা আক্রমণ করিলেন। দুর্বলপ্রকৃতি মীরজাফর কিছু অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগকে ফিরাইতে মনস্থ করিলেন। ক্লাইব কিন্তু সেই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া অল্প কিছু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং মুঘলসৈন্যকে হটাইয়া দিলেন।

মীরজাফর দুর্বল ও অকর্মণ্য হইলেও ইংরাজদের প্রভুত্ব তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি চুঁচুড়ায় স্থিত ওলন্দাজদের সহিত ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ক্লাইব জানিতে পারিয়া ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিয়া এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, তাহারা সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই ক্লাইব বিলাতে চলিয়া গেলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৭৬০ খৃঃ)।

ক্লাইবের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

ক্লাইব চলিয়া যাইবার পরে, শাসনকার্যে বিশৃংখলা উপস্থিত হইল। কোম্পানির কর্মচারিগণ এবং তাহাদের এদেশীয় আমলারা পর্যন্ত লোকের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল এবং প্রজাগণের ধন-প্রাণ আর নিরাপদ রহিল না। কোম্পানির

অরাজকতা

কাউন্সিলের মেম্বারগণের মধ্যে দুই একজন ছাড়া সকলেই এ বিষয়ে বিশেষ অপরাধী ছিলেন। দেখিতে দেখিতে অসহায় নবাবের সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইল, কিন্তু তবুও ইংরাজ কর্মচারীর সমস্ত দাবি মিটিল না। ইহার ফলে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইল (১৭৬০)।

মীরকাসিমকে নবাবি প্রদান

ইংরাজদের সহিত মীরকাসিমের বিবাদ। মীরকাসিম একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি ইংরাজদের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া ইউরোপীয় প্রথায় একদল সৈন্য সুশিক্ষিত করিলেন এবং কঠোর মিতব্যয়িতা দ্বারা নানা উপায়ে নানা লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, নিজের কোষাগার পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। শীঘ্রই ইংরাজদের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশে কতকগুলি সুবিধাজনক সর্তে বাণিজ্য করিতে পারিত। যে সমুদয় বাণিজ্য দ্রব্য সমুদ্রপথে আমদানি বা রপ্তানি হইত, তাহার জন্য কোম্পানিকে কোনরূপ শুল্ক দিতে হইত না। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারিগণ, এমন কি, তাহাদের অধীন দেশীয় কর্মচারিগণ পর্যন্ত অন্তর্বাণিজ্য বিষয়েও ঐ সকল সুবিধার দাবি করিতে লাগিল। তাহাদের এই অন্যায় দাবির কোনও প্রতীকার করিতে না পারিয়া, মীরকাসিম এই বাণিজ্য-শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। এইরূপে দেশের অন্যান্য বণিক্‌গণের অবস্থা, ইংরাজ বণিক্‌গণের অবস্থার তুল্য হইল। এই ব্যবস্থা যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার

মীরকাসিমের স্বাধীনতা প্রয়াস

বাণিজ্যের শুল্ক লইয়া বিবাদ

করিতে পারিল না। কিন্তু ইংরাজের স্বার্থে আঘাত পড়ায় তাঁহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল; অবশেষে ইংরাজের পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেব জোর করিয়া পাটনা অধিকার করিলেন। নবাব এই স্পর্ধা সহিতে পারিলেন না। অনুচরগণসহ এলিস্ কারারুদ্ধ হইলেন। কোম্পানির কলিকাতাস্থ কাউন্সিল অমনি মীরকাসিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মীরকাসিমও যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতই ছিলেন। কিন্তু কাটোয়া ও ঘেরিয়ার যুদ্ধে পর পর পরাজিত হইয়া, ক্রোধান্ধ নবাব পাটনার বন্দীগণকে হত্যা করিলেন এবং উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার নিকট যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুজাউদ্দৌল্লা মীরকাসিমকে আশ্রয় দিলেন এবং বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে মেজর মনুরো কর্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন (অক্টোবর, ১৭৬৪ খৃঃ)।

এলিস্ সাহেবের পাটনা অধিকার

যুদ্ধ আরম্ভ

মীরকাসিমের পরাজয়

বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার নবাবের পরাজয়

মীরজাফর আবার নবাব হইলেন। মীরকাসিমের সহিত যুদ্ধ লাগিবামাত্র ইংরাজগণ মীরজাফরকে পুনরায় নবাব বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর পরলোক গমন করিলে, তাঁহার স্থানে তাঁহার পুত্রকে নবাব করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই ক্লাইব পুনরায় গবর্ণর হইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং দেশে সুশাসন ফিরাইয়া আনিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন।

ক্লাইবের প্রত্যাগমন

ক্লাইবের নূতন বন্দোবস্ত। ক্লাইব দেশরক্ষার নিমিত্ত সামরিক বিভাগের সুশৃংখলা করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি সুজাউদ্দৌল্লার সহিত সন্ধি করিলেন। সুজাউদ্দৌল্লা

অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি

এলাহাবাদ ও কোরা এই দুইটি জেলা ইংরাজের হাতে ছাড়িয়া দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। অতঃপর ক্লাইব বাঙলা দেশের নামত প্রভু দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের সহিত বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট্‌কে তিনি কোরা ও এলাহাবাদ জেলা দুইটি ছাড়িয়া দিলেন এবং বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব বাবদ বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পরিবর্তে শাহ আলম্ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন এবং বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত "উত্তর সরকার" নামক জিলা সমূহের অধিকারও ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন।

বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ

ক্লাইবের দ্বৈধশাসন প্রণালী। এ পর্যন্ত ইংরাজগণ বঙ্গশাসনের সমস্ত ক্ষমতা উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু শাসকের কোন দায়িত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহাতে দেশের সর্বনাশ হইতেছিল; ক্লাইব এইবার ইহার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করিলে, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হইত এবং নিকটবর্তী শক্তিসমূহ শংকিত হইয়া উঠিত। তাই তিনি এমন ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে বাহিরে পুরাতন শাসন প্রণালীই বজায় রহিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। এই দ্বৈধ শাসনপ্রণালী অনুসারে ইংরাজ কোম্পানি কর আদায় করিত, সম্রাট্‌কে ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিত, নবাবকে ৫০ লক্ষ টাকা পেন্‌সন দিত এবং দেশশাসনের অন্যান্য ব্যবস্থার নিমিত্ত খরচ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা

দ্বৈধ শাসন

নিজেরা গ্রহণ করিত। সৈন্য-সাহায্যে দেশরক্ষার ভারও কোম্পানির হাতেই ছিল। এইরূপে ইংরাজ কোম্পানি দেশের রাজস্ব ও সমর-বিভাগের কর্তা হইয়া দাঁড়াইল।

ক্লাইবের শাসন সংস্কার। এই ভাবে দেশশাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া ক্লাইব কোম্পানির আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে মনোযোগী হইলেন। মীরকাসিম যে কুপ্রথা বন্ধ করিতে গিয়া বাঙলার মস্‌নদ হারাইয়াছিলেন, ক্লাইব এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া দিলেন। কোম্পানির কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ও নজরগ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার মানসে ক্লাইব ব্যবস্থা করিলেন যে, কোম্পানির একচেটিয়া লবণের ব্যবসায়ের লাভের অংশ কোম্পানির কর্ম-চারিগণের মধ্যে বিতরিত হইবে। বিলাতের কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন না : তৎপরিবর্তে তাঁহারা কর্মচারিগণের বেতন বাড়াইয়া দিলেন। ক্লাইব সৈন্যদলের সংস্কার সাধনেও মনোযোগী হইলেন। পলাশির যুদ্ধের পরে সৈন্য-বিভাগের কর্মচারিগণকে 'ডবল ভাতা' নামে এক অতিরিক্ত কিন্তু অস্থায়ী ভাতা প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহারা কিন্তু ধরিয়া লইয়াছিল যে, এই ভাতা তাহারা চিরকালই পাইবে। তাই ক্লাইব যখন এই ভাতা উঠাইয়া দিলেন, তখন তাহারা ভয়ানক চটিয়া গিয়া একযোগে কর্ম ত্যাগ করিল। ক্লাইব সতর্কতা ও দৃঢ়তার সহিত এই বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং শীঘ্রই সৈন্যদলে শৃংখলা ফিরিয়া আসিল।

ডবল ভাতা

সামরিক সংস্কার

ক্লাইবের সামরিক প্রতিভা ও শাসন-কার্যে দক্ষতা। এই সকল সংস্কার সাধন করিয়া ক্লাইব স্বদেশে

ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার সমসাময়িকগণ তাঁহার গুণ ও কৃতিত্বের উপযুক্ত সমাদর করেন নাই, এবং তাঁহাদের নিন্দাবাদে অস্থির হইয়া অবশেষে ক্লাইব আত্মহত্যা পর্যন্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার যে প্রতিভা রণক্ষেত্রে ও শাসনকার্যে তুল্যরূপে বিকাশ পাইয়াছিল, ইতিহাস তাহার যথোচিত মর্যাদা দান করিয়াছে। ঘোর বিপদের দিনে কোম্পানি শুধু ক্লাইবের প্রতিভাবলে বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে। ক্লাইবের অসাধারণ প্রতিভাই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। ক্লাইব যাহাতেই হাত দিতেন, তাহাই ধৈর্য, সতর্কতা ও সাহসের সহিত সম্পাদন করিয়া তুলিতেন। যেরূপ কৌশলে ও দৃঢ়তার সহিত তিনি সহস্র বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণের অত্যাচার দমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগাইয়া তুলে। এক শ্রেণীর লেখকগণ ক্লাইবের দোষগুলিই বড় করিয়া দেখাইয়া থাকেন,—উমিচাঁদের সহিত জালসন্ধি, নবাবের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তৎকালে এই সমুদয় আচরণ সর্বসাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল ও তাদৃশ দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ক্লাইব ইংরাজ শাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। ক্লাইবের মত সুসন্তান সকল দেশেরই গৌরবের বিষয়।

ক্লাইবের অসাধারণ প্রতিভা

তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহস

তাঁহার কয়েকটি ত্রুটিবিচ্যুতি

বঙ্গে শাসন বিভ্রাট। ক্লাইবের স্বদেশ প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গের শাসনকার্যে আবার বিষম বিশৃংখলা লাগিয়া গেল। কোম্পানির কর্মচারিগণের শাসন বিষয়ে যোগ্যতা বিন্দুমাত্রও ছিল না, অথচ তাহাদের লোভ ছিল অপরিমিত। কোম্পানি

নামে দেওয়ান ছিল বটে, কিন্তু দেওয়ানির প্রকৃত কাজ করিতেন মুহম্মদ রেজা খাঁ এবং সিতাব রায় নামক দুই ব্যক্তি। ইঁহারা দুশ্চরিত্র ও অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং ইঁহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়া ইঁহাদিগকে শাসন করিতে পারে, এমন কেহই ছিল না। দ্বৈধ শাসন দেশে চলিল না এবং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (বাঙলা ১১৭৬ সন) যখন বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া গেল, তখন শাসনের বিশৃংখলা চরম সীমায় পৌঁছিল। কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষ এই ভয়ংকর ব্যাপারে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং স্থির করিলেন যে, অতঃপর রাজস্ব আদায়ের ভার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে নিবেন, এবং ঐ কাজ নিজেদের কর্মচারীদ্বারাই করাইবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌কে বঙ্গদেশের গবর্নর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

দ্বৈধ শাসনের বিফলতা

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের আগমন

প্রথম মহীশূর যুদ্ধ। মাদ্রাজেও বাঙলা দেশের মত বিশৃংখলা চলিতেছিল, অধিকন্তু সেই স্থানে ইংরাজগণ গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পতনের কালে, হায়দর নায়ক নামে এক ভাগ্যবান সৈনিক ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া অবশেষে মহীশূরের হিন্দু রাজাকে পদচ্যুত করিয়া নিজে মহীশূর অধিকার করিয়া বসেন (১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে)। এখন তাঁহার নূতন নাম হইল হায়দর আলি এবং তিনি মারাঠাদের ও নিজামের রাজ্যাংশ গ্রাস করিয়া মহীশূর রাজ্যের আয়তন অনেক বাড়াইয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহীশূর দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হইল। শীঘ্রই কোম্পানির মাদ্রাজ কাউন্সিলের অপদার্থ কর্মচারিগণ যুদ্ধের

হায়দর আলির অভ্যুদয়

জন্য যথাযোগ্যরূপে প্রস্তুত না হইয়াই, হায়দরের সহিত বিবাদ বাধাইয়া বসিল। হায়দর সম্পূর্ণ জয় লাভ করিয়া মাদ্রাজ সহরের নিকট পৌঁছিলেন এবং নিজের ইচ্ছামত সর্তে ইংরাজদিগকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন (১৭৬৯ খৃঃ)। ভারতবর্ষের কোন রাজার নিকট ইংরাজদিগকে পূর্বে কখনও এইরূপ অপদস্থ হইতে হয় নাই।

হায়দরের হস্তে ইংরাজের পরাজয়

সন্ধির একটি সর্ত ছিল যে, মারাঠাগণ অথবা নিজাম যদি হায়দরকে আক্রমণ করে তবে ইংরাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু মাদ্রাজের শাসন-পরিষদ্ এই সর্ত পালন করে নাই। এক বৎসর পরে যখন হায়দর মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তখন ইংরাজেরা কিছুই করিল না, এবং হায়দর এই যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। হায়দর ইংরাজগণের এই বিশ্বাসঘাতকতা কখনও ভুলেন নাই বা ক্ষমা করেন নাই। মাদ্রাজ গবর্নমেণ্টের এই অপরাধে, মহীশূর রাজ্যের সহিত ইংরাজদের ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিবাদ চলিয়াছিল।

ইংরাজদের বিশ্বাসঘাতকতা

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্

হেষ্টিংসের বিবিধ সংস্কার। গবর্নর হইবার পূর্বে হেষ্টিংস্ ক্লাইবের অধীনে কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। গবর্নর হইয়া তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কার্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি আসিয়াই মুহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে বরখাস্ত করিলেন এবং রাজস্ব সংগ্রহের ও ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচারের নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি ভূমির রাজস্ব নিলামে দিলেন, এবং যে সর্বাপেক্ষা উচ্চহারে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইল, তাহার সহিত পাঁচ বৎসরের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত করিলেন।

সিতাব রায় এবং রেজা খাঁর পদচ্যুতি

প্রত্যেক জিলায় তিনি একটি দেওয়ানি এবং একটি ফৌজদারি আদালত স্থাপিত করিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত প্রতি জিলায় যে ইংরাজ কর্মচারী থাকিতেন, তিনিই দেওয়ানি আদালতের বিচার কার্যও করিতেন। ফৌজদারি আদালতে এদেশীয় লোকই বিচারক নিযুক্ত হইতেন। রাজধানী কলিকাতায় দেওয়ানি বিচারের জন্য সদর দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি বিচারের জন্য সদর নিজামত আদালত নামে দুইটি আপিল আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। গবর্নরই সদর দেওয়ানি আদালতের অধ্যক্ষ ছিলেন। সদর নিজামত আদালতে একজন মুসলমান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। রাজস্ব-বিভাগের প্রধান আফিসও মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল।

ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠা

হেষ্টিংসের অর্থাভাব। হেষ্টিংস্‌ এইবার কোম্পানির অর্থাভাব দূর করিতে মনোযোগী হইলেন। কোম্পানির প্রচুর ঋণ হইয়া পড়িয়াছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ও কুশাসনের ফলে রাজস্ব রীতিমত আদায় হইতেছিল না। কোম্পানির বিলাতের কর্তৃপক্ষগণেরও তখন বিলক্ষণ অর্থাভাব, তাই ভারতে অর্থ-সাহায্য পাঠান তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

হেষ্টিংসের অর্থাভাব দূর করিবার চেষ্টা। এই দুঃসময়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য হেষ্টিংস্‌ দায় ঠেকিয়া কতকগুলি অন্যায় ও গর্হিত উপায় অবলম্বন করেন।

~~পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে,~~ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব কোরা ও এলাহাবাদ জিলা দুইটি সম্রাট্‌ শাহ্‌ আলমকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সম্রাট্‌ মারাঠাদের দলে যোগ দিয়াছেন, এবং ঐ জিলা দুইটি মারাঠাদিগকে দিয়াছেন, এই অজুহাতে হেষ্টিংস্‌ এখন এই সকল সর্ত পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি সম্রাটের বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং ঐ জিলা দুইটি ফিরাইয়া আনিয়া উহাদের পূর্বেকার মালিক অযোধ্যার নবাবের নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেন। বাঙলার নবাবের বাৎসরিক বৃত্তিও তিনি কমাইয়া অর্ধেক করিয়া দিলেন।

সম্রাটের রাজস্ব বন্ধ

অযোধ্যার নবাবকে কোরা ও এলাহাবাদ বিক্রয়

রোহিলা যুদ্ধ। রোহিলখণ্ড স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অযোধ্যার নবাবের বিশেষ অভিলাষ ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য অযোধ্যার নবাব হেষ্টিংসের নিকট একদল ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য চাহিলেন, এবং এই সৈন্যদলের

সম্পূর্ণ ব্যয় ও তদুপরি ৪০ লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন। হেষ্টিংস্ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং একদল বৃটিশ সৈন্য পাঠাইলেন। ইহাদের সহায়তায় অযোধ্যার নবাব রোহিলখণ্ড জয় করিলেন। হেষ্টিংসের এই সকল কার্যের অনেকেই অতিশয় নিন্দা করিয়াছেন। অর্থসংগ্রহ লালসায় তিনি সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং একটি নিরপরাধ স্বাধীন জাতিকে অধীনতা-শৃংখলে বাঁধিবার জন্য বৃটিশ সৈন্য ভাড়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক হেষ্টিংসের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইল। দুই বৎসরের মধ্যেই কোম্পানির সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গেল, এমন কি, তহবিলে কিছু অর্থও সঞ্চিত হইল।

রোহিলাদের স্বাধীনতা নাশ

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আইন। এই সময়ে কোম্পানির ভারতীয় রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টের নূতন এক আইনদ্বারা আমূল পরিবর্তিত হয়। এই আইনের নামই নর্থের রেগুলেটিং আইন (১৭৭৩ খৃঃ)। এই আইন দ্বারা কোম্পানির অধিকৃত ভারতের শাসন একজন বড় লাট (গবর্ণর জেনারেল) এবং চারিজন সদস্যযুক্ত এক শাসন-পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়। বাঙলার গবর্নর এই পরিষদের সভাপতি এবং বড়লাট বলিয়া বিঘোষিত হন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবর্নর এবং শাসন-পরিষদ্ বাঙলার গবর্নর ও শাসন-পরিষদের অধীন হইল। কোম্পানির কর্মচারিগণের অপরাধের বিচার করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় একটি উচ্চ আদালত (সুপ্রিম কোর্ট) প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি এবং অপর তিনজন নিম্নতর বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন।

আইনের বিধি

এই নূতন আইনে বাঙলার লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ই বড়লাট হইলেন এবং ফ্রান্সিস্, মন্সন্, ক্লেভারিং ও বার্ওয়েল্কে লইয়া

নূতন আইনের প্রচলন

নূতন শাসন-পরিষদ্ গঠিত হইল। এই চারিজনের মধ্যে কেবলমাত্র বারওয়েলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। অপর তিনজন সদ্য সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ন্যায়-অন্যায় ধারণা হেষ্টিংসের ধারণা হইতে একেবারে ভিন্ন ছিল। সুপ্রিম কোর্ট নামক উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে কিন্তু হেষ্টিংসের বন্ধু ছিলেন।

নূতন শাসন ব্যবস্থার ফলাফল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইল। প্রথম হইতেই ইংলণ্ড হইতে আগত নূতন তিনজন শাসন-পরিষদের সভ্য হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে লাগিলেন এবং তাঁহার অতীতের কার্যাবলী ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তাবিত কার্যসমূহের ঘোরতর নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরস্পরের মধ্যে রেষারেষির ফলে, দেশের শাসনকার্যের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। এই নূতন সভ্যগণ অযোধ্যা রাজ্য সম্বন্ধে হেষ্টিংসের নীতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌল্লার মৃত্যু হইলে তাঁহার মাতা ও বিধবা পত্নী তাঁহার সঞ্চিত ধনের প্রধান অংশ এবং অনেকগুলি বড় বড় জমিদারির রাজস্ব দাবি করিলেন। হেষ্টিংসের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও এই নূতন সভ্যগণ অযোধ্যার বেগমগণের দাবি মঞ্জুর করিলেন। অযোধ্যার নূতন নবাব আসফউদ্দৌল্লার নিকট হইতে তাঁহারা তাঁহার অধীনস্থ বারাণসী প্রদেশ কাড়িয়া লইলেন, এবং তিনি যে বৃটিশ সৈন্যদলের খরচ যোগাইতেছিলেন, সেই খরচের পরিমাণও বৃদ্ধি করিলেন।

হেষ্টিংসের সঙ্গে নূতন সভ্যগণের বিরোধ

অযোধ্যার নবাবের সহিত ব্যবস্থা

হেষ্টিংসের সহিত নূতন সভ্যগণের বিরোধের সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ আসিতে

লাগিল। এই সকল অভিযোগের মূল কথা এই যে, হেষ্টিংস্ নানা ব্যাপারে অনেক টাকা ঘুষ লইয়াছেন। মহারাজা নন্দকুমারের অভিযোগই ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। নন্দকুমার শাসন-পরিষদের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, হেষ্টিংস্ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার অভিযোগের প্রমাণস্বরূপ তিনি লিখিত দলিলপত্র হাজির করিলেন। নূতন সভ্যগণ নন্দকুমারের পক্ষ লইলেন, কিন্তু হেষ্টিংস্ এই অভিযোগ শাসন-পরিষদে উত্থাপিত হইতে দিলেন না। অবশেষে হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করিলেন। এই সময়ে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি উচ্চ আদালতে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল করার অভিযোগ আনয়ন করিল। আদালতের বিচারে নন্দকুমার দোষী স্থির হইলেন এবং তৎকালে প্রচলিত ইংরাজী আইন অনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল।

হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

জালের অভিযোগে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড

এইরূপে নন্দকুমার অপসৃত হইলে হেষ্টিংস্ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, হেষ্টিংস্ই মোহনপ্রসাদকে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছিলেন, এবং উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ইম্পে হেষ্টিংসের বন্ধু ছিলেন বলিয়াই নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারে হেষ্টিংস্ ও ইম্পে সমসাময়িক এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক কঠোরভাবে নিন্দিত হইয়াছেন। আবার আধুনিক কালের কোনও কোনও লেখকের মত এই যে, এই ব্যাপারে এই দুই জনের কাহারও কোন দোষ ছিল না। ৮০

হেষ্টিংস ও ইম্পের দায়িত্ব সমালোচনা

নূতন ব্যবস্থার আর এক অসুবিধা। শাসন-পরিষদের নূতন সভ্যগণের সহিত হেষ্টিংসের বিরোধ আরও এক বৎসরকাল

চলিয়াছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মন্‌সনের মৃত্যুতে এবং আরও এক বৎসর পরে ক্লেভারিংএর মৃত্যুতে হেষ্টিংস্ আবার স্বাধীনভাবে পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিলেন। কিন্তু শীঘ্রই উচ্চ আদালতের সহিত হেষ্টিংসের বিরোধ বাধিয়া গেল। এই আদালতের প্রধান বিচারপতি মনে করিতেন যে, ভারতে বিচার বিষয়ে তাঁহারই সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং সমস্ত মোকদ্দমার শেষ বিচার এই আদালতেই হইবে। যে কোনও সামান্য অভিযোগে যে কোন ভারতবাসী বা কোম্পানির কর্মচারী যে কোনও স্থান হইতে এই আদালতের আদেশে কলিকাতা আসিতে বাধ্য হইত। অবশেষে হেষ্টিংস্ বড়লাটরূপে ভারতশাসন-পরিষদের ক্ষমতাই সর্বোচ্চ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং উচ্চ আদালতের আদেশ মান্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এইরূপ গোলযোগ কিছুকাল ধরিয়া চলিল; অবশেষে হেষ্টিংস্ এক উপায় বাহির করিলেন। তিনি ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আদালতেরও প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার জন্য ইম্পের পৃথক্ বেতন নির্দিষ্ট হইল। ইম্পে এই পদ গ্রহণ করায় সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল। এই ব্যাপার সাধারণত ইম্পের উৎকোচ গ্রহণ বলিয়া গণ্য করা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষগণ এই ব্যাপারের গুরুতর নিন্দাবাদ করেন এবং এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া দেন।

শাসন-পরিষদ ও আদালতের বিরোধ

হেষ্টিংসের ব্যবস্থায় বিরোধের অবসান

কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় এবং নানাবিধ সংকটে হেষ্টিংস্ অদ্ভুত ধৈর্য, বুদ্ধি-কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। এই সময়ে মহীশূর এবং মহারাষ্ট্র ভারতের এই দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তির সহিত যুদ্ধেও তাঁহার ঐ সকল গুণ প্রভূত পরিমাণে দেখা গিয়াছিল।

মারাঠাগণ। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খৃঃ) নিদারুণ পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দমিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় নাই। পরাজয়ের সংবাদে বালাজী রাও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় পুত্র মাধব রাও পেশোয়া হইলেন। নূতন পেশোয়া অল্পবয়স্ক হইলেও শাসনকার্যে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন এবং পেশোয়া-বংশের বিনষ্ট গৌরব ও শক্তি অনেক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইলেন। তিনি হায়দর আলিকে দুইবার পরাজিত করিলেন এবং ভোঁস্‌লা যে সমস্ত জায়গা জোর করিয়া দখল করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিলেন। এই নবীন পেশোয়ার খুল্লতাত এবং অভিভাবক রঘুনাথ রাও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন, কিন্তু পেশোয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াও ক্ষমা করিলেন।

পেশোয়া মাধব রাওর বিচক্ষণতা

এইরূপে নিজের রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া, এই নবীন পেশোয়া উত্তর ভারতে বিনষ্ট মারাঠা-সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মারাঠাসৈন্য রাজপুত ও জাঠদিগকে পরাজিত করিয়া কর দিতে বাধ্য করিল। অতঃপর মারাঠাগণ দিল্লী অধিকার করিয়া শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইল। তাহারা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াবপ্রদেশ অধিকার করিয়া অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর মাধব রাওর মৃত্যু হওয়ায় তাহারা দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

মারাঠা সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

মাধব রাওর মৃত্যু

মারাঠা রাজ্যে বিশৃংখলা। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধেও মারাঠা সাম্রাজ্যের যে ক্ষতি হয় নাই, মাধব রাওর মৃত্যুতে

তাহা হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই বিশৃংখলা ও অনৈক্যে মারাঠা সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, এবং মারাঠা জাতির ভারতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া গেল। মাধব রাওর মৃত্যুর পরে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হইলেন (ডিসেম্বর, ১৭৭২)। কিন্তু খুল্লতাত রঘুনাথ রাওর চক্রান্তে তিনি নিজের প্রাসাদেই ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন (অগষ্ট, ১৭৭৩)। এই দুর্বৃত্ত রঘুনাথ তখন নিজকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু নারায়ণ রাওর গর্ভবতী বিধবা পত্নী মাধব রাও নারায়ণ নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন (এপ্রিল, ১৭৭৪), এবং এই শিশুই প্রকৃত পেশোয়া বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। মারাঠা নায়কগণ কেহ রঘুনাথের পক্ষে, কেহ বা শিশু মাধব রাও নারায়ণের পক্ষে যোগ দিলেন। মাধব রাও নারায়ণের পক্ষে প্রধান নায়ক ছিলেন নানা ফার্নবিশ নামে এক ব্রাহ্মণ। ইঁহার মত কূটনীতিজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক মারাঠা রাজ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না।

রঘুনাথ রাও কর্তৃক নূতন পেশোয়া নারায়ণ রাওর হত্যা

নারায়ণের শিশু পুত্র মাধব রাও নারায়ণ

নানা ফার্নবিশ

সুরাটের সন্ধি। অশুভক্ষণে রঘুনাথ ইংরাজদের সহিত যোগদান করিয়া নিজের বল বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বোম্বাই গবর্নমেণ্ট সল্‌সেটি দ্বীপ, বেসিন বন্দর এবং বোম্বাইর নিকটবর্তী আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিকার পাইলে রঘুনাথকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। রঘুনাথ এই সকল সর্তে স্বীকৃত হইয়া সুরাটের সন্ধি করিলেন (৬ই মার্চ্চ, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ)। মারাঠা নায়কগণের মধ্যে সিন্ধিয়া এবং হোল্‌কার মাধব রাও নারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গাইকোয়াড় পরিবারের কতক তাঁহার পক্ষে ও কতক রঘুনাথের পক্ষে রহিলেন।

ইংরাজদের সহিত রঘুনাথের সন্ধি

পুরন্দরের সন্ধি। দুই পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু কোন পক্ষই পুরাপুরি জয়লাভ করিতে পারিল না। এই সময়ে কলিকাতা শাসন-পরিষদে মারাঠাদের সহিত বোম্বাই গবর্নমেণ্টের সন্ধির ব্যাপার লইয়া ঘোর তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। নর্থের রেগুলেটিং আইন অনুসারে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্নমেণ্ট কলিকাতা শাসন-পরিষদ্‌ও বড়লাটের অধীন ছিল এবং কলিকাতা শাসন-পরিষদকে জিজ্ঞাসা না করিয়া মারাঠাদের সহিত সন্ধি করা বোম্বাই গবর্নমেণ্টের ক্ষমতার বাহিরে ছিল। যাহা হউক, এখন আর ফিরিবার সময় নাই দেখিয়া হেষ্টিংস্ ঐ সন্ধি মানিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কোম্পানির রাজ্য-পরিচালনের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় যেমন নূতন সদস্যগণ হেষ্টিংসের বিধান অনুমোদন করেন নাই, এই বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তাঁহারা সুরাটের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া, মাধব রাও নারায়ণের পক্ষের সহিত সন্ধি করিবার জন্য কর্নেল আপ্‌টনকে পুনায় পাঠাইয়া দিলেন। আপ্‌টন পুরন্দরের ~~সুহিত~~ সন্ধি করিয়া ইংরাজ কোম্পানির জন্য সল্‌সেটি লাভ করিলেন (১লা মার্চ্চ, ১৭৭৬ খৃঃ)।

সুরাটের সন্ধিতে দোষ

শাসন পরিষদ্ কর্তৃক সুরাট সন্ধি অগ্রাহ্য

পুরন্দরের সন্ধি

বিবাদের পুনরারম্ভ। সুরাটের সন্ধি অগ্রাহ্য করায় বোম্বাই গবর্নমেণ্ট ভয়ংকর চটিয়া গেল। তাহারা নূতন সন্ধি তো মানিলই না, বরং উহার সর্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া রঘুনাথ রাওকে বোম্বাইতে আশ্রয় প্রদান করিল। অল্পকাল পরেই কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষগণ সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন। এইবার রঘুনাথ রাওকে বোম্বাই নগরীতে প্রকাশ্যে অভ্যর্থনা করিয়া লওয়া হইল, এবং তাঁহার উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি স্থির হইল।

এদিকে পুনার মারাঠা নায়কগণের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল। বোম্বাই গবর্নমেণ্ট মনে করিল, রঘুনাথকে পেশোয়া পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার এই উত্তম সুযোগ। এই সময়ে শাসন-পরিষদের দুইজন সদস্যের মৃত্যুতে হেষ্টিংস্ স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিতে পারিতেছিলেন। তিনিও বোম্বাই গবর্নমেণ্টের এই অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিলেন এবং বোম্বাই হইতে পুনার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল (ডিসেম্বর, ১৭৭৮ খৃঃ)।

প্রথম মারাঠা যুদ্ধ। বৃটিশ সৈন্য পুনার কুড়ি মাইলের মধ্যে যাইয়া পৌছিলে, একদল প্রবল মারাঠা সৈন্য তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল। বৃটিশ সৈন্য অমনি পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল; কিন্তু মারাঠাগণ ওয়ারগাঁও নামক স্থানে তাহাদিগকে চারিদিক হইতে এমন করিয়া ঘিরিয়া ধরিল যে, অত্যন্ত অসম্মানজনক সর্তে সম্মত হইয়া ইংরাজদিগকে সন্ধি করিতে হইল (জানুয়ারি, ১৭৭৯)। সন্ধির সর্ত হইল, ইংরাজদিগকে রঘুনাথের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইবে,এবং এযাবৎ তাহারা মারাঠাগণের নিকট হইতে যাহা কিছু লইয়াছে, সে সমস্তই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ওয়ারগাঁওয়ের চুক্তি

কিন্তু বৃটিশ সৈন্য নিরাপদে বোম্বাইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র, বোম্বাই গবর্নমেণ্ট এই অপমানজনক ওয়ারগাওয়ের বন্দোবস্ত অস্বীকার করিল এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল।

চুক্তি অস্বীকার

বাঙলা দেশে হেষ্টিংস্ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি গডার্ড নামক একজন সেনাপতির অধীনে পূর্বেই বঙ্গদেশ হইতে বোম্বাইতে একদল সেনা পাঠাইয়াছিলেন। এই সেনা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুরাট পৌছিল। গডার্ড সেখানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর

পরস্পরের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন, এই সর্তে গাইকোয়াড়ের সহিত এক সন্ধি করিলেন (জানুয়ারি, ১৭৮০ খৃঃ)। সিন্ধিয়া এবং হোল্‌কারের অসতর্কতা নিবন্ধন গডার্ড আহম্মদাবাদ ও বেসিন অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। গডার্ড এইবার পুনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু শীঘ্রই মারাঠাদিগের সহিত সংঘর্ষে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। এদিকে হেষ্টিংস্ পপ্‌হাম নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে সিন্ধিয়ার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ইহাতে কতক মারাঠা সৈন্যের লক্ষ্য অন্যদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় গডার্ডের অনেক সুবিধা হইল। পপ্‌হাম গোয়ালিয়রের দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিলেন। তখন সিন্ধিয়া নিজে ইংরাজদের সহিত পৃথক্ সন্ধি করিলেন এবং তাঁহার মধ্যবর্তিতায় ইংরাজ ও মারাঠা সরকারের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি সাল্‌বাই-এর সন্ধি নামে খ্যাত। ইহাতে পুরন্দরের সন্ধির পরে ইংরাজগণ যত জায়গা জয় করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই ফিরাইয়া দিতে হইল এবং রঘুনাথ রাও বাৎসরিক মাত্র তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ স্থির হইল।

গাইকোয়াড়ের সহিত সন্ধি

সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি

সাল্‌বাইয়ের সন্ধিতে প্রথম মারাঠা যুদ্ধ শেষ

দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ। হায়দর আলি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইংরাজগণের প্রতি কিরূপ মর্মান্তিক ঘৃণা পোষণ করিতেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজামও ইংরাজদিগের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, কারণ মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট নিজামের সহিতও সদ্ব্যবহার করে নাই। যখন ইংরাজগণ প্রথম মারাঠা যুদ্ধে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল, এবং যখন ইংরাজ ও ফরাসিতে ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন নিজাম, হায়দর আলি এবং

নাগপুরের ভোঁস্‌লা মিলিয়া পরামর্শ স্থির করিলেন যে, তাঁহারা তিনজনে একযোগে মাদ্রাজ ও বাঙলায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবেন। পরামর্শ অতি উত্তমই হইয়াছিল, কিন্তু কখনও কার্যে পরিণত হয় নাই। হেষ্টিংস্‌ অর্থদ্বারা ভোঁস্‌লাকে, এবং 'গণ্টুর' নামক স্থান প্রদান করিয়া নিজামকে বশ করিলেন। ফলে নিজাম বা ভোঁস্‌লা কেহই পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করিলেন না এবং প্রকৃতপক্ষে একা হায়দর আলিকেই যুদ্ধ করিতে হইল।

নিজাম, ভোঁস্‌লা ও হায়দর আলির সন্ধি

পূর্বে হায়দর মারাঠাদের হস্তে পরাজিত হইলেও, মারাঠা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে নিজের বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি নিজের রাজ্যের আয়তনও বৃদ্ধি করিলেন, এবং ক্রমশ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত ভূভাগ তাঁহার করতলগত হইল। অধিকন্তু তাঁহার সৈন্যদল অতিশয় সুশিক্ষিত ছিল, এবং তিনি তখন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিসমূহের অন্যতম ছিলেন।

হায়দরের সামরিক শক্তি

মালাবার উপকূলে ফরাসি-অধিকৃত মাহে লইয়া প্রথম বিবাদ আরম্ভ হয়। ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিতে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজগণ মাহে অধিকার করিতে চাহিলেন। কিন্তু হায়দর অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, মাহে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত এবং তাঁহার আশ্রয়াধীনে আছে। হায়দরের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া ইংরাজগণ মাহে অধিকার করিলেন। ইহার অল্প পরেই পূর্বোল্লিখিত ইংরাজদের বিরুদ্ধে মিলিত শক্তিত্রয়কর্তৃক আক্রমণের প্রস্তাব করিয়া নিজাম দূত পাঠাইলেন। হায়দর কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার সৈন্যদল ভীষণ ঘূর্ণিবায়ুর মত কর্ণাটের উপর নিপতিত

যুদ্ধের কারণ

হইল। মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট চিরদিনই ঝগড়া বাধাইতে অত্যন্ত পটু ছিল, কিন্তু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে জানিত না। এই ভয়ংকর যুদ্ধের সম্পূর্ণ বেগ উহাকেই সামলাইতে হইল। দেড়মাস কাল হায়দরের সৈন্যগণ কামান ও তরবারির সাহায্যে কর্ণাট দেশ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল এবং লুণ্ঠন করিতে করিতে তাহারা প্রায় মাদ্রাজ নগরীর নিকট পর্যন্ত পৌছিল। মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট হায়দরকে কোন প্রকার বাধা দিতে পারিল না। এই সময়ে বেইলী নামক এক সেনাপতির অধীনে উত্তরদিক হইতে একদল ইংরাজসৈন্য মাদ্রাজ সৈন্যের সহিত যোগ দিতে আসিতেছিল। হায়দর ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইয়া দুইদলে যোগ দিবার পূর্বেই বেইলীর সৈন্যদল ধ্বংস করিলেন (১৭৮০)। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে হায়দরের পুত্র টিপু তাঞ্জোর প্রদেশে কর্ণেল ব্রেথওয়েটের সৈন্যদলকেও এইরূপে ধ্বংস করেন।

হায়দরের ইংরাজ রাজ্য লুণ্ঠন

হায়দরের আক্রমণের সংবাদ বাঙলা দেশে পৌছিবামাত্র হেষ্টিংস্ সার্ আয়ার কুট্‌কে মাদ্রাজে প্রেরণ করিয়া নষ্টগৌরব কিয়ৎপরিমাণে পুনরুদ্ধার করিলেন। অবশেষে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হায়দর আলির মৃত্যুতে যুদ্ধের বেগ অনেকটা কমিয়া গেল।

হায়দরের মৃত্যু

হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ইংরাজের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে বহুদিনব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট টিপুর নিকট সন্ধি ভিক্ষা করিল। নানারূপ অপমান সহ্য করিয়া বৃটিশ দূতগণ অনেক কষ্টে টিপুর সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ)। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থানগুলি ফিরাইয়া দিবে এই সর্তে মঙ্গালোরের সন্ধি হইল।

টিপু সুলতান

মঙ্গালোরের সন্ধি

এইরূপে ভারতে বৃটিশ-শক্তি এক গুরুতর সংকট হইতে রক্ষা পাইল এবং হেষ্টিংসের বুদ্ধি-কৌশল, উদ্যোগ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণেই ইহা সম্ভবপর হইল। তিনি ভোঁস্‌লা ও নিজামকে হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করাইতে এবং সিন্ধিয়াকে নিজের পক্ষে আনিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কূট রাজনীতি-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

হেষ্টিংসের রাজনৈতিক কৌশলের জয়

হেষ্টিংসের অর্থাভাব এবং কোষাগার পূরণের চেষ্টা। এই সকল সুদীর্ঘ যুদ্ধে হেষ্টিংসের কোষাগার শূন্য হইয়া গিয়াছিল এবং অর্থাগমের উপায়গুলিও প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। বাধ্য হইয়া আবার তাঁহাকে অর্থসংগ্রহের জন্য নীতিবিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিতে হইল।

অযোধ্যার নবাব। অযোধ্যার নবাবের সহিত আবার নূতন বন্দোবস্ত হইল। হেষ্টিংস্ নবাবের একদল সৈন্য বৃটিশ কর্মচারীদ্বারা সুশিক্ষিত করিবার ভার নিলেন। ইহার খরচের জন্য নবাব কতকগুলি জিলার রাজস্ব ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। অযোধ্যা যে পরিণামে ইংরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল, এইরূপ সূক্ষ্মভাবেই তাহার প্রথম সূচনা হয়। অবশ্য হেষ্টিংস্‌কে এ ব্যাপারে দোষী করা যায় না। কারণ, নবাব স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অযোধ্যার নবাবের সহিত নূতন বন্দোবস্ত

চৈৎসিংহ। অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় হেষ্টিংস্ অতঃপর যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সমর্থন করা কঠিন। নূতন শাসন-পরিষদ্ যে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে বারাণসী কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ ইংরাজ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব রীতিমত দিতেন

এবং হেষ্টিংসের দাবি অনুসারে বাৎসরিক পাঁচলক্ষ টাকা অতিরিক্তও দিয়াছিলেন। কিন্তু এই দাবি মিটাইয়া দিবামাত্র হেষ্টিংস্ তাঁহাকে একদল অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। রাজা উহা দিতে সমর্থ হইলেন না এবং এই অপরাধে হেষ্টিংস্ তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। এই অন্যায় দাবি আবার অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত আদায় করিতে চেষ্টা করা হইল। হেষ্টিংস্ বারাণসী গিয়া রাজাকে তাঁহার নিজের প্রাসাদে বন্দী করিলেন। রাজার সৈন্যগণ যে এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই ছিল না। হেষ্টিংসের সঙ্গে যে সৈন্য গিয়াছিল, তাহারা রাজার সৈন্যগণের হস্তে নিহত হইল। হেষ্টিংস্ কোন মতে প্রাণ লইয়া চুনারে পলাইয়া গেলেন। বিদ্রোহ তখন সমস্ত জিলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হেষ্টিংস্ শীঘ্রই এই বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিলেন। হতভাগ্য চৈৎসিংহ বুন্দেলখণ্ডে পলাইয়া গেলেন এবং কাশীর সিংহাসনে একজন নূতন রাজা স্থাপিত হইলেন।

চৈৎসিংহের উপর অন্যায় দাবি

মিটাইতে অক্ষমতা

চৈৎসিংহ বন্দী

পলায়ন

অযোধ্যার বেগম। হেষ্টিংসের পরবর্তী কার্যটি আরও ভয়ংকর। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অযোধ্যার বেগমগণ অযোধ্যার মৃত নবাবের উত্তরাধিকারসূত্রে বিস্তর ধনসম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন, এবং কলিকাতা শাসন-পরিষদের সহায়তায়ই তাঁহারা ঐ সকল সম্পত্তিতে নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ যখন অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে তাঁহার প্রতিশ্রুত অর্থ দাবি করিলেন, তখন নবাব উত্তর করিলেন যে, তাঁহার পিতার সম্পত্তির অধিকাংশ তাঁহার মাতা ও পিতামহীর

হস্তে পড়াতে, তাঁহার নিজের কোষাগার শূন্য, অতএব তিনি ইংরাজদিগকে নিজের প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস্ যে কেবল শাসন-পরিষদের প্রতিশ্রুতির কথাই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন, তাহা নহে, সাধারণ ভদ্রতা ও ইউরোপীয়গণের জাতিগত বৈশিষ্ট্য স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানের ভাবও তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেন। তিনি বেগমদের ধনসম্পত্তি জোর করিয়া দখল করিতে অযোধ্যার নবাবকে আদেশ প্রদান করিলেন, এবং যাহাতে কোনও বাধা উপস্থিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে নিজের একদল সৈন্য নবাবের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। হেষ্টিংসের জ্ঞাতসারে এবং তাঁহার অনুমতিক্রমেই বেগমদের উপর ঘোর নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হইল, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বিপুল ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইল।

হেষ্টিংসের অনুমোদনে বেগমদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন

হেষ্টিংসের কার্যের ফলাফল। এই প্রকার ঘোর অন্যায় অত্যাচারে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস আর কখনও কলংকিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এই সকল কার্যের বিবরণ ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র, হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চৈৎসিংহের প্রতি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিতে হেষ্টিংসের উপর আদেশ আসিল। এমন কি, সর্বপ্রকারে হেষ্টিংসের অনুগত শাসন-পরিষদও এতকাল পরে আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই সকল গোলযোগে হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

হেষ্টিংসের পদত্যাগ

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ নূতন আইন—পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্, হেষ্টিংসের শীঘ্র পদত্যাগের আরও একটি কারণ। ইহার পূর্ব বৎসর বৃটিশ রাজমন্ত্রী ফক্স ভারত-শাসনের ভার কোম্পানির হাত হইতে উঠাইয়া একজন বৃটিশ

মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব সম্বলিত এক আইন বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টে উপস্থিত করিয়াছিলেন। উহা তখন পাশ না হওয়াতে হেষ্টিংস্ আনন্দিতই হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ মন্ত্রী পিট যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, তাহার সহিত ফক্সের প্রস্তাবিত আইনের বিশেষ বিভিন্নতা ছিল না। এই আইনের বলে বিলাতে বোর্ড অব্ কন্ট্রোল নামে ইংরাজ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ এক শাসন-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং কোম্পানিকে স্থায়ীভাবে ও সম্পূর্ণরূপে এই পরিষদের অধীন করা হইল। এই পরিষদের সমস্ত ক্ষমতা শীঘ্রই উহার সভাপতির উপর ন্যস্ত হইয়া গেল। বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতি অতঃপর ভারতীয় ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষের হাতে সামান্য সামান্য ক্ষমতামাত্র রহিল।

ভারতশাসনের ক্ষমতা কোম্পানির হস্ত হইতে অপসৃত

নর্থের রেগুলেটিং আইনের ত্রুটিতে ভারত-শাসনের যে সমস্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত ত্রুটি-সংশোধনার্থ পিটের আইন এবং অন্যান্য যে সকল আইন প্রণীত হয়, তাহাদ্বারা এই সময়ে আরও কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উপরে সপারিষদ্ বড়লাটের ক্ষমতা আরও বাড়ান হয় এবং উচ্চ আদালতের ক্ষমতার সীমাও পরিষ্কাররূপে নির্দিষ্ট হয়। আবশ্যক হইলে বড়লাট শাসন-পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়াও নিজ দায়িত্বে কার্য করিতে পারিবেন, এরূপ বিধানও করা হয়।

অন্যান্য পরিবর্তন

হেষ্টিংসের শেষজীবন। হেষ্টিংস ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলে, তাঁহার ভারতশাসনকালীন নানাবিধ অন্যায় কার্যের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইল অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে

গুরুতর অভিযোগের বিষয় ছিল তিনটি—রোহিলা জাতির ধ্বংস, চৈৎসিংহের উপর অত্যাচার এবং অযোধ্যার বেগমদের সম্পত্তি লুণ্ঠন। অবশেষে বিলাতে হাউস্ অব লর্ডসের সম্মুখে হেষ্টিংসের বিচার (Impeachment) হয়, এবং হাউস্ অব্ কমন্স বাদী হইয়া হেষ্টিংসের অপরাধ বর্ণনা করে। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বার্ক, শেরিডন্ ইত্যাদির অগ্নিগর্ভ জ্বালাময়ী বক্তৃতা হেষ্টিংসের এই বিচারকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সাত বৎসর ধরিয়া এই বিচার চলে, এবং বিচারান্তে হেষ্টিংস সমস্ত অভিযোগে নির্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করেন (১৭৯৫ খৃঃ)। ইহার পর হেষ্টিংস আরও ২৩ বৎসরকাল বাঁচিয়া ছিলেন এবং ৮৫ বৎসর বয়সে ১৮১৮ খৃঃ পরলোক গমন করেন।

হেষ্টিংসের বিচার

নির্দোষ বলিয়া খালাস

হেষ্টিংসের চরিত্র। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী মতসমূহ প্রচলিত আছে। বাগ্মীবর বার্ক, বিখ্যাত লেখক মেকলে ও ঐতিহাসিক মীল হেষ্টিংসকে বহু নিন্দা করিয়াছেন। এদিকে আধুনিক কয়েকজন লেখকের মতে হেষ্টিংসের কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র অপরাধ নাই এবং ইংরাজ ভারত-শাসকগণের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে, প্রকৃত সত্য সম্ভবত এই দুই মতের মধ্যবর্তী। এই যুগের ইতিহাস যাঁহারা সযত্নে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, হেষ্টিংস্ অনেক সময়েই অসাধারণ কর্মকুশলতা ও রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকিলে বৃটিশের সম্ভ্রম ও রাজশক্তি যে গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইত, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিসমূহ একযোগে বৃটিশ শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত

হেষ্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে বিভিন্নমত

গুণাবলী

হইয়াছিল। সেই ঘোর দুর্দিনে শুধু হেষ্টিংসের বুদ্ধিবলে বৃটিশ রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল। তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, অনন্যসাধারণ কর্ম-কুশলতা এবং ভারতীয় সর্ববিধ বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল বলিয়াই তিনি অসংখ্য কঠোর বিপদ হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন। যে বিপদ-সাগরে অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিয়া তিনি পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট যে কোন শাসনকর্তা তাহাতে ডুবিয়া মরিত, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দোষসমূহ

অপরদিকে আবার হেষ্টিংসের দোষ-ত্রুটিসমূহ উপেক্ষা করাও অসম্ভব। চরিত্রের যে সমস্ত উদার গুণ না থাকিলে কোন দেশ-শাসকই মহত্ত্বের দাবি করিতে পারেন না, হেষ্টিংসের সেই সকল গুণের একান্ত অভাব ছিল। রাজ্যের মঙ্গল চিন্তায় তিনি এত বিভোর থাকিতেন যে, অন্যের গুরুতর অমঙ্গল, অনিষ্ট ও ক্লেশ হইলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য-প্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য না হইলে দয়া, মায়া বা স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ইত্যাদি মনুষ্যত্ববাচক কোন ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। আর তাঁহার উদ্দেশ্যের পরিপোষক হইলে, তিনি কোনও অসৎ কার্যেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। এ সম্বন্ধে একমাত্র প্রশংসার কথা এই যে, সকল বিষয়েই তিনি নিজের লাভ ক্ষতি অপেক্ষা রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিতেন। অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, এবং চৈৎসিংহের উপর অন্যায় অত্যাচার চিরদিনের জন্য হেষ্টিংসের পাপাচারের সাক্ষ্য হইয়া থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৃটিশ রাজ্যের বিস্তৃতি

(কর্ন্‌ওআলিস্‌ হইতে বার্লো পর্যন্ত)

লর্ড কর্ন্‌ওআলিস্‌। হেষ্টিংস্‌ চলিয়া গেলে পর, শাসন-পরিষদের প্রাচীনতম সভ্য সার জন্‌ ম্যাক্‌ফার্‌সন্‌ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ন্‌ওআলিসের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বড়লাটের কার্য চালাইলেন। ম্যাক্‌ফার্‌সনের কোন যোগ্যতা ছিল না, এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাসনকালের মধ্যেই উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যায় আচরণের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। লর্ড কর্ন্‌ওআলিস্‌ অতিশয় সাধু-চরিত্রের লোক ছিলেন। ভারত-শাসনের বিবিধ সংস্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত। এই সকল সংস্কারের মধ্যে ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার সংস্কারই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সংস্কারের নাম "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (Permanent Settlement), এবং এই ব্যবস্থা কর্ন্‌ওআলিসের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বৃটিশ রাজত্বের আরম্ভ হইতেই ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত লইয়া নানাবিধ গোলযোগ চলিতেছিল। ভূমির রাজস্বই গবর্নমেণ্টের প্রধান আয় বলিয়া ইহার বন্দোবস্তে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন।

ভূমির রাজস্বের পূর্বতন বন্দোবস্ত

হেষ্টিংসের আমলে ভূমির রাজস্ব ~~কিরূপে~~ নিলামে দেওয়া হইত এবং যিনি সর্বোচ্চ হারে ডাকিতেন, তাহাকেই পাঁচ বৎসরের

জন্য জমি বিলি করা হইত, ~~তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে~~। ইহার ফলে দেশের সর্বনাশ হইতেছিল। ভূমির অস্থায়ী মালিক প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া, ঐ অল্পকালের মধ্যেই যতদূর সম্ভব টাকা আদায়ের চেষ্টা করিত এবং ভূমির উন্নতির জন্য কিছুমাত্র যত্ন করিত না। এই সব বিবেচনা করিয়া কর্ন্‌ওআলিস্ জমিদারের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। এই ব্যবস্থায় জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইল। তাঁহারা কেবল বাৎসরিক গবর্নমেণ্টকে একটি নির্দিষ্ট খাজানা দিতে বাধ্য রহিলেন এবং সেই খাজানার অঙ্কও চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গেল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার এবং তাহার দুই বৎসর পরে বারাণসী প্রদেশে প্রবর্তিত হয়।

তাহার ফল

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

সমালোচনা। যে উচ্চ আশা লইয়া কর্ন্‌ওআলিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল মাত্র আংশিক-রূপে সফল হইয়াছিল। ইহা যে বিশৃংখলার স্থানে শৃংখলা আনয়ন করিয়াছিল এবং গবর্নমেণ্টের রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম প্রজা বা ভূ-স্বামী কাহারও বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। ভূমিতে প্রজাদের অথবা মধ্যস্বত্ববান্‌দের স্বত্ব গবর্নমেণ্ট একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জমিদারের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। এই সকল ত্রুটী সংশোধন করিবার নিমিত্ত পরে আবার নূতন আইন প্রণয়নের আবশ্যক হয়। কর্ন্‌ওআলিসের অভিপ্রায় ছিল, তিনি একদল ভূ-স্বামী অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি নিয়ম ছিল যে, কোন ভূ-স্বামী নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে খাজানা

সুফল

কুফল

মধ্যস্বত্ববান্ ও প্রজাগণ উপেক্ষিত

সূর্যাস্ত আইনে অনেক জমিদারের সর্বনাশ

দিতে না পারিলে তাঁহার জমি নিলামে বিক্রয় হইত। ইহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ জমিদারই সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন, অথবা ঘোর দুর্দশায় নিপতিত হইলেন। কর্ন্‌ওআলিসের শাসনকালের বহুবৎসর পরে আইনের সংশোধনের ফলে, কর্ন্‌ওআলিসের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইয়াছে।

প্রধান ক্রটী ভূমির রাজস্বের বৃদ্ধি রহিত

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান ক্রটী এই যে, ইহাদ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধির পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গত এক শত চুয়াল্লিশ বৎসর কালের মধ্যে ভূমির মূল্য বহু গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে গবর্নমেণ্ট জমিদারের যে রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার বেশি আর একটি পয়সাও এখন দাবি করিতে পারেন না। ফলে যে টাকাটা জমির রাজস্ব হইতে আদায় হইত তাহারই জন্য নানারূপ ট্যাক্স বসাইতে হইতেছে, এবং ইহাদ্বারা জনসাধারণ প্রপীড়িত হইতেছে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পরবর্তী কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

প্রজার অবস্থার উন্নতি

ক্রটী সংশোধক প্রজাস্বত্ব আইনের প্রবর্তনে প্রজাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে।* বঙ্গদেশের প্রজা যে মোটের উপর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রজাগণ অপেক্ষা সুখে ও শান্তিতে আছে, ইহা কর্ন্‌ওআলিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই কৃতিত্ব।

অন্যান্য সংস্কার। কর্ন্‌ওআলিসের সময় সমস্ত দেশ কতকগুলি জেলাতে বিভক্ত হইল এবং জেলাগুলিই দেশ-শাসনকার্যের কেন্দ্র-স্বরূপ হইল। প্রত্যেক জেলায় ইংরাজ-বিচারকের অধীনে এক একটি দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং চারিটি

---

* ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে নূতন একটি আইন পাশ হইয়াছে—তাহাতে প্রজাগণের অনেক অধিকার বাড়িয়াছে।

বড় বড় কেন্দ্রে চারিটি আপীল আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতার সদর দেওয়ানি আদালত সর্বোচ্চ আপীল আদালতে পরিণত হইল। বিচার সংস্কার

• ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচারের জন্য চারিটি সেসন আদালত স্থাপিত হইল। প্রত্যেক আদালতে দুইজন করিয়া ইংরাজ বিচারক থাকিতেন এবং তাঁহারা রাজ্যের সর্বত্র ঘুরিয়া বিচার করিতেন। এইজন্য ইহাদিগকে 'কোর্ট অব সার্কিট্' বা ভ্রাম্যমাণ আদালত বলিত। সদর নিজামত আদালতও সপারিষদ বড়লাটের অধীন হইল।

কালেক্টরগণের হাত হইতে দেওয়ানি বিচারের ক্ষমতা সরাইয়া লওয়া হইল। দেওয়ানি আদালতের ইংরাজ জজগণ ম্যাজিস্ট্রেটেরও কার্য করিতেন এবং পুলিশও তাঁহাদের অধীন ছিল। প্রতি জেলা আবার অনেকগুলি থানাতে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক থানা একজন দারোগার অধীন করা হইল। শাসন সংস্কার

কর্ন্‌ওআলিসের অকৃতকার্যতা। ভারতবর্ষীয়দিগকে কোনও উচ্চ কার্যে নিযুক্ত না করাই ছিল কর্ন্‌ওআলিসের মূল নীতি। এই নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণে তাঁহার সংস্কারগুলি বিশেষ ফলদায়ক হইল না। চোর ও ডাকাতের উপদ্রবে দেশের লোকের ধন-প্রাণ বিশেষ বিপন্ন হইয়া উঠিল। আদালতগুলিতে মোকদ্দমা জমিয়া স্তূপীকৃত হইল এবং অনেক বৎসর পর্যন্ত কোনরূপ বিচার পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। উহার কারণ দেশের অবস্থা

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ। মহীশূরের সুলতান অথবা মহীশূর রাজ্যের উপর কর্ন্‌ওআলিসের বড় ভাল ধারণা ছিল না। একবার তিনি টিপু সুলতানকে উন্মত্ত বর্বর বলিয়া অভিহিত কর্ন্‌ওআলিসের টিপু বিদ্বেষ

করিয়াছিলেন। নিজামের নিকট কর্ন্‌ওআলিস্‌ যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার মহীশূর-বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত জানিতে পারিয়া টিপু তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইলেন এবং ক্রমশ যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে, টিপু ত্রিবাংকুর রাজ্যের প্রান্তভাগ আক্রমণ করিলেন। ত্রিবাংকুর-রাজ ইংরাজের মিত্র ছিলেন। তাই কর্ন্‌ওআলিস্‌ অমনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং টিপুর বিরুদ্ধে নিজাম ও মারাঠাদের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিনি নিজেই সেনাপতিরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও বাঙ্গালোর অধিকার করিলেন। স্বপক্ষীয়গণের সহায়তায় তিনি টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরুদ্ধ করিলেন এবং টিপুকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন (১৭৯২ খৃঃ)। এই শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি অনুসারে টিপুকে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইল এবং তাঁহার অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিতে হইল। টিপু যাহাতে সন্ধির সর্ত উপযুক্তরূপে প্রতিপালন করেন তাহার জামিনস্বরূপ টিপুর দুই পুত্রকে লর্ড কর্ন্‌ওআলিস্‌ কলিকাতায় আনিয়া রাখিলেন। টিপুর প্রদত্ত রাজ্যার্ধ ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠারা সমান অংশে ভাগ করিয়া নিলেন। মালাবার, কুর্গ, দিন্দিগাল ও বড়মহল ইংরাজের অধীনে আসিল। নিজাম ও মারাঠাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যের সংলগ্ন ভূমিখণ্ড সমূহ অধিকার করিলেন।

যুদ্ধের কারণ · *নিজাম ও মারাঠার সহিত মিলন* · *শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি* · *সন্ধির সর্তে প্রাপ্ত রাজ্যের বিভাগ*

কর্ন্‌ওআলিসের বিদায়। কর্ন্‌ওআলিসের শাসনকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কুড়ি বৎসরের জন্য কোম্পানির সনদ প্রাপ্তি। ঐ বৎসরে কর্ন্‌ওআলিস্‌ চলিয়া গেলে, সার্‌ জন্‌ শোর্‌ তাঁহার স্থানে বড়লাট হইলেন।

কোম্পানির পুনরায় সনদ প্রাপ্তি

সার্ জন্ শোর্। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব আসফ্‌উদ্দৌল্লা পরলোক গমন করেন, এবং তাঁহার পুত্র উজির আলি অযোধ্যার নবাব হন। তিনি দাসীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া শোর্ তাঁহাকে নবাবী পদ হইতে সরাইয়া সাদৎ আলি খাঁকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইলেন। সাদৎ আলি খাঁর সহিত নূতন সন্ধি হইল এবং এই নূতন সন্ধির সর্ত অনুসারে এলাহাবাদ ইংরাজদের হস্তগত হইল। সার্ জন্ শোর্ শান্তিপ্রিয় ও উদ্যোগহীন ছিলেন এবং বৃটিশের স্বার্থের সম্ভাবনা থাকিলেও দেশীয় শক্তিসমূহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন না। শোরের এই নীতি "উদাসীন নীতি" বা "নিরপেক্ষতা-মূলক নীতি" (Policy of Non-Interference) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই নীতির ফলে ভারতে বৃটিশের সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইল।

অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি

শোরের উদাসীন নীতি

মারাঠাগণ। এই সময়ে মারাঠা ও নিজামের মধ্যে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহার বিষয় বিবেচনা করিলেই, শোরের উদ্যমহীনতা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যাইবে। সালবাই-এর সন্ধির পরে মারাঠা রাজ্যসমূহের শক্তি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সময়কার মারাঠা নায়কগণের মধ্যে মাহাদজি সিন্ধিয়া এবং নানা ফার্নবিশের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর ভারতে মাহাদজি সিন্ধিয়ার বিস্তৃত রাজ্য ছিল এবং দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার করতলগত থাকায় নানাবিষয়ে তাঁহার সুবিধা হইয়াছিল। এম.ডি. বয়েন নামক একজন ইউরোপীয় সেনাপতি ইউরোপীয় প্রথায় তাঁহার সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় রাজ্যসমূহের সৈন্যগণের মধ্যে কেবল মাহাদজি সিন্ধিয়ার সৈন্যগণই

মারাঠা শক্তির বৃদ্ধি

মাহাদজি সিন্ধিয়া

তাঁহার ইউরোপীয় সেনাপতি ও সুশিক্ষিত সৈন্য

শিক্ষায় ও দক্ষতায় ইংরাজ সৈন্যের সমকক্ষ ছিল। সিন্ধিয়া, হোল্‌কার ও কয়েকটি মুসলমান এবং রাজপুত শক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে সিন্ধিয়ার শক্তি ক্রমশ প্রবল হওয়ায় ইংরাজগণ শংকিত হইয়া উঠিতেছিলেন, এবং সময় সময় এমনও বোধ হইয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে একটা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মাহাদজি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পৌত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী হন।

তাঁহার শক্তির বিকাশ

তাঁহার মৃত্যু

দৌলতরাও সিন্ধিয়া

ইহার এক বৎসর পরে হোল্‌কার বংশের রাণী বিখ্যাত অহল্যাবাইর মৃত্যু হয়। এই মহীয়সী মহিলা অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া ইন্দোর রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

অহল্যাবাই

মারাঠা শক্তির কেন্দ্রস্থান পুনাতে তীক্ষ্ণধী রাজনৈতিক নানা ফার্‌নবিশ, শিশু পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণের নামে নিজেই মারাঠা রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তিনি প্রকৃতই অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত রাজ্য চালাইতেছিলেন এবং মারাঠা নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ন্‌ওআলিসের সহিত টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে, টিপুর নিকট হইতে গৃহীত রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ লাভ করিয়া, তিনি মারাঠা রাজ্যের সীমানা তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

নানা ফার্‌নবিশ

টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

নিজাম ও মারাঠার যুদ্ধ। নানা ফার্‌নবিশের কৌশলে সিন্ধিয়া, হোলকার ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মারাঠা শক্তি মিলিয়া নিজামকে আক্রমণ করিল। নিজাম পুনঃপুন সার্ জন্ শোরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ গবর্নমেণ্ট এরূপ অবস্থায়

শোরের নিজামকে সাহায্য করিতে অস্বীকার

নিজামকে সাহায্য করিবেন এরূপ ভরসা দিয়াছিলেন, এবং এই সাহায্য না পাইলে নিজামের কি অবস্থা হইবে, তাহাও শোর্ ভাল রকমেই জানিতেন, তথাপি তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে খর্দা নামক স্থানে নিজাম মারাঠাদের হস্তে গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন এবং একরকম মারাঠাদের অধীন হইয়া গেলেন। নানা ফার্‌নবিশের নীতি সম্পূর্ণ সফল হইল।

নিজামের পরাজয়

মারাঠা রাজ্যে গোলযোগ। কিন্তু নিজামের বিরুদ্ধে এই বিজয়ই নানা ফার্‌নবিশের ও সম্মিলিত মারাঠা শক্তিপুঞ্জের শেষ বিজয়। নানা ফার্‌নবিশের কঠোর শাসন অসহ্য মনে করিয়া বালক পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন। অমনি মারাঠারাজ্য ষড়যন্ত্রে ছাইয়া গেল এবং নানা ফার্‌নবিশ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অবশেষে রঘুনাথের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু মারাঠা-শক্তি বহু বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াই রহিল।

পেশোয়ার আত্মহত্যা

নূতন পেশোয়া ২য় বাজীরাও

লর্ড ওয়েলেস্‌লী। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লী বড়-লাট হইয়া আসিয়া শোরের "নিরপেক্ষতামূলক" নীতি (Non-Interference) একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন এবং ভারতীয় শক্তিসমূহকে বৃটিশের অধীনতা-পাশে বদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে নূতন নীতির প্রবর্তন করিলেন, তাহাকে "অধীনতামূলক মিত্রতা" (Subsidiary Alliance) বলা যাইতে পারে। এই নীতি অনুসারে ভারতীয় রাজগণকে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া বৃটিশের

ওয়েলেস্‌লীর জবরদস্ত নীতি

অধীনতামূলক মিত্রতা

আশ্রয় গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হইত। তৎপরিবর্তে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইতেন। ভারতীয় রাজগণের মধ্যে যিনি এই অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিতেন, তাঁহাকে নিজের রাজ্যে নিজের খরচে একদল বৃটিশ সৈন্য পোষণ করিতে হইত, অথবা উহাদের পোষণের জন্য বৃটিশ গবর্নমেণ্টকে খরচ যোগাইতে হইত। বৃটিশের সম্মতি ভিন্ন অপর কোন শক্তির সহিত কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।

উহার অর্থ

নিজামের "অধীনতামূলক মিত্রতা" গ্রহণ। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ঘোর বিপদের কালে বৃটিশের সাহায্য না পাওয়ায় বৃটিশের উপর নিজামের মনের ভাব ভাল ছিল না, এবং তিনি ফরাসি সেনাপতিগণের সহায়তায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সৈন্য সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ওয়েলেস্‌লী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া "অধীনতামূলক মিত্রতা" গ্রহণ করিতে স্বীকার করাইলেন, এবং তাঁহার ফরাসিদের দ্বারা শিক্ষিত সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর নিজামের আর স্বাধীন নৃপতি বলিয়া গর্ব করিবার কিছুই রহিল না।

নিজামের স্বাধীনতা লোপ

শেষ মহীশূর যুদ্ধ। এইবার টিপুর পালা আসিল। হায়দর আলির বীর পুত্র টিপু কিন্তু বৃটিশের ক্রীতদাস হইতে অস্বীকার করিলেন, এবং ফরাসিদের সহিত মিলিত হইয়া নিজের বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বিঘোষিত হইল। ইংরাজ সৈন্য বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে একযোগে মহীশূর আক্রমণ করিল এবং ৪ঠা মে তারিখে

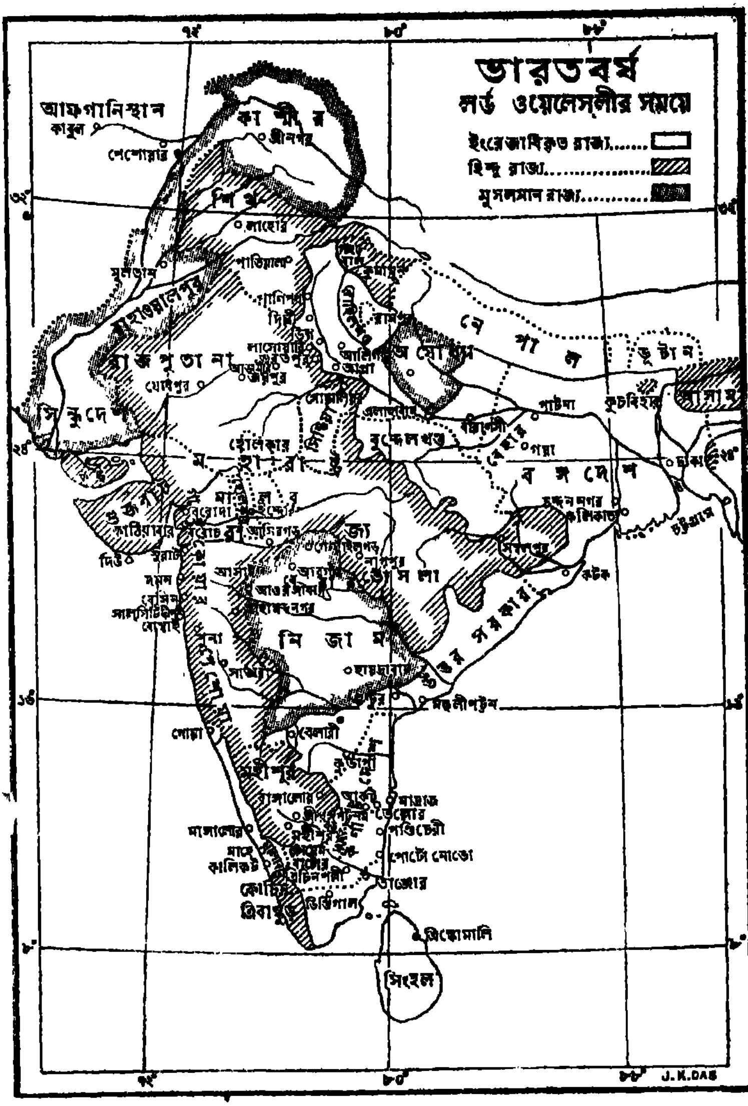
ভারতবর্ষ
লর্ড ওয়েলেসলীর সময়ে
ইংরেজাধিকৃত রাজ্য
হিন্দু রাজ্য
মুসলমান রাজ্য
আফগানিস্থান
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
শ্রীনগর
শিখ
লাহোর
মুলতান
পাতিয়ালা
পানিপথ
দিল্লী
রাজপুতানা
আগ্রা
যোধপুর
সিন্ধুদেশ
নেপাল
ভুটান
আসাম
অযোধ্যা
এলাহাবাদ
বুন্দেলখণ্ড
পাটনা
কুচবিহার
গয়া
বঙ্গদেশ
চন্দননগর
কলিকাতা
ঢাকা
চট্টগ্রাম
কটক
হোলকার
নাগপুর
সুরাট
দিউ
দমন
বোম্বাই
নিজাম
হায়দ্রাবাদ
মছলীপট্টম
গোয়া
বেলারী
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
কালিকট
কোচিন
ত্রিবাঙ্কুর
তাঞ্জোর
ত্রিঙ্কোমালি
সিংহল
J.K.DAS

রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত হইল। দুর্গের এক সিংহদ্বারে অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে টিপু প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু

টিপুর চরিত্র। কোন কোন ঐতিহাসিক টিপুর চরিত্রে অযথা কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন। কিন্তু টিপু বিশেষ সাহসী ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন, এবং ঐ যুগের দেশীয় রাজগণের চরিত্রে যে সকল দোষ সাধারণত লক্ষিত হইত, তাহাদের অনেকগুলি হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন। অদমনীয় স্বাধীনতা-প্রীতি তাঁহার চরিত্রের এক বিশেষত্ব ছিল। বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করিয়া, ঐ যুগের অন্যান্য অনেক রাজার মত তিনি নিজের রাজ্যে নিজের অধিকার বজায় রাখিতে পারিতেন। কিন্তু এইরূপ প্রস্তাবমাত্রই তিনি সর্বদা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। টিপুর ন্যায় স্বাধীনতা-প্রীতির জন্য মৃত্যু এবং নিজের বংশের সর্বনাশ স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারিতেন, ঐ যুগের এমন দ্বিতীয় আর একজন ভারতীয় রাজার নাম করা কঠিন। টিপু সেই যুগের ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঠিক সংবাদ রাখিতেন। নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার চলিত। এ বিষয়েও তিনি ঐ যুগের অনেক রাজারই অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁহার এই সমস্ত গুণ ছিল সত্য, কিন্তু তিনি কূটনীতি-বিশারদ্ ছিলেন না, এবং প্রধানত এই কারণেই তাঁহার পতন হইয়াছিল। তিনি প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন; মহীশূরের লক্ষ লক্ষ লোক আজিও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা স্মরণ করে।

তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

স্বাধীনতা-প্রীতি

ইউরোপীয় ঘটনাবলীর সহিত পরিচয়

কূটনীতি-জ্ঞানের অভাব

মহীশূরের পরিণাম। হায়দর আলি যে হিন্দু রাজবংশের হস্ত হইতে মহীশূর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন, মহীশূর রাজ্যের মধ্যভাগ সেই রাজবংশকেই ফিরাইয়া দেওয়া হইল। প্রকৃত

প্রস্তাবে ইহা বৃটিশের এক অধীন রাজ্যে পরিণত হইল। অবশিষ্টাংশ ইংরাজ ও নিজাম ভাগ করিয়া লইলেন। নিজামের অংশ কিন্তু শীঘ্রই নিজামকর্তৃক প্রতিপালিত বৃটিশ সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থ ইংরাজের হস্তে ফিরিয়া আসিল। মহীশূরের নূতন হিন্দু রাজার অল্পবয়স প্রযুক্ত সমস্ত রাজ্যটিই কিছুকালের জন্য বৃটিশের অধীনে রহিল।

ওয়েলেস্‌লীর দেশীয় রাজ্য অধিকার। ওয়েলেস্‌লী সুবিধা পাইলেই দেশীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশের অধীনে আনয়ন করিতে লাগিলেন। তাঞ্জোরের রাজা এবং সুরাটের নবাবকে বৃত্তিভুক্ করিয়া সরাইয়া দিয়া, তাঁহাদের রাজ্য বৃটিশরাজ্যভুক্ত করা হইল (১৭৯৯)। কর্ণাটের নবাবের বিরুদ্ধে টিপুর সহিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় কর্ণাট রাজ্যও বৃটিশ শাসনের অধীনে আনা হইল (১৮০১)। কিন্তু ওয়েলেস্‌লী সর্বাপেক্ষা বড় জবরদস্তি করিয়াছিলেন অযোধ্যা রাজ্যের উপর। কু-শাসনের অজুহাতে (কুশাসনের অভিযোগ যে অনেকাংশে সত্য সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই) তিনি হতভাগ্য নবাবকে তাঁহার রাজ্যের কতকগুলি জেলা (দোয়াবের এক অংশ, গোরখপুর এবং রোহিলখণ্ড) বৃটিশের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন।

তাঞ্জোর
সুরাট

কর্ণাট রাজ্য

অযোধ্যার কতকাংশ

ওয়েলেস্‌লীর বৈদেশিক নীতি। এই সময়ে ফ্রান্সের নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল। সেই যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য ওয়েলেস্‌লী একদল ভারতীয় সৈন্য মিশরে প্রেরণ করেন। এদিকে তিনি ভারতের ফরাসি, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ অধিকৃত স্থানসমূহ দখল করিয়া ফেলিলেন।

মিশরে ভারতীয় সৈন্য

পারস্যে দূত প্রেরণ

এতদ্ব্যতীত তিনি ম্যাল্‌কমকে পারস্যের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিলেন। এই দৌত্যের ফলে ইংরাজদের নানাপ্রকার সুবিধালাভ হইয়াছিল।

মারাঠা রাজ্যের অবস্থা। মাধবরাও নারায়ণের মৃত্যু হইলে, পেশোয়ার রাজ্যে ~~যে কিরূপ~~ দারুণ গোলযোগ উপস্থিত হয়, ~~তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে~~। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা ফার্নবিশ পরলোক গমন করিলেন এবং মারাঠা রাজ্যের সমস্ত বিজ্ঞতা ও সংযম যেন তাঁহার সহিতই বিলুপ্ত হইল। নূতন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওর মত অযোগ্য ও অধম নরপতি খুব কমই দেখা যায়। দৌলতরাও সিন্ধিয়া তখন অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ। যশোবন্ত রাও হোল্‌কারের বীরত্বের অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি মোটেই রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। ছয় বৎসরের মধ্যে মাহাদজি সিন্ধিয়া, অহল্যাবাই এবং ফার্নবিশের মত তিনজন প্রধান নায়ক নায়িকার মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যে ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইল।

ফার্নবিশের মৃত্যু

উপযুক্ত নায়কের অভাব

পেশোয়ার বৃটিশ-প্রভুত্ব স্বীকার। মারাঠা রাজ্যে অরাজকতায়, নায়কদের ষড়যন্ত্রে ও অন্তর্বিদ্রোহে প্রজা-সাধারণের দুঃখ ও দুর্দশার আর অবধি ছিল না। অবশেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর তারিখে রাজধানী পুনার নিকট এক খণ্ডযুদ্ধে যশোবন্ত রাও হোল্‌কার, পেশোয়ার ও সিন্ধিয়ার মিলিত সৈন্য-দলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। পেশোয়া অমনি পলাইয়া গিয়া বৃটিশের আশ্রয় লইলেন। ওয়েলেস্‌লী তাঁহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিলেন এবং "অধীনতামূলক মিত্রতা" গ্রহণ করিতে স্বীকার করাইলেন। তদনুসারে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর

মারাঠা রাজ্যে অরাজকতা

পেশোয়ার পরাজয়

বৃটিশের আশ্রয় ও অধীনতা-মূলক মিত্রতা গ্রহণ

বেসিনের সন্ধি

তারিখে বেসিনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। গর্বিত মারাঠা জাতির নায়ক এইরূপে বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করিলেন। বৃটিশ সৈন্যের সহায়তায় বাজীরাও পুনরায় সিংহাসন পাইলেন। মারাঠা নায়কগণ কিন্তু বেসিনের সন্ধিপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। কিছুদিন পরে পেশোয়া নিজেও তাঁহার হঠকারিতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বৃটিশের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিবার সুযোগ খুজিতে লাগিলেন।

মারাঠা নায়কদের মতিস্থৈর্যের অভাব। বৃটিশের প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস ব্যর্থ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও, মারাঠা নায়কগণ একত্র মিলিত হইয়া একযোগে কার্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সিন্ধিয়া ও ভোঁস্‌লার সহিত মিলিত হইতে অস্বীকার করিয়া হোল্‌কার নিরপেক্ষ থাকিয়া মালবে চলিয়া গেলেন। এদিকে সিন্ধিয়া ও ভোঁস্‌লা একত্র মিলিয়াও কোন নির্দিষ্ট কার্য-প্রণালী স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ওয়েলেস্‌লী তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফলই হইল না। অবশেষে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে অগষ্ট মাসে তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

যুদ্ধের আরম্ভ

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরাপথে এক সঙ্গেই যুদ্ধ বাধিল। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ সেনাগণের নায়ক ছিলেন—বড়লাটের ভাই সার আর্থার ওয়েলেস্‌লী ; ইনি পরে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আসাইর যুদ্ধক্ষেত্রে (সেপ্টেম্বর, ১৮০৩) সিন্ধিয়া, এবং আরগাঁওর যুদ্ধক্ষেত্রে (নভেম্বর, ১৮০৩) ভোঁস্‌লা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। উত্তর ভারতে সেনাপতি লেক্ দিল্লী ও আগ্রা

আসাই, আরগাঁও ও লাসোয়ারির যুদ্ধ

অধিকার করিয়া লাসোয়ারীর যুদ্ধক্ষেত্রে সিন্ধিয়ার সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (অক্টোবর, ১৮০৩)। এইরূপে সিন্ধিয়া ও ভোঁস্‌লার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিলে, সুরজী অর্জুনগাঁও এবং দেওগাঁওর সন্ধিদ্বারা উভয়েই "অধীনতামূলক মিত্রতা" গ্রহণ করিলেন (১৮০৩)। সিন্ধিয়া চম্বল নদীর উত্তরস্থ ভূ-খণ্ড ও দোয়াব প্রদেশ এবং ভোঁস্‌লা কটক প্রদেশ ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আহম্মদনগর ও বেরার নিজামের ভাগে পড়িল।

সিন্ধিয়া ও ভোঁস্‌লার অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ

নির্বোধ হোল্‌কার এই সংকটের কালে নিরপেক্ষ থাকিয়া এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই তিনি কর্ণেল মন্‌সনের অধীন একদল বৃটিশ সেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই ডীগের যুদ্ধে (নভেম্বর, ১৮০৪) সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, পঞ্জাব অভিমুখে পলায়ন করিলেন। অতঃপর বৃটিশ সেনাপতি লেক্ ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ করিলেন, কারণ ভরতপুরের রাজা হোল্‌কারের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু লেক্ ভরতপুর অধিকার করিতে পারিলেন না, বরং তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিতে হইল। অবশেষে ভরতপুরের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল।

হোল্‌কারের পরাজয় ও পলায়ন

ভরতপুর অধিকারে ইংরাজের অক্ষমতা

ওয়েলেস্‌লীর প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এই সমুদয় অদ্ভুত বিজয় সত্ত্বেও ওয়েলেস্‌লী কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের নিকট সমুচিত সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের ব্যয়ভারে কোম্পানি প্রপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং কর্তৃপক্ষগণ ওয়েলেস্‌লীর বিরোধমূলক নীতি আর পছন্দ করিতেছিলেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক কারণে কর্তৃপক্ষগণ ওয়েলেস্‌লীর উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। ওয়েলেস্‌লী প্রায়ই তাঁহাদের আদেশ

ইংলণ্ডে ওয়েলেস্‌লীর অনাদর

অমান্য করিতেন, এবং তাঁহার নিজের ভ্রাতাগণকে বিভিন্ন উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং হোল্‌কার কর্তৃক মন্‌সনের পরাজয়ের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিবামাত্র, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ওয়েলেস্‌লীকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

ইহার কারণ

ওয়েলেস্‌লীর চরিত্র। মহীশূর, নিজাম ও মারাঠাদের শক্তি বিনষ্ট করিয়া ওয়েলেস্‌লী ভারতে বৃটিশ শক্তিকে প্রবলতম ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনি বিধান যে ভারতে বৃটিশ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাগণ কেহই তাঁহাদের কৃত-কার্যের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করেন নাই। হেষ্টিংস্ অপরাধীরূপে পার্ল্যামেন্টের সম্মুখে বিচারার্থ নীত হইয়াছিলেন, ওয়েলেস্‌লীও প্রায় সেই দশাগ্রস্ত হইতে হইতে বাঁচিয়া যান। ওয়েলেস্‌লীর কার্যে কতকগুলি দোষ ত্রুটী থাকিলেও এবং তাঁহার বিরোধমূলক নীতি সর্বদা অনুমোদনের যোগ্য না হইলেও তাঁহার ধীশক্তি, উদ্যম ও রাজনীতি-জ্ঞান যে অত্যন্ত উচ্চ অঙ্গের ছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি সময় সময় অত্যন্ত জবরদস্তি করিয়া অনেক কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত কাজেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠা। "দেখা যাক্ কি হয়" বলিয়া অনিশ্চিত চিত্তে অপেক্ষা করা কোন দিনও তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি যাহা ভারতে বৃটিশ-নীতির একমাত্র পরিণাম বলিয়া ঠিক বুঝিয়াছিলেন, সাহস সহকারে সর্বদা তাহা কার্যে পরিণত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার অসাধারণ রাজনীতি-জ্ঞান ছিল এবং দেশশাসনের ক্ষমতা বোধ হয় তাহা হইতেও অধিক ছিল।

তাঁহার গুণাবলী

তাঁহার জবরদস্তি

ভারতের শ্রেষ্ঠ বড়লাটগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া ওয়েলেস্‌লী চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও তিনি সময় করিয়া নবাগত ইউরোপীয় কর্মচারিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুসৃত নীতি অনুসারে ভারত শাসনার্থ নির্বাচিত কর্মচারিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য বিলাতে হেলিবেরি নামক স্থানে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

কোম্পানির কর্মচারিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা

লর্ড কর্ন্‌ওআলিস্‌। ওয়েলেস্‌লীর পর লর্ড কর্ন্‌ওআলিস্‌কে দ্বিতীয়বার বড়লাট করিয়া শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতে পাঠান হইল। বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত কর্ন্‌ওআলিস্ ভারতে আসিয়া তিন মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তিনি ওয়েলেস্‌লীর নীতি উল্টাইয়া দিলেন, এবং বিগত যুদ্ধে যে সমুদয় অধিকার লাভ হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি পুনবায় বিপক্ষকে ছাড়িয়া দিলেন।

সার জর্জ বার্লো। কর্ন্‌ওআলিসের মৃত্যুর পর শাসন-পরিষদের প্রাচীনতম সভ্য সার জর্জ বার্লো বড়লাটের কাজ চালাইতে লাগিলেন। বার্লো কর্ন্‌ওআলিসের নীতির অনুসরণ-কারী ছিলেন। তাঁহার প্রতি কার্যে ক্ষুদ্রতা ও ভীরুতা প্রকাশ পাইত। এই সময় লর্ড লেক্ হোল্‌কারকে পরাজিত করিয়া বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান। কিন্তু বার্লো তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। যে রাজপুত রাজগণ এই যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে হোল্‌কারের কোপ হইতে রক্ষা করার তিনি কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। বার্লোর সময়ে অন্য একটি উল্লেখযোগ্য

হোলকারের সহিত সন্ধি

ভেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ

ঘটনা—ভেলোরের বৃটিশ সিপাহীগণের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ সহজেই দমিত হয়। ভেলোরে টিপু সুলতানের আত্মীয়গণ বাস করিতেছিলেন; এই বিদ্রোহের সহিত তাঁহাদের যোগ আছে সন্দেহ করিয়া, তাঁহাদিগকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৃটিশ সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন

(মিণ্টো হইতে সার চার্লস্ মেট্‌কাফ্ পর্যন্ত)

লর্ড মিণ্টো। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে লর্ড মিণ্টো ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ওয়েলেস্‌লীর "বিরোধমূলক নীতি" (Forward policy) এবং কর্ন্‌ওআলিস্ ও বার্লোর "নিরপেক্ষতামূলক নীতির" (Non-Interference) মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

রণজিৎ সিংহ। এই সময়ে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে পঞ্জাবে শিখ জাতি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। রণজিৎ নিজের চেষ্টায় নিজের অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী অতি বিচিত্র। বার বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। কিন্তু এই নির্ভীক বালক ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করেন, এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরও তাঁহার হস্তগত হয়। কাবুলের অধিপতি জামন শাহ রণজিৎকে রাজা উপাধি প্রদান করেন, এবং শতদ্রু নদীর পশ্চিমদিগস্থ সমগ্র পঞ্জাব শীঘ্রই এই নবীন ভূপতির পদানত হয়। শতদ্রুর পূর্বদিগস্থ শিখ-নায়কগণ পরস্পরের মধ্যে কলহে রত ছিলেন। তাঁহাদের একজনের আহ্বানে রণজিৎ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার করিলেন (১৮০৬ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু ঐ শিখ-নায়কগণ রণজিতের বিরুদ্ধে লর্ড মিণ্টোর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। মিণ্টো

শিখগণের শক্তিসঞ্চয়

রণজিতের জীবন-কাহিনী

মেট্‌কাফ্‌কে রণজিতের সভায় দূত প্রেরণ করিলেন এবং অমৃতসরের সন্ধিদ্বারা রণজিতের সহিত বৃটিশ গবর্নমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। রণজিৎ শতদ্রুর পূর্বদিগস্থ শিখ-নায়কগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এবং ফলে ঐসকল শিখ-নায়ক বৃটিশের অধীন হইয়া গেল। এইরূপে বিনাযুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে বৃটিশ রাজ্যের সীমানা শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

বৃটিশের সহিত বন্ধুতা

দুইটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহ। মিণ্টোর শাসনকালে ত্রিবাংকুর রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং মাদ্রাজের সেনাদলের ইউরোপীয় কর্মচারিগণও বিদ্রোহী হয়। উভয় বিদ্রোহই সহজে দমিত হইয়াছিল।

মিণ্টোর বৈদেশিক নীতি। মিণ্টোর শাসনকালেও নেপোলিয়ানের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার আদেশ অনুসারে মিণ্টো ফরাসি ও ওলন্দাজগণের অধিকৃত ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপসমূহ অধিকার করেন। ফরাসীদের বুরবন্‌ ও মরিসাস্‌ দ্বীপ দুইটি এবং ওলন্দাজগণের মলাক্কাদ্বীপ ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হয়, এবং ১৮১১ খৃঃ ওলন্দাজ-অধিকৃত যবদ্বীপের রাজধানী ব্যাটেভিয়ার পতন হয়। কিন্তু যবদ্বীপ ও বুরবন্‌ দ্বীপ পরে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এশিয়া মহাদেশের শক্তিসমূহের সহিত নেপোলিয়নের ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ করিবার জন্য মিণ্টো পারস্য ও আফগানিস্থানে দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু এ দৌত্যে বিশেষ কোনও ফল হয় নাই।

ইংরাজকর্তৃক ফরাসি ও ওলন্দাজ অধিকৃত দ্বীপসমূহ দখল

কোম্পানির সনদ। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনদের মিয়াদ আবার ২০ বৎসর বাড়ানো হইল। কিন্তু ভারতীয়

বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার উঠিয়া গেল। ভারত-শাসনে কোম্পানির নামমাত্র অধিকার পূর্ববৎ বজায় রহিল।

মাকুইস অব হেষ্টিংস্। মিণ্টোর পরে লর্ড ময়রা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে বড়লাট হইয়া আসিলেন। পরবর্তীকালে ইনি "মাকুইস্ অব্ হেষ্টিংস্" এই উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এই উপাধিদ্বারাই ইনি জনসমাজে বিশেষ পরিচিত। কিঞ্চিদধিক নয় বৎসর কাল তিনি ভারতের বডলাট ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের সহিত যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত।

গোরখাদের নেপাল অধিকার

নেপালে যুদ্ধ। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গোরখা নামক একটি পার্বত্য জাতি নেপাল উপত্যকা অধিকার করিয়াছিল এবং পঞ্জাব হইতে ভুটান পর্যন্ত হিমালয়ের সমগ্র দক্ষিণাংশ জুড়িয়া তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। গোরখাগণ প্রায়ই বৃটিশ রাজ্যে ঢুকিয়া লুঠপাট করিত। সুতরাং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস্ নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

যুদ্ধের কারণ

এই যুদ্ধে বড়লাট স্বয়ং সেনাপতি হইলেন, কিন্তু অধস্তন সেনা-নায়কগণের অযোগ্যতা বশত প্রথম প্রথম ইংরেজ সৈন্যেরই পরাজয় ঘটিল। গোরখাদের বিজয় কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হইল না। সেনাপতি অক্টারলোনি সদর্পে গোরখা রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, এবং গোরখারা সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সগৌলির সন্ধির (১৮১৬ খৃঃ) সর্ত অনুসারে নেপাল দরবার গাঢ়ওয়াল, কুমায়ুন এবং নেপাল তরাই-এর অধিকাংশ স্থান বৃটিশের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন, সিকিমের উপর অধিকার পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি

সগৌলির সন্ধি ও তাহার সর্ত

নেপালের সহিত শান্তি ও সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং গোর্খা সেনাদল বৃটিশের ভারতীয় সৈন্যবলের এক প্রধান অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে।

দলবদ্ধ দস্যু

পিণ্ডারি যুদ্ধ। মধ্য-ভারতে এই সময় ভয়ংকর অরাজকতা এবং গোলযোগ চলিতেছিল। দলবদ্ধ দস্যুগণ নির্ভয়ে দেশ লুণ্ঠন ও অকথ্য নৃশংসতার অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইতেছিল। এই দস্যুদলের মধ্যে পিণ্ডারিগণই ছিল সর্বপ্রধান। এই পিণ্ডারি দলে সকল জাতি এবং সকল ধর্মের লোকই ছিল, এবং তাহারা কেবল মাত্র লুণ্ঠনের লোভেই দলবদ্ধ হইয়াছিল। সময় সময় পাঠান ও মারাঠাগণও দলবদ্ধ হইয়া ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার সহিত চুরি ডাকাতি করিত। ক্রমে ক্রমে সাহস বৃদ্ধি পাওয়ায় পিণ্ডারিগণ বৃটিশরাজ্যেও লুঠপাট আরম্ভ করিল। তাহাদের লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনিয়া অবশেষে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট তাহাদিগকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সকলেই জানিত যে, মারাঠা-নায়কগণ এই পিণ্ডারিগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। সুতরাং

লর্ড হেষ্টিংসের হস্তে পিণ্ডারি-গণের উচ্ছেদ

লর্ড হেষ্টিংস্ নাগপুরের ভোঁস্‌লা রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। ভূপাল, উদয়পুর, যোধপুর এবং কোটার রাজার সহিতও মিত্রতা স্থাপিত হইল। অতঃপর লর্ড হেষ্টিংস্ প্রকাণ্ড একদল সৈন্য লইয়া পিণ্ডারিদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং পিণ্ডারিগণ প্রায় ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল (১৮১৮ খৃঃ)। পিণ্ডারিগণের প্রধান তিনজন নায়কের মধ্যে একজন আত্মহত্যা করিল, আর একজন বনের মধ্য দিয়া পলায়ন কালে ব্যাঘ্রের মুখে প্রাণ দিল, এবং তৃতীয় করিম খাঁকে বস্তি জেলায় বাসস্থান দেওয়া হইল। পাঠান-

পিণ্ডারি নায়ক-গণের পরিণাম

নায়ক আমির খাঁকে টঙ্ক নামক স্থানের আধিপত্য দেওয়া

হইল। এইরূপে ভারতবর্ষ এক বিষম উৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ: মারাঠাগণের সহিতও লর্ড হেষ্টিংসের শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বৃটিশের অধীন হইয়া জীবন যাপন করায় পেশোয়ার মনে বিষম অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তারপর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক নূতন সন্ধি করিয়া বৃটিশরাজ পেশোয়ার নিকট হইতে কোংকন প্রদেশ এবং কয়েকটি দুর্গ কাড়িয়া লইলেন। দুর্দশার ভরা এইবার পূর্ণ হইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ছাব্বিশ হাজার সৈন্য লইয়া পেশোয়া কির্কীতে বৃটিশ প্রতিনিধিকে (Resident) আক্রমণ করিলেন। কির্কীতে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক ছিল না; কিন্তু তথাপি পেশোয়া গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন, এবং নূতন সৈন্য আসিয়া বৃটিশ সৈন্যের দলবৃদ্ধি করিবামাত্র তাহারা পুনা অধিকার করিল। পেশোয়ার সৈন্য আবার আষ্টি নামক যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৮১৮)।

যুদ্ধের কারণ

পেশোয়ার পরাজয়

আপ্পা সাহেব ভোঁস্‌লাও পেশোয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল একই হইল। একদল বৃটিশ সৈন্য বিপুল মারাঠাবাহিনীকে সীতাবল্‌দি ও নাগপুরে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮১৭)।

ভোঁস্‌লার পরাজয়

হোল্‌কারের সহিতও যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু মাহিদপুরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া হোল্‌কার অবিলম্বে বশ্যতা স্বীকার করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮১৭)।

হোল্‌কারের পরাজয়

যুদ্ধের ফলাফল। পেশোয়া এবং আপ্পা সাহেব উভয়েই বৃটিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। আপ্পা সাহেব সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার রাজ্যের যে অংশ নর্মদা নদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল, তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এক নূতন রাজা বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ শাসন করিতে লাগিলেন। ভোঁসলার তুলনায় পেশোয়া অধিকতর সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কানপুরের নিকটস্থ বিঠুরে যাইয়া আবাস স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার জন্য আট লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। পেশোয়ার পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। শিবাজীর এক বংশধর বৃটিশের অধীন থাকিয়া ক্ষুদ্র সাতারা রাজ্যের রাজা হইলেন।

ভোঁস্‌লার পদচ্যুতি

পেশোয়া পদের বিলোপ

সাতারা রাজ্য

লর্ড হেষ্টিংসের কার্যের ফলাফল। কোন কোন দেশ যুদ্ধে জয় করিয়া এবং কোন কোন দেশের সহিত বিনা যুদ্ধেই সন্ধি স্থাপন করিয়া, লর্ড হেষ্টিংস্ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ বৃটিশের শাসনাধীনে আনিয়া ফেলিলেন এবং এইরূপে ওয়েলেস্‌লীর আরব্ধ কর্ম এতদিনে সম্পূর্ণ হইল। পঞ্জাব ও নেপাল ব্যতীত এই সময়ে এমন একটি দেশীয় রাজ্যও ছিল না, যাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করিতে পারিত। লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে বৃটিশের সিংগাপুর অধিকার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সিংগাপুর বর্তমানে বৃটিশ নৌ-বহরের একটি প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

ওয়েলেস্‌লীর আরব্ধ কার্য সমাপন

সিংগাপুর অধিকার

লর্ড হেষ্টিংসের পদত্যাগ। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এবং ওয়েলেস্‌লীর ন্যায় লর্ড হেষ্টিংস্‌কেও অপদস্থ হইয়া ভারতবর্ষ

ত্যাগ করিতে হয়। পামার এণ্ড কোং নামক বিখ্যাত ব্যাংকের নিন্দনীয় কার্যাবলী আলোচনা করিয়া ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষগণ লর্ড হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এক ভর্ৎসনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহাতেই তিনি পদত্যাগ করিয়া ভারত ছাড়িয়া যান এবং শাসন-পরিষদের প্রাচীনতম সভ্য মিঃ অ্যাডাম্ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অস্থায়ীরূপে বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেন।

লর্ড আমহার্ষ্ট। ঐ বৎসরই অগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট বড়লাট হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ। মণিপুর ও আসাম জয় করিয়া বিজয়গর্বে উৎফুল্ল ব্রহ্মরাজ ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম-ভাগে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য ইংরাজ-রাজ্য আক্রমণ করিল। বৃটিশ সৈন্য তাহাদিগকে আসাম হইতে তাড়াইয়া দিয়া বঙ্গদেশের সীমান্ত সুরক্ষিত করিল। অতঃপর বৃটিশ সৈন্য আরাকান আক্রমণ করিল, কিন্তু এই আক্রমণ সম্পূর্ণ বিফল হইল। এই উপলক্ষে দেশীয় সিপাহীগণ জাতিপাতের ভয়ে সমুদ্র লংঘন করিতে অস্বীকৃত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। লর্ড আমহার্ষ্ট সমুদ্রপথে বাষ্পীয় তরণীযোগে ব্রহ্মদেশে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। ভারত সমুদ্রে যুদ্ধের জন্য বাষ্পীয় পোতের গতায়াত এই প্রথম। রেংগুন সহজেই অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু বিস্তর লোকক্ষয় এবং অর্থক্ষতি হইল। কারণ ব্রহ্মদেশ তখন এক রকম অজ্ঞাত ছিল, এবং যুদ্ধের বন্দোবস্তেও বিশেষ ত্রুটি ছিল। ব্রহ্মরাজ বৃটিশের আগমনে বাধা দিবার জন্য আরাকান

ব্রহ্মযুদ্ধ

বৃটিশের রেংগুন অধিকার

হইতে নিজের সৈন্য ফিরাইয়া আনিলেন। ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য প্রথম প্রথম কিছু সাফল্য লাভ করিল বটে, কিন্তু সহসা একদিন এক গুলিতে সেনাপতির মৃত্যু হওয়ায়, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং বৃটিশ সৈন্য রাজধানীর কয়েক মাইলের মধ্যে গিয়া পৌছিল। অবশেষে ব্রহ্মরাজ নিরুপায় হইয়া বৃটিশের নির্ধারিত সর্তেই সন্ধি স্বীকার করিলেন। ইয়ান্দাবোর সন্ধি অনুসারে (১৮২৬ খৃঃ) তিনি আসাম, আরাকান, টেনেসেরিমের উপকূল ও মার্তাবানেরও কিয়দংশ ইংরাজের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক কোটি টাকা দিতে এবং একজন বৃটিশ প্রতিনিধিকে তাঁহার সভায় রাখিতে তিনি স্বীকার করিলেন।

ইয়ান্দাবোর সন্ধি

এই সময়ে ভরতপুররাজের একজন জ্ঞাতিভ্রাতা ব্রহ্মযুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ইংরাজের পরাজয়ে উৎসাহিত হইয়া এবং ভরতপুর দুর্গ দুর্ভেদ্য ও অজেয় মনে করিয়া, ভরতপুর-রাজকে পদচ্যুত করিলেন, এবং নিজে রাজা হইয়া বসিয়া ইংরাজের প্রভুত্ব অমান্য করিলেন। ইংরাজগণ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুর আক্রমণ করিয়া জোর করিয়া উহা দখল করিলেন, এবং ইংরাজের মনোনীত রাজাই আবার ভরতপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

ভরতপুরের যুদ্ধ

কতকগুলি পারিবারিক কারণে লর্ড আমহার্ষ্ট পদত্যাগ করিলেন এবং শাসন-পরিষদের প্রাচীনতম সভ্য মিঃ বেইলির হস্তে ভারত-শাসনের ভার অর্পণ করিয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

আমহার্ষ্টের পদত্যাগ

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক। পরবর্তী বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যশস্বী হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার নানাবিধ সামাজিক ও শাসন-সংস্কার ভারতে তাঁহার

কীর্তি অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। এই সংস্কারসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সতীদাহ নিবারণ। হিন্দুগণের মধ্যে মৃত স্বামীর দেহের সহিত পত্নীর পুড়িয়া মরার প্রথা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। অনেক স্থলে পত্নী স্বেচ্ছায়ই পুড়িয়া মরিত, অনেক স্থলে আবার তাহাকে জোর করিয়া মারা হইত। অর্ধ-দগ্ধ পত্নী চিতার আগুন হইতে ছুটিয়া পলাইতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার পিশাচ-সদৃশ আত্মীয়গণ জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া তাহাকে পোড়াইয়া মারিয়াছে, এইরূপ ব্যাপারের বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। বেণ্টিঙ্ক আইন করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করেন।

সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ

ঠগীদমন। 'ঠগী নামক দস্যুদল দমন করিয়া বেণ্টিঙ্ক ভারতবাসীর ধন-প্রাণ নিরাপদ করিয়াছিলেন। বহু প্রাচীন কাল হইতে ঠগীরা সমস্ত ভারতময় নরহত্যা করিয়া বেড়াইত। তাহারা ছদ্মবেশে যাইয়া পথিকগণের সহিত মিশিত এবং সুযোগ পাইলেই পিছন হইতে তাহাদের গলায় রুমাল জড়াইয়া তাহাদিগকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করিত। ঠগীরা দলবদ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করিত এবং তাহাদের ভয়ে লোক নিশ্চিন্তমনে চলাফেরা করিতে পারিত না। স্লীম্যান্ নামক একজন যোগ্য কর্মচারীর সাহায্যে বেণ্টিঙ্ক সম্পূর্ণরূপে ঠগীদল দমন করিলেন।

ঠগীদিগের অদ্ভুত হত্যা পদ্ধতি

অসভ্য জাতির সংস্কার। বেণ্টিঙ্ক কতকগুলি আদিম-নিবাসী অসভ্য জাতিকে সভ্যতার আলোকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নরবলিপ্রিয় মাদ্রাজের খন্দজাতি এবং বাঙলার কোল জাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

খন্দ ও কোল

বেণ্টিঙ্কের শুভ ব্যবস্থার ফলে এই দুই জাতি ধীরে ধীরে সুসভ্য আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হইল।

উচ্চপদে ভারতীয়গণের নিয়োগ। যে মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া বেণ্টিঙ্ক এই সমুদয় সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, সেই মহান্ উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতীয়গণকে বিচার ও শাসন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার রীতি প্রবর্তন করিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন কোম্পানির সনদের আবার নূতন করিয়া মিয়াদ লওয়া হইল, তখন বিশেষ জোর দিয়া ঘোষণা করা হইল যে, যোগ্য ভারতবাসিগণকে শাসনকার্যের সমস্ত বিভাগেই নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে।

কোম্পানির সনদের মিয়াদ বৃদ্ধি

উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা। এই নূতন নীতি কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বেণ্টিঙ্ক ভারতবাসীর উচ্চ শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। উচ্চ শিক্ষার আদান প্রদান ইংরাজী অথবা সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে হইবে, ইহা লইয়া এই সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। একদল বলিলেন, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানই প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত। ইঁহাদের মধ্যে মেকলে ও রাজা রামমোহন রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আবার দেশীয় বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকগণ সংস্কৃত ও আরবী ভাষার এবং দেশীয় ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে গবর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পরিণামে কিন্তু মেকলেপ্রমুখ ইংরাজীনবীশগণেরই জয় হইল। গবর্নমেণ্ট পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থাই দেশে প্রবর্তিত করিলেন। ইংরাজী ভাষার সহায়তায় উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা অতি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন

অল্পকালের মধ্যেই প্রবর্তিত হইয়া গেল এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষাব প্রবর্তনে দেশে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এখন সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। পরে এই বিষয় আরও আলোচিত হইবে। বেণ্টিঙ্ক আদালতে পারস্য ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার প্রচলন করেন, এবং এইরূপে দেশীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা

অন্যান্য সংস্কার। বেণ্টিঙ্ক গবর্নমেণ্টের সকল বিভাগে মিতব্যয়িতার প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং সামরিক বিভাগের ব্যয় কমাইয়া দিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভূমির রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করিয়া এবং অন্যান্য সুব্যবস্থার দ্বারা তিনি রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কর্নওআলিসের শাসন ও বিচার বিভাগের সংস্কারে যে সমুদয় দোষ ত্রুটি ছিল বেণ্টিঙ্ক তাহা দূর করিতে চেষ্টা করেন। বড় বড় চারিটি কেন্দ্রে যে আপীল ও সেসন আদালত ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়া তিনি কয়েকটি জিলার উপর একজন কমিশনার ও প্রতি জিলায় একজন সেসন জজ নিযুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ডেপুটি কালেক্টর ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদের প্রবর্তন করেন।

রাজ্য অধিকার। বেণ্টিঙ্ক কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও কুর্গ এই তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। মহীশূরের রাজার অত্যাচারে ঐ রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, মহীশূর রাজ্যের সহিত ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত অনুসারে বেণ্টিঙ্ক ঐ রাজ্য বৃটিশ শাসনাধীনে আনয়ন করিলেন (১৮৩১ খৃঃ অঃ)।

মহীশূর রাজ্য বৃটিশ শাসনাধীনে আনয়ন

কোম্পানির নূতন সনদ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনদ যে আবার নূতন করা হয়, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদিন চীনের বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার ছিল, এইবার তাহাও ছাড়িয়া দিতে হইল এবং কোম্পানিঃ বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া শুধু শাসন লইয়া থাকিতেই বাধ্য হইলেন। ভারত-শাসনতন্ত্রের নানারূপ পরিবর্তন করা হইল। শাসন-পরিষদে আইন-সদস্য নামক এক চতুর্থ সদস্য নিযুক্ত হইলেন। বাঙলা দেশের গবর্নর অথবা লাটসাহেব সমুদয় ভারতের গবর্নর জেনারেল অথবা বড়লাট হইলেন, এবং "সপারিষদ বঙ্গের বড়লাট" এই নামের পরিবর্তে "সপারিষদ ভারতের বড়লাট" এই নূতন নামকরণ হইল। ভারত-গবর্নমেণ্টকে সমস্ত ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও দেওয়া হইল।

ভারত-শাসন সম্বন্ধীয় পরিবর্তন

বেণ্টিঙ্কের শাসনের সমালোচনা। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংরাজ কবি যে বলিয়াছিলেন—বিনাযুদ্ধেও বিজয়লাভ সম্ভব এবং তাহা যুদ্ধে জয় অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে, বেণ্টিঙ্কের শাসন তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বেণ্টিঙ্ক কোনও উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ জয় করেন নাই, কিন্তু বহুদিনের কতকগুলি কুপ্রথা, কুসংস্কার ও সামাজিক অত্যাচার নিবারণ করিয়া এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া তিনি যে বিজয়মাল্যে বিভূষিত হইয়াছিলেন, শত সমরবিজয় অপেক্ষাও তাহার গৌরব অধিক। লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রতিমূর্তির পাদদেশে মেকলে যে প্রশস্তি খোদিত করাইয়াছিলেন, তাহার নিম্নলিখিত বাক্যটি অতিশয় যথার্থ :—"বেণ্টিঙ্ক কখনও ভুলিয়া যান নাই যে, প্রজাদের মঙ্গলেই শাসনের একমাত্র

বিজ্ঞ সংস্কারক বেণ্টিঙ্ক

তাঁহার জন-প্রিয়তা

সার্থকতা"। আজ পর্যন্তও ভারতবাসিগণ তাঁহার অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন, তাঁহার বিজ্ঞতা ও তাঁহার ন্যায়পরতার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে।

সার্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্। বেণ্টিঙ্কের পরে সার্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্ ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। তাঁহার শাসন-কালের প্রধান ঘটনা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান। মুদ্রাযন্ত্রে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই যাহাতে না ছাপিতে পারে, তজ্জন্য ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এক আইন লিপিবদ্ধ হয়। লর্ড হেষ্টিংস্ ঐ আইন উঠাইয়া দেন এবং উহার পরিবর্তে নিয়ম করিয়া দেন, যে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় দেশীয় সংবাদ-পত্রে আলোচিত হইতে পারিবে না। মেট্‌কাফ্ এই বিধানও উঠাইয়া দেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষগণ কিন্তু মেট্‌কাফের এই বিধানের অনুমোদন করিলেন না এবং মেট্‌কাফ্ পদত্যাগ করিলেন। তিনি মাত্র এক বৎসর কাল বড়লাট-পদে আসীন ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

বৃটিশ বিজয়ের পরিপূর্ণতা

(অক্‌ল্যাণ্ড হইতে ডালহৌসী পর্যন্ত)

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষে আসিয়াই শাসন-বিভাগের বিবিধ শাখার নানারূপ সংস্কার করিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি বলপূর্বক আফগান জাতিকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে বৃটিশের এমন পরাজয় হইল যে, তেমন আর কখনও হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে এই আফগান দমননীতি বৃটিশের রাশিয়া-ভীতিরই ফল। বৃটিশ মন্ত্রীসভার বৈদেশিক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত সদস্য পামারষ্টোন্ এশিয়া মহাদেশে, বিশেষত আফগানিস্থান ও পারস্থে, রাশিয়ার ক্ষমতার দ্রুত প্রসার দেখিয়া শংকিত হইতেছিলেন। আফগানিস্থান তখন পর্যন্ত ভারতের সীমান্তস্থিত রাজ্য ছিল না, কারণ মধ্যে শিখরাজ্যের ব্যবধান ছিল। তথাপি অক্‌ল্যাণ্ডের উপর আদেশ আসিল, আফগানিস্থানে রাশিয়ার প্রভাবের প্রসার নিবারণ করিতে হইবে।

অক্‌ল্যাণ্ডের আফগান-নীতি

রুষ ভীতির ফল

আহম্মদ শাহ্ দুরানীর পৌত্র কাবুলরাজ শাহ্ সুজা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া লুধিয়ানায় বাস-স্থাপন করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দোস্ত্ মুহম্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি কাবুল এবং গজনী অধিকার করেন। শাহ্ সুজা রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অসমর্থ হইয়া লুধিয়ানায় প্রত্যাগমন করেন।

কাবুলের অধিপতি দোস্ত্ মুহম্মদ

অক্‌ল্যাণ্ড দোস্ত্‌ মুহম্মদের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দোস্ত্‌ মুহম্মদ বৃটিশ-রাজ্যের সহিত মিত্রতা স্থাপনের মূল্যস্বরূপ পেশোয়ার প্রদেশ দাবি করিলেন। পেশোয়ার তখন রণজিৎ সিংহের অধিকারে। অক্‌ল্যাণ্ড রণজিৎ সিংহের সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই দোস্ত্‌ মুহম্মদের সহিত মিত্রতার প্রস্তাব আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

দোস্ত্‌ মুহম্মদের সহিত মিত্রতার ব্যর্থ প্রয়াস

প্রথম আফগান যুদ্ধ। অক্‌ল্যাণ্ড তখন স্বরাজ্য হইতে পলায়িত শাহ্‌ সুজাকে আবার কাবুলের সিংহাসনে বসাইয়া, সেখানে বৃটিশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিলেন। তদনুসারে বোলান্‌ গিরিসংকটের পথ দিয়া শাহ্‌ সুজাকে একদল বৃটিশ সৈন্যসহ আফগানিস্থানে প্রেরণ করা হইল। এই যুদ্ধ পরিচালন ব্যবস্থায় নানারকম দোষ ছিল এবং সেনা-নায়কগণের অধিকাংশই অযোগ্য ব্যক্তি ছিল। তথাপি প্রথম প্রথম বৃটিশেরই জয় হইল। জোর করিয়া গজনী অধিকার করা হইল। দোস্ত্‌ মুহম্মদ পলাইয়া গেলেন এবং শাহ্‌ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপিত করা হইল (১৮৩৯ খৃঃ)। কিছুদিন পরে দোস্ত্‌ মুহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল (১৮৪০ খৃঃ)।

প্রথম প্রথম বৃটিশের জয়

অক্‌ল্যাণ্ড দশ হাজার সৈন্য আফগানিস্থানে রাখিয়া বাকি সৈন্য ভারতবর্ষে সরাইয়া আনিলেন। কোথাও কোন গোলযোগ দেখা গেল না। কিন্তু নূতন রাজা আফগান জনসাধারণের চক্ষুঃশূল হইলেন, এবং আফগানিস্থানে স্থিত বৃটিশ সৈন্যদলেও সর্বত্র অযোগ্যতা ও উচ্ছৃংখলতা বিরাজ করিতে লাগিল। ফলে চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দোস্ত্‌ মুহম্মদের পুত্র মুহম্মদ আকবর একজন বৃটিশ

বৃটিশ সৈন্যের উচ্ছৃংখলতা

কর্মচারীকে বধ করে। এই হত্যার প্রতিশোধ না লইয়াই, বৃটিশ সেনাপতি হত্যাকারীর সহিত এক সন্ধি করিলেন। ১৮৪২ খৃঃ ৬ই জানুয়ারি তারিখে সাড়ে চারি হাজার বৃটিশ সৈন্য এবং তাহাদের বার হাজার অনুচর জালালাবাদ যাইবার জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু আফগানগণ বরাবর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, এবং ক্রমশ বৃটিশ সৈন্যের সমূলে ধ্বংস সাধন করিল। কেবল একজন মাত্র বৃটিশ জালালাবাদে পৌছিয়াছিল। বাকি সমস্ত সৈন্য ও অনুচর পথেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

বৃটিশ সৈন্য ধ্বংস

লর্ড এলেন্‌বরা। এই দারুণ দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং তাঁহার স্থানে লর্ড এলেন্‌বরা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। জালালাবাদ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু গজনীস্থিত বৃটিশ সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল এবং শাহ্‌ সুজা আফগানগণ কর্তৃক নিহত হইলেন।

আরও ক্ষতি

এইবার জালালাবাদ হইতে একদল এবং কান্দাহার হইতে আর একদল বৃটিশ সৈন্য কাবুলের দিকে যাত্রা করিল। কাবুল অধিকার করিয়া তাহারা কাবুলের বিস্তৃত বাজার তোপে উড়াইয়া দিল এবং বৃটিশ বন্দীগণকে উদ্ধার করিয়া পেশোয়ারে ফিরিয়া আসিল। এইরূপে বৃটিশ-সম্মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া এলেন্‌বরা আফগানিস্থানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত বোধ করিলেন না, এবং দোস্ত্‌ মুহম্মদকে বিনা সর্তে কাবুলের সিংহাসন ফিরাইয়া দিলেন।

দোস্ত্‌ মুহম্মদকে কাবুলের সিংহাসন প্রত্যর্পণ

সিন্ধুদেশ অধিকার। আমির নামে পরিচিত বেলুচি নায়কগণ সিন্ধুদেশ শাসন করিতেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো

এই আমিরগণের সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতামূলক এক সন্ধি করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এই সন্ধি আবার নূতন করিয়া করা হয়, এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দেও আবার নূতন সন্ধি হয়। আফগানিস্থানের সহিত যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ইংরাজ গবর্নমেণ্ট ঐ সমুদয় সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া সিন্ধুদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিলেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ড ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আমিরগণকে "অধীনতামূলক মিত্রতা" গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়া, তাঁহাদের স্বাধীনতা নাশ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অবশেষে সিন্ধুদেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড এলেন্‌বরা আমিরগণের সহিত বিবাদ বাধাইয়া তুলিলেন। সার্ চার্লস্ নেপিয়ার নামক একজন কর্মচারী বড়লাটের প্রতিনিধিরূপে সিন্ধুদেশে প্রেরিত হইলেন এবং ইঁহার দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া আমিরগণ কর্ণেল আউট্‌রামের আবাস-ভবন আক্রমণ করিলেন। অমনি আমিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিঘোষিত হইল এবং আমিরগণ মিয়ানি ও দাবো নামক দুই স্থানে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন (১৮৪৩)। সিন্ধুদেশ ইংরাজ অধিকারভুক্ত করা হইল এবং আমিরগণ নির্বাসিত হইলেন। এই সিন্ধুদেশ অধিকার সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারই ইংরাজগণের পক্ষে অগৌরবজনক এবং একমাত্র সিন্ধুনদের নিম্নাংশের উপর অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যদ্বারা অনুপ্রাণিত। ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষগণ সিন্ধুদেশ অধিকার সম্পর্কিত কার্যাবলীর ঘোরতর নিন্দাবাদ করিলেন, কিন্তু আমিরগণকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন না।

সিন্ধুদেশের সহিত পুরাতন সন্ধি

আমিরগণের বাধ্য হইয়া অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ

এলেন্‌বরার যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা

বৃটিশের জয়

সিন্ধু অধিকার

গোয়ালিয়র যুদ্ধ। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জংকজী সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পর গোয়ালিয়র রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল। সিন্ধিয়ার

সুশিক্ষিত চল্লিশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে আর কোন শৃংখলা রহিল না এবং ইহারা নিকটবর্তী রাজ্যসমূহের বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য এলেন্‌বরা একদল বৃটিশ সৈন্য পাঠাইলেন। মহারাজপুর ও পানিয়ার নামক দুই স্থানের যুদ্ধে সিন্ধিয়ার সৈন্য পরাজিত হইলে, ১৮৪৩ খৃঃ উচ্ছৃংখল সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইল।

সিন্ধিয়ার পরাজয়

এলেন্‌বরার প্রত্যাগমন। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ করিয়া এলেন্‌বরা এক আইন পাশ করেন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিয়োগের প্রথাও তিনি প্রবর্তন করেন। কিন্তু কোম্পানির কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে ও অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়ায় বিরক্ত হইয়া ভারতশাসন-ভার হইতে অবসর দিয়া, তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন (১৮৪৪)।

দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ

লর্ড হার্ডিং। নূতন বড়লাট সার্ হেন্‌রী (পরবর্তী কালে লর্ড) হার্ডিং ভারতে আগমনের অব্যবহিত পরেই শিখদের সহিত এক ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়েন। স্বনামধন্য রাজা রণজিৎ সিংহের পরিচালনায় শিখগণের শক্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুকালে শিখরাজ্য সিন্ধু হইতে শতদ্রু পর্যন্ত সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ এবং পেশোয়ার, কাংড়া ও কাশ্মীর জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের প্রধান বল ছিল রণজিৎকর্তৃক অপূর্ব শিক্ষায় শিক্ষিত বিখ্যাত খাল্‌সা সৈন্য।

রণজিতের নায়কতায় শিখদের অভ্যুত্থান

খালসা সৈন্য

রণজিতের মৃত্যুর পরে রাজ্যে ভয়ানক বিশৃংখলা ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। তাঁহার আসল ও জাল পুত্রগণের মধ্যে একজনও যোগ্য লোক ছিল না, এবং সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গড়িয়া বিষম

বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। ছয় বৎসর পর্যন্ত দেশে প্রকৃত পক্ষে কোন শাসন-যন্ত্রই বর্তমান ছিল না; ফলে রণজিতের প্রবল প্রতাপশালী খাল্‌সা সৈন্য দেশের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। অবশেষে সৈন্যগণ রণজিতের পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসাইল। সাধারণত তাঁহাকে রণজিতের পুত্র বলিয়াই গণ্য করা হয়; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, তাঁহার মাতা ঝিন্দন একজন নর্তকী মাত্র ছিল। রাজ্যের শাসন প্রকৃত-পক্ষে রাণী ঝিন্দন ও তাঁহার দুই মন্ত্রী লালসিংহ ও তেজসিংহের উপরই ন্যস্ত হইল।

রণজিতের মৃত্যুতে পঞ্জাবে অরাজকতা

রাণী ঝিন্দনের অভিভাবকত্বে দলীপ সিংহ রাজা

প্রথম শিখযুদ্ধ। ক্রমে মদোদ্ধত খাল্‌সা সৈন্য সমস্ত শৃংখলা ও শাসনের বাহির হইয়া পড়িল। এইবার তাহাদের মাথায় খেয়াল চাপিল, তাহারা বৃটিশ রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া ধন-সংগ্রহ করিবে। রাণী ঝিন্দন অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে তদনুরূপ আদেশ দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খাল্‌সা সৈন্য শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া বৃটিশরাজ্য আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের উচ্চ আশা শীঘ্রই ভূমিসাৎ হইয়া গেল। পর পর মুদ্‌কী, ফিরোজ শা (ডিসেম্বর, ১৮৪৫) এবং আলিওয়াল (জানুয়ারি, ১৮৪৬) এই তিনটি যুদ্ধে শিখ সৈন্য ইংরাজ-সৈন্যকর্তৃক পরাজিত হইল এবং শিখেরা শতদ্রু নদীর পশ্চিম পারে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। শেষ যুদ্ধ হইল সোব্রাওঁ নামক স্থানে এবং সেখানেও শিখ-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৬)। শিখেরা এই সকল যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের সাহস ও রণ-কৌশল দেখিয়া শত্রুপক্ষও চমৎকৃত হইয়াছিল এবং ইংরাজপক্ষে দারুণ লোকক্ষয়

যুদ্ধের কারণ

ইংরাজের জয়

হইয়াছিল। সোব্রাওঁর যুদ্ধ জয়ের সংবাদে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বড়লাট ও শিখযুদ্ধের সর্বপ্রধান সেনাপতি সার্ হিউ গফ্‌কে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

লাহোরের সন্ধি। লাহোরের সন্ধিদ্বারা শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির সর্ত ১৮৪৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের আর একটি সন্ধিদ্বারা কতক পরিবর্তিত হইল। মোটের উপর শিখদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইল। উপরন্তু কাশ্মীর প্রদেশ, হাজরা জেলা, বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যস্থিত জালন্ধর দোয়াব এবং শতদ্রুর দক্ষিণদিকস্থ সমস্ত ভূ-ভাগ ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। বালক দলীপ সিংহ নামে রাজা রহিলেন, কিন্তু পঞ্জাবের শাসনভার প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি সার্ হেন্‌রী লরেন্সের হস্তে ন্যস্ত হইল। একদল বৃটিশ সৈন্য লাহোরে স্থাপিত হইল এবং শিখ-সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইল।

ক্ষতিপূরণ

রাজ্যাংশ প্রদান

বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধির হস্তে শাসন-ভার ন্যস্ত

সৈন্যসংখ্যার হ্রাস

ইংরাজগণ শিখদিগের নিকট হইতে যে সমুদয় প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য পচাত্তর লক্ষ টাকা মূল্যে গোলাপ সিংহ নামক একজন ডোগ্‌রা নায়ককে বিক্রয় করা হইল, এবং অবশিষ্ট বৃটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

লর্ড ডালহৌসী। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লর্ড হার্ডিং চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার স্থানে লর্ড ডালহৌসী বড়লাট হইয়া আসিলেন। লর্ড ডালহৌসীর মত যোগ্য ও কর্মদক্ষ বড়লাট ভারতে খুব কমই আসিয়াছেন।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ। শিখদের সহিত সন্ধি বেশি দিন স্থায়ী হইল না। বৃটিশ-শাসনে শিখগণ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। রাণী

যুদ্ধের কারণ

ঝিন্দনকে দেশান্তরে প্রেরণ করাতে তাহারা আরও ক্রুদ্ধ হইল। অবশেষে মুলতানের শাসনকর্তা মূলরাজকে লইয়া গোলযোগ বাধিল। মূলরাজের নিকট হিসাব-নিকাশ দাবি করা হয়। ইহাতে তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হন, এবং যে দুই জন বৃটিশ কর্মচারী তাঁহার স্থলে একজন নূতন শাসনকর্তাকে গদিতে বসাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে হত্যা করেন। ইহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ ডালহৌসী শিখগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

চিলিয়ান্‌ওয়ালায় যুদ্ধ

এই যুদ্ধের জন্য বড়লাট প্রচুর আয়োজন করিলেন এবং স্বয়ং বৃটিশ ও শিখ-রাজ্যের সীমান্তে অগ্রসর হইলেন। ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ান্‌ওয়ালা প্রান্তরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারি তারিখে শিখ ও ইংরাজ-সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। অপরাহ্ণ একটার সময় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সন্ধ্যা পর্যন্তও জয় পরাজয়ের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না; কিন্তু ইংরাজ পক্ষে গুরুতর লোকক্ষয় হইল। এই ভয়ংকর যুদ্ধের সংবাদ বিলাতে পৌঁছিবামাত্র, লর্ড গফ্‌কে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে সরাইয়া সার্ চার্লস্ নেপিয়ারকে নিযুক্ত করা হইল।

গুজরাটের যুদ্ধে বৃটিশের জয়

ইহার কিছুদিন পরে মুলতান আত্মসমর্পণ করিল (জানুয়ারি, ১৮৪৯) ও মূলরাজকে দেশান্তরিত করা হইল। মুলতান অবরোধে যে ইংরাজ-সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তাহাদের দ্বারা স্বীয় সৈন্যের বলবৃদ্ধি করিয়া লর্ড গফ্ চিনাবের তীরে গুজরাট নামক স্থানে আবার শিখ-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯)। লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব ইংরাজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং দলীপ সিংহের জন্য বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল।

পঞ্জাব ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮৫২ খৃঃ)। ব্রহ্ম গবর্নমেণ্ট ইংরাজ বণিকগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল। একজন ইংরাজ কর্মচারী ইহার প্রতীকার করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি ব্রহ্মদেশে পৌছিয়া ব্রহ্মরাজ্যের একখানা ব্রহ্মদেশীয় জাহাজ অধিকার করেন। এইরূপে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা অতি অল্পকালেই পরিসমাপ্ত হয়। ইংরাজগণ যুদ্ধ জয় করিয়া এক ঘোষণা-পত্রদ্বারা পেগু প্রদেশ অধিকার করিলেন।

যুদ্ধের কারণ

পেগু অধিকার

অযোধ্যা অধিকার। ডালহৌসী অযোধ্যার নবাবের কু-শাসনের অজুহাতে অযোধ্যা অধিকার করিলেন। নবাবকে বলা হইল, তিনি যদি সন্ধিপত্রদ্বারা বৃটিশের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন, তবে তাঁহাকে পনর লক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি দেওয়া হইবে, এবং তাঁহার নবাব উপাধিও বজায় থাকিবে। নবাব এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায়, এক ঘোষণা-পত্রদ্বারা তাঁহার রাজ্য অধিকার করা হইল (১৮৫৬ খৃঃ)।

ডালহৌসীর অন্যান্য রাজ্য অধিকার। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহুরাজ্য ডালহৌসীর শাসনকালে ইংরাজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উত্তরাধিকারী-শূন্যতার হেতুবাদেই (Doctrine of Lapse) প্রধানত এই সকল রাজ্য অধিকার করা হয় অর্থাৎ বৃটিশের প্রতিষ্ঠিত ও অধীনস্থ কোনও দেশীয় রাজ্যের অপুত্রক রাজা মরিয়া গেলে, তাঁহার পোষ্যপুত্রকে ডালহৌসী উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতেন না, এবং ঐ রাজ্য বৃটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। এই নীতি কুড়ি বৎসর পূর্বে প্রথম সূচিত হয় এবং বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে।

দত্তকপুত্রের স্বত্ব অস্বীকার

কিন্তু ডালহৌসীই প্রথম এই নীতি অনুসারে কাজ করেন। এই নীতি অনুসারে সাতারা, ঝান্সী ও নাগপুর রাজ্য, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত জৈৎপুর এবং সম্বলপুর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফলে সাতারা ঝান্সী, নাগপুর ইত্যাদি রাজ্য অধিকার

সিকিমের রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দুইজন ইংরাজকে বন্দী করেন। এই অপরাধে ডালহৌসী নেপাল ও ভুটান রাজ্যের মধ্যবর্তী সিকিম রাজ্যের এক অংশ বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া ফেলেন।

সিকিমের এক অংশ অধিকার

অনুরূপ অন্যান্য কার্যাবলী। হায়দ্রাবাদে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যের ব্যয়ভারের জন্য, নিজাম বেরার প্রদেশ এবং অন্যান্য কয়েকটি জেলা বৃটিশের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। বৃত্তিভোগী পেশোয়া বাজীরাওর মৃত্যু হইলে, তাঁহার দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ বা নানা সাহেবকে ডালহৌসী বাজীরাওর বৃত্তি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হইলে ডালহৌসী নবাবী পদ উঠাইয়া দিলেন। তাঞ্জোর রাজ্য সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা হইল।

ডালহৌসীর নীতির সমালোচনা। ডালহৌসীর রাজ্য-অধিকার-নীতি সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অযোধ্যা অধিকার যে জবরদস্তি মাত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পঞ্জাব অধিকারের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধেও সন্দেহ করা যাইতে পারে। কারণ দলীপ সিংহের নাবালক অবস্থায় ইংরাজগণই পঞ্জাবের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। সেই শাসনকালে শিখ-সৈন্য বা শিখ-কর্মচারিগণের কোনও অপরাধের জন্য ন্যায়ত নাবালক দলীপ সিংহ অপরাধী হইতে পারেন না। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ বড়লাটের বিনা

ডালহৌসীর অন্যান্য জবর

অনুমতিতে একজন ইংরাজ কর্মচারীকর্তৃক বিনা কারণেই আরব্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য রাজ্য অধিকার সম্বন্ধেও ডালহৌসীর কার্য সমর্থন করা কঠিন, কারণ দত্তকপুত্র গ্রহণ ভারতবর্ষের চিরাচরিত প্রথা এবং ভারতে চিরদিনই দত্তকপুত্র দত্তকগ্রহণকারীর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই রাজ্য-অধিকার-নীতির জন্য ডালহৌসীই একমাত্র অপরাধী নহেন। কারণ অযোধ্যা ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপারে তিনি কেবল বিলাতের কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু এই রাজ্য-অধিকার-নীতির সমর্থনের প্রধান যুক্তি এই যে, দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি অপেক্ষা ইংরাজপ্রবর্তিত শাসন-পদ্ধতি অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিল। যদি ফলদ্বারাই কার্যের বিচার করিতে হয়, তবে ডালহৌসীর কার্যাবলীর নিন্দা করা যায় না। পরিণামে, ডালহৌসীর এই নীতির ফলে অধিকৃত রাজ্যসমূহের প্রজাসাধারণ অরাজকতা এবং অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তিতে এবং নিরাপদে বাস করিতে পারিয়াছিল। ডালহৌসীর অনুসৃত নীতির অব্যবহিত ফল কিন্তু অন্যরূপ হইল; কারণ, ইহাতে ভারতীয়গণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। এই প্রধূমিত অসন্তোষ-বহ্নিই সিপাহী বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

বিলাতের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

অধিকৃত রাজ্যে প্রজার সুখ শান্তি লাভ

আভ্যন্তরীণ সংস্কার। ডালহৌসী ভারত-শাসনযন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সংস্কার করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। নানারূপ পরিবর্তন সাধন করিয়া তিনি শাসন-পদ্ধতির অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। বঙ্গ-প্রদেশের জন্য ডালহৌসীর

শাসনকালেই একজন ভিন্ন ছোটলাট নিযুক্ত করা হইল। এই সময়ই পূর্ত বিভাগের সৃষ্টি হইল, এবং বড় বড় খাল ও রাস্তার কাজ আরম্ভ হইল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও এক আনা মাশুলে ভারতের সর্বত্র পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা ডালহৌসীর আমলেই প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত "এডুকেশন ডেস্‌প্যাচ" বা "শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় আদেশপত্র" এদেশে পৌছিল এবং ডালহৌসী উহা পাইবামাত্র এই নীতি অনুসারে কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি শিক্ষাবিভাগের সৃষ্টি করিলেন, এবং নানাস্থানে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ডালহৌসী স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতাও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

বঙ্গে নূতন ছোটলাট নিয়োগ

পূর্তবিভাগ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও এক আনা মাশুলের চিঠি

শিক্ষা-বিভাগ

ডালহৌসীর শাসনের সমালোচনা। ডালহৌসীর স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না। ভারতশাসনের গুরুভারে এই স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আশ্চর্য উদ্যমের সহিত ভারতবর্ষ শাসন করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রবল ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট জবরদস্ত-প্রকৃতির লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মতামত অতিশয় উদার ছিল। গুরুতর যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনায় এবং দেশীয় রাজগণের সহিত নানাবিধ রাজনৈতিক ব্যাপারের মীমাংসায় সর্বদা ব্যস্ত থাকিয়াও, তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য এবং দেশবাসিগণের জ্ঞানোন্নতি বিধানের জন্য পরিশ্রম করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহার কার্য-প্রণালী অনেক সময় স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ছিল এবং তাঁহার কতক কার্য নিষ্ঠুর ও অত্যাচারমূলক সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, তাঁহার শাসনকালে ভারতবাসিগণের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল, এবং তিনি যে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ এবং

প্রজার জ্ঞানোন্নতি

ওয়েলেসলীর সমকক্ষ এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বড়লাটগণের একজন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

ভাইকাউণ্ট ক্যানিং। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ডালহৌসীর স্থানে ভাইকাউণ্ট ক্যানিং বড়লাট হইয়া আসিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ভারতে ভীষণ সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গেল।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ। ভারতবাসী সর্বসাধারণের মধ্যে এই সময়ে একটা ঘোর অসন্তোষের এবং অনির্দেশ্য আশংকার ভাব বিরাজ করিতেছিল। দেশীয় রাজগণ দেখিতে-ছিলেন, একটির পর একটি করিয়া দেশীয় রাজ্যসমূহ ইংরাজকর্তৃক অধিকৃত হইতেছে এবং সকলেরই আশংকা হইতে লাগিল যে, এইবার বুঝি তাঁহার নিজের পালা আসিবে। ভূমির নূতন বন্দোবস্তের ফলে প্রজাদের উপর ভূ-স্বামিগণের আর পূর্বের ক্ষমতা রহিল না। জনসাধারণ রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও অন্যান্য নূতন বিধানের প্রবর্তনে সন্দেহাকুলচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যে রকমেই হউক তাহাদের ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট সমস্ত ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল করিতেছেন। অযোধ্যা এবং অন্যান্য রাজ্য বৃটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, ঐ সমুদয় প্রদেশের বহু যুদ্ধব্যবসায়ী বেকার হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সকল বেকার লোক দেশমধ্যে অসন্তোষ বিস্তারের সহায়তা করিতেছিল।

বৃটিশের দেশীয় রাজ্য অধিকারে আশংকা ও অসন্তোষ

খৃষ্টান হইবার ভয়

সৈন্যদলের মধ্যে এন্‌ফিল্ড্‌ রাইফেলের প্রবর্তনই সিপাহী বিদ্রোহের সাক্ষাৎ কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই রাইফেলে টোটা ভরিবার পূর্বে তাহার একাংশ দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত।

সৈন্যদলের মধ্যে গুজব রটিয়া গেল যে, এ টোটার কার্টিজে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই জাতি নষ্ট করিবার জন্য শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত হইয়াছে। পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল যে, সিপাহীদের আশংকা একেবারে অমূলক ছিল না; ঐ কার্টিজ তৈয়ারী করিতে সত্যই শূকর অথবা গরুর চর্বি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

এন্‌ফিল্ড্‌ রাইফেল প্রবর্তনই বিদ্রোহের সাক্ষাৎ কারণ

সিপাহী বিদ্রোহের আরম্ভ। ১৮৫৭ খৃঃ ২৯শে মার্চ তারিখে কলিকাতার নিকটস্থ বারাকপুরে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল এবং সিপাহীরা ক্ষেপিয়া তাহাদের ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে হত্যা করিল। শীঘ্রই মীরাটে এবং লক্ষ্ণৌতেও বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ঐ সকল স্থানে সিপাহীরা একযোগে বিদ্রোহী হইল এবং ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিয়া ও তাহাদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল। শীঘ্রই অন্যান্য বিদ্রোহীর দল দিল্লীতে আসিয়া মিলিত হইল। সেখানে তাহারা ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিয়া মুঘলসম্রাট্‌-বংশীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট্‌ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। বিদ্রোহ শীঘ্রই যুক্তপ্রদেশ, বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য-ভারতের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী ও ঝান্সী বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্রস্থান হইল।

বারাকপুরে বিদ্রোহ আরম্ভ

মীরাট এবং লক্ষ্ণৌ

বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা

বিদ্রোহের বিস্তার

বিদ্রোহ দমন

দিল্লী। আম্বালা হইতে ইংরাজ-সৈন্য অগ্রসর হইয়া দিল্লীর উত্তরস্থ পাহাড় অধিকার করিল। পঞ্জাব হইতে আরও সৈন্য আসিয়া যোগ দেওয়ায় দিল্লী অধিকার করা সম্ভব হইল। ১৪ই

সেপ্টেম্বর তারিখে, দিল্লীর কাশ্মীর ফটক বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইল, এবং কয়েকদিন পরে সহসা আক্রমণ করিয়া দিল্লী নগর অধিকার করা হইল। বীরবর জন নিক্‌লসন্ এই যুদ্ধে হত হইলেন।

লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌর চীফ্ কমিশনার সার্ হেন্‌রী লরেন্স্ ঐ স্থানের সমস্ত ইউরোপীয় অধিবাসীদিগকে লইয়া ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধির আবাস-ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সিপাহী আসিয়া এই ইংরাজদিগকে অবরুদ্ধ করিল। সার্ হেন্‌রীর মৃত্যু হইল, কিন্তু ইংরাজগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। হ্যাভ্‌লক্ ও আউট্‌রামের নায়কতায় নূতন সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছিলে, এই অবরুদ্ধ ইংরাজগণের দুঃখের অবসান হইল (২৫শে সেপ্টেম্বর)। নভেম্বর মাসে সার্ কলিন্ ক্যাম্বেল আসিয়া আবদ্ধ ইংরাজগণকে মুক্ত করেন এবং তাঁহারা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া যান। অবশেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিদ্রোহীগণের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল এবং লক্ষ্ণৌ পুনরধিকৃত হইল।

কানপুর। কানপুরে বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বাজীরাওর দত্তকপুত্র নানা সাহেব। কানপুরে প্রায় এক হাজার ইংরাজ সৈন্য ও ইংরাজ অধিবাসী একটা কাঁচা দেওয়ালের আড়ালে কোনমতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। নানা সাহেব আশ্বাস দিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে দিবেন। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা নদীর ধারে যাইবামাত্র বিদ্রোহিগণ গুলিবর্ষণ করিয়া তাহাদের প্রায় সকলকেই হত্যা করিল। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডেও সন্তুষ্ট না হইয়া নানা সাহে

কানপুরের বিদ্রোহের নায়ক নানা সাহেব

নানার বিশ্বাসঘাতকতা

তাঁহার হস্তে বন্দী প্রায় দুইশত রমণী ও শিশুকে হত্যা করিয়া নিকটবর্তী এক কূপে তাহাদের দেহ নিক্ষেপ করিলেন (১৫ই জুলাই)। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মত পৈশাচিক ব্যাপার সমগ্র সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। ১৭ই জুলাই তারিখে হ্যাভ্‌লক্ কানপুরের উদ্ধার সাধন করিলেন এবং নানা সাহেব ও তাঁহার সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি পলাইয়া গেলেন। পরে কানপুর আর একবার বিদ্রোহীদের হস্তে পতিত হয়, এবং স্যার্ কলিন্ ক্যাম্বেল ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ইহার পুনরুদ্ধার করেন।

তাঁতিয়া টোপি

বেরিলী। এখানে মে মাসে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া রোহিলা যুদ্ধে হত রোহিলা নায়ক হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্রকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। এক বৎসর পরে স্যার্ কলিন্ ক্যাম্বেল এই নগর পুনরায় অধিকার করেন (মে, ১৮৫৮)।

ঝান্সী। এই স্থানে জুন মাসে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিল। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, উত্তরাধিকারী-শূন্যতার অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী ঝান্সী রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ঝান্সীর বিংশতিবর্ষ বয়স্কা বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাই স্বীয় রাজ্যের পুনরুদ্ধার মানসে বিদ্রোহিগণের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহিগণের মধ্যে যত নায়ক দাঁড়াইয়াছিল, সাহসে ও বীর্যবত্তায় লক্ষ্মীবাইর সহিত তাহাদের একজনেরও তুলনা হইতে পারে না। রাণী লক্ষ্মীবাইর শৌর্যের কাহিনীতে সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসের এক অধ্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। পুরুষের বেশে তরবারি হস্তে

রাণী লক্ষ্মীবাই

তাঁহার শৌর্য

ঝান্সী পুনরধিকৃত

যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি সমরক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জন করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ঝান্সী পুনরায় অধিকৃত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসান। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ এক রকম শেষ হইয়া যায়। ঝান্সীর রাণী ছাড়া সিপাহীদের কোনও যোগ্য নায়ক ছিল না। নানা সাহেব কানপুর হইতে পলাইয়া গেলেন এবং তাঁহার কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না। তাঁহার সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি ঝান্সীর বিদ্রোহে আসিয়া যোগ দিল, কিন্তু ধৃত হইয়া ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিল। যে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহীরা দিল্লীতে সম্রাট্ করিয়াছিল, তিনি জীবনের অবশিষ্ট চারিবৎসরকাল রেংগুনে নির্বাসিত অবস্থায় কাটাইলেন। তাঁহাব দুই পুত্র এবং এক পৌত্র লেফ্‌টেনাণ্ট হড্‌সন্‌কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন। প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যের রাজাগণ কেহই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। তাঁহাদের রাজভক্তির জন্য তাঁহারা উপযুক্ত প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। শিখগণও বিদ্রোহে যোগদান করে নাই এবং পঞ্জাবের শাসনকর্তা সার্ জন্ লরেন্স্ পঞ্জাব হইতে যে সৈন্যদল পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন. তাহার সহায়তায় দিল্লী অধিকৃত হওয়ায় বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়।

নায়কের অভাব

নানার পলায়ন

তাঁতিয়ার ফাঁসী

বাহাদুর শাহের নির্বাসন

দেশীয় রাজ্য সমূহের বিশ্বস্ততা

শিখগণের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন

বিদ্রোহ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ব্যবস্থায়ই লর্ড ক্যানিং অসাধারণ ধৈর্য ও বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। হীন প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া মূঢ় বিদ্রোহিগণের প্রতি তিনি কঠোর শাস্তিবিধান করেন নাই। এই মহাপ্রাণ ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা তাঁহার পদোচিত অসাধারণ করুণা এবং সংযম সহকারে বিদ্রোহের শেষ উত্তাপ উপশমিত করিয়াছিলেন। ঐ যুগের

ক্যানিংএর দূরদর্শিতা

অগ্নিশর্মা, অদূরদর্শী ইংরাজগণ রক্তপাতের বিনিময়ে রক্তপাতের জন্য চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ক্যানিংকে উপহাস করিয়া "দয়ার অবতার ক্যানিং" (Clemency Canning) এই আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই উপহাসাত্মক আখ্যাই আজ লর্ড ক্যানিংএর শ্রেষ্ঠ গৌরব-সূচক উপাধি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

অষ্টম অধ্যায়

বৃটিশ-সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষ

কোম্পানির রাজত্বের বিলোপ। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতশাসন-বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা চিরদিনের মত উঠিয়া গেল। এই ভয়ংকর বিদ্রোহ এবং ইংরাজ নরনারীর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ বিলাতে পৌঁছিলে, এত বড় একটা দেশের শাসনভার একটা বণিক কোম্পানির উপব ফেলিয়া রাখা যে কিরূপ অসঙ্গত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২রা অগষ্ট তারিখে, ভারতে উন্নততর শাসন-বিধানের জন্য আইন প্রণয়ন করা হইল, এবং বৃটিশরাজের হস্তে ভারতশাসনেব ভার অর্পণ করা হইল। বোর্ড অব্ কনট্রোলের প্রেসিডেণ্টের স্থানে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ নামে এক মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন, এবং কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের স্থান কাউন্সিল্ অব্ ইণ্ডিয়া বা ভারত-পরিষদ্ গ্রহণ করিল। এখন হইতে বড়লাটের আখ্যা হইল ভাইস্‌রয় বা রাজপ্রতিনিধি অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের রাজার প্রতিনিধি।

মহারাণীর ঘোষণা-পত্র। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে ভারতশাসন-বিধানের এই সকল গুরুতর পরিবর্তন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণা-পত্রদ্বারা ভারতীয় জনসাধারণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকটে বিজ্ঞাপিত হয়। বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া এই ঘোষণা-পত্র বিভিন্ন স্থানে সর্ব-

সাধারণের সমক্ষে পাঠ করা হয়। বৃটিশ-রাজের ভারতশাসন-নীতি সম্বন্ধীয় প্রথম লিখিত দলিল বলিয়া, এই ঘোষণা-পত্রের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই দলিলের প্রধান প্রধান কথাগুলির সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্যানিং প্রথম রাজপ্রতিনিধি

বড়লাট ক্যানিং প্রথম রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারিগণকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখা হইল; প্রচলিত সমস্ত সন্ধি বলবৎ বলিয়া স্বীকৃত হইল এবং ইংরাজরাজের যে আর রাজ্য বিস্তৃতির আকাংক্ষা নাই, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলা হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বত্ব, মর্যাদা ও সম্মান সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিবেন এবং তাঁহার ভারতীয় প্রজাগণ ও অন্য প্রজাগণের মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকিবে না। ভারতীয় প্রজাগণের কাহারও ধর্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খৃষ্টান করিবার ইচ্ছা বা অধিকার যে ইংরাজরাজের নাই, এবিষয়েও আশ্বাস দেওয়া হইল। মহারাণী আরও আশা দিলেন যে, ভারতের প্রাচীন আচার, ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম, এবং দেশ-প্রচলিত প্রথাসমূহের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে, এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অপক্ষপাতে ভারতবাসিগণকে সরকারী কর্মে নিযুক্ত করা হইবে।

পুরাতন সন্ধি সম্মানিত

ধর্মসম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা

সরকারী চাকুরী দানে নিরপেক্ষতা

ঘোষণা-পত্রের শেষ অংশ সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধীয়। দয়াশীলা মহারাণী ঘোষণা করিলেন যে, বিদ্রোহিগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কর্মে পুনরায় রত হইলে, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কেবল যাহারা ইংরাজ নরনারীর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, এবং বিদ্রোহের নায়কতা করিয়াছিল,

বিদ্রোহীদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

তাহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইল। এই উদার ঘোষণা-পত্র যে ভারতের প্রজাগণের স্বাধীনতার পক্ষে শ্রেষ্ঠ দলিল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ইহাতে যে সকল নীতি বিঘোষিত হইয়াছিল, বৃটিশ শাসনকর্তাগণ সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সে সমুদয়ই ভারতশাসনের মূলনীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

ক্যানিং-এর শাসন সংস্কার। বিদ্রোহ-বহ্নি সম্পূর্ণ নির্বাপিত হইয়া গেলে, ক্যানিং সামরিক সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি সৈন্যদলে বৃটিশ সেনার পরিমাণ বাড়াইলেন, এবং গোলন্দাজ সৈন্য বিভাগের ভার সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের হাতে রাখিলেন।

সমর-বিভাগের সংস্কার

অন্যান্য সংস্কার। ইউরোপীয় নীলকরগণ বঙ্গীয় কৃষকগণের উপর এমন অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল যে, কৃষক ও নীলকরের মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতেছিল। অনুসন্ধানে প্রজাদের অভিযোগ অনেকাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় প্রজাদের দুঃখ কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা হইল। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণে' বঙ্গীয় কৃষককুলের উপর নীলকরগণের লোমহর্ষণ অত্যাচারের জীবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

নীলকরের অত্যাচার হইতে প্রজার রক্ষণ

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রেণ্ট্ অ্যাক্ট্ বা খাজানার আইন পাশ হইল, এবং এই আইনের ফলে প্রজাদের উপর জমিদারের অত্যাচার অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল।

খাজানার আইন

এই বৎসরই ক্যানিং দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার অস্বীকার-পূর্বক রাজ্য অধিকারের নীতি (Doctrine of Lapse) পরিত্যাগ করিলেন এবং দত্তকপুত্রের অধিকার স্বীকৃত হইল। ১৮৬১

পোষ্যপুত্রের অধিকার স্বীকার

খৃষ্টাব্দে ফৌজদারি আইনগুলি দণ্ডবিধি আকারে ধারাবদ্ধ হইয়া বিচারকার্যের অনেক উন্নতি সাধন করিল এবং প্রাচীন সুপ্রিম কোর্টগুলি উঠিয়া গিয়া, তাহাদের স্থানে হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হইল। ঐ বৎসরই ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল অ্যাক্ট্ (ভারতীয় শাসন-পরিষদ্ বিধি) প্রবর্তিত হইল এবং ঐ বিধি অনুসারে লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল্ বা ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সভ্য নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। এই সমস্ত সভ্যই অবশ্য গবর্ণমেণ্ট-কর্তৃক মনোনীত হইতেন। আয়ব্যয়-বিভাগের পরিচালনায়ও ক্যানিং নানাবিধ সংস্কারের প্রবর্তন করিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে রাজস্ব অনেক বাকী পড়িয়া গিয়াছিল। সমর-বিভাগের ব্যয় সংকোচ করিয়া এবং ইন্‌কাম্ ট্যাক্স ইত্যাদি নূতন ট্যাক্সের প্রবর্তন করিয়া ক্যানিং সেই ক্ষতিপূরণ করিলেন। এই সময়ে কারেন্সী নোটের প্রচলন করা হয়।

ফৌজদারি দণ্ডবিধি প্রণয়ন

হাইকোর্ট

শাসন-পরিষদ আইন

অর্থনৈতিক সংস্কার

নোটের প্রচলন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বেণ্টিঙ্কের আমলে এদেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে যে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহারই ফলস্বরূপ কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষে যে কত দিক দিয়া কত উপকার হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই সামান্য আরম্ভ হইতেই ক্রমে ক্রমে আজ আঠারটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভারতবর্ষে ছড়াইয়া দিতেছে। আজ নবীন ভারতবর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমরা যে গর্ব অনুভব করি, এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিতরিত বিবিধ বিদ্যার উদার ভিত্তির উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ। ক্যানিং-এর ভারতশাসনের শেষ বৎসর ভারতবর্ষে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং গবর্নমেণ্টকর্তৃক খাদ্য সরবরাহের চেষ্টা সত্ত্বেও বহুলোক প্রাণত্যাগ করে।

লর্ড এল্‌গিন্‌ (১৮৬২)। ক্যানিং-এর পরে লর্ড এল্‌গিন্‌ বড়লাট নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন, কিন্তু এক বৎসর পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার শাসন-কালের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মান্ধ একদল মুসলমানের বিদ্রোহ নিবারণ।

ওহাবী দমন

সার্‌ জন্‌ লরেন্স্‌ (১৮৬৪-১৮৬৯)। পঞ্জাব অধিকারের পর হইতে সার্‌ জন্‌ লরেন্স্‌ অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে পঞ্জাব শাসন করিতেছিলেন। এইবার তাঁহাকেই বড়লাট নিযুক্ত করা হইল। তিনি দেশশাসনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতিবিধানে মনোযোগী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নূতন আইন প্রণয়ন করিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের পূর্বকূলে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ লাগিয়া গেল, এবং যথাসময়ে গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করিতে না পারায়, উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রায় দশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। লরেন্সের শাসন-কালের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভুটান যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে ভুটানরাজ্যের কিয়দংশ ইংরাজগণ অধিকার করিলেন।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ

ভুটান যুদ্ধ

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-১৮৭২)। লরেন্সের পরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো ভারতে বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি ভারতশাসনের, বিশেষত আয়-ব্যয় এবং পূর্ত বিভাগের অনেক

বিবিধ সংস্কার

উন্নতিসাধন করেন। পূর্ববর্ত্তী বড়লাটের শাসনকালে আফগানিস্থানের সহিত একটু মনোমালিন্যের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু মেয়োর আমলে আবার পূর্বের বন্ধুভাব ফিরিয়া আসিল, এবং আফগানিস্থানের আমির শের আলির সহিত আম্বালায় সাক্ষাৎ করিয়া মেয়ো সেই বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করিলেন। মেয়োর শাসনকালের অন্য দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা,—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরার ভারতে আগমন এবং ভারতীয় রাজকুমারগণের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য আজমীরে মেয়ো কলেজের প্রতিষ্ঠা। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে মেয়ো আন্দামান দ্বীপস্থিত বন্দী-নিবাস দেখিতে গিয়াছিলেন। সেইখানে এক মুসলমান কয়েদীর ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন।

আফগানিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব

ডিউক্ অব্ এডিনবরার ভারতে আগমন

মেয়ো কলেজ প্রতিষ্ঠা

লর্ড মেয়োর হত্যা।

লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-১৮৭৬)। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক বড়লাট হন। তাঁহার শাসন-কালের বিখ্যাত ঘটনা বরোদার গাইকোয়াড় মল্হর রাওর পদচ্যুতি। গাইকোয়াড় রাজ্য-শাসনে নিতান্ত অযোগ্য ছিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধি কর্ণেল ফেয়ার তাঁহার শাসনের দোষাবলী উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন, এইজন্য গাইকোয়াড নাকি বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। গাইকোয়াড়ের বিচারের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের ভারতীয় সদস্য তিনজন গাইকোয়াড়কে নির্দোষ বলিলেন, কিন্তু ইংরাজ সদস্যগণ তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। অতঃপর ভারত গবর্নমেণ্ট গাইকোয়াড়ের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু শাসনে অক্ষমতা ও গুরুতর কু-শাসনের জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। মল্হর রাওর আত্মীয় সয়াজী রাও নামক এক বালককে

গাইকোয়াড়ের পদচ্যুতি

সিংহাসনে স্থাপিত করা হইল। দেশীয় রাজগণের মধ্যে বর্তমানে গাইকোয়াড় সয়াজি রাও একজন যোগ্যতম রাজা এবং তাঁহার সুযোগ্য ও সুফলপ্রদ ব্যক্তিগত শাসনে বরোদা রাজ্যের অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বঙ্গ ও বিহারে দুর্ভিক্ষ

এই সময়ে বাঙলা ও বিহার প্রদেশে এক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং দুর্ভিক্ষকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্নমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। মহারাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ (যিনি পরে সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওআর্ড হইয়াছিলেন) এই সময়ে ভারতে আগমন করেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভারতে আগমন

আফগানিস্থানের আমিরের সহিত বন্ধুভাব বজায় রাখিতে নর্থব্রুক তেমন যত্ন করিলেন না, এবং আমির রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে রক্ষণশীল দলের হস্তে শাসনভার যাওয়ায় এই নূতন দলের নূতন ভারত-সচিব লর্ড নর্থব্রুককে আফগানিস্থানের প্রতি এক নূতন নীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের সহিত লর্ড নর্থব্রুকের বনিবনাও না হওয়াতে, ১৮৭৬ খৃঃ তিনি পদত্যাগ করিয়া গেলেন।

নর্থব্রুকের পদত্যাগ

লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০)। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড লিটন বড়লাট হইয়া আসিলেন। লর্ড লিটন প্রস্তাব করিলেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সমগ্র ভারতের অধিরাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। ১৮৫৮খৃষ্টাব্দের ঘোষণায় ভিক্টোরিয়া মাত্র ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের মহারাণী বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন, এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ মিত্ররাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

মহারাণীর অধিরাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ

এই নূতন বন্দোবস্তে দেশীয় রাজ্যসমূহও প্রকারান্তরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। অবশ্য এই পরিবর্তন কেবল বাহ্য পরিবর্তনমাত্র, কারণ দেশীয় রাজগণ বৃটিশরাজকে পূর্বেই অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং বৃটিশরাজও দারকার হইলেই দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অধিরাজ-ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে ক্রটী করেন নাই। বিলাতের কর্তৃপক্ষ লর্ড লিটনের প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে মহাসমারোহে দিল্লীতে এক দরবারের অনুষ্ঠান হয় এবং দিল্লীর দরবার
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের অধিরাজ্ঞী বলিয়া বিঘোষিত হন।

১৮৭৬-৭৮ সালের ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল এবং পর বৎসর উহা মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। এইরূপে দিল্লীর দরবারের আনন্দ সমারোহ লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতের কাতর চীৎকারে ডুবিয়া গেল। লর্ড লিটন দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে এক অতি উত্তম প্রথার প্রবর্তন করিলেন এবং প্রচলিত পদ্ধতির অনেক সংস্কার সাধন করিলেন। কিন্তু তাঁহার দারুণ লোকক্ষয়
প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কেবল ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ও তাহার প্রতীকার নির্ণয় করিবার জন্য এক দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত হইল। এই কমিশন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ কমিশন
রিপোর্ট দাখিল করিল, বর্তমান কালের দুর্ভিক্ষ প্রতীকার নীতির তাহাই মূলভিত্তি।

অবাধ বাণিজ্য। লর্ড লিটন ভারতে অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রচলন করেন। এ পর্যন্ত ভারতে যে সমুদয় জিনিষ

আমদানী হইত, তাহার প্রায় প্রত্যেক জিনিষের উপরই ট্যাক্স ধার্য ছিল। কিন্তু অবাধ বাণিজ্য প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমত কতকগুলি জিনিষির উপর হইতে ট্যাক্স উঠাইয়া লওয়া হইল।

দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইন এবং অস্ত্র আইন। দুইটি বিষয়ে লর্ড লিটন ভারতবাসীর স্বাধীনতা গুরুতররূপে খর্ব করিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষায় প্রচলিত সংবাদপত্র দমন করিবার জন্য তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এক আইন (Vernacular Press Act) প্রণয়ন করিয়া সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার পথে গুরুতর বাধা জন্মাইয়াছিলেন। সর্বসাধারণের ধারণা এই যে, তৎকালের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী বাঙলা ভাষায় প্রচলিত অমৃতবাজার পত্রিকাকে দমন করিবার জন্যই লর্ড লিটন এই আইনের প্রবর্তন করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ কিন্তু সুকৌশলে সপ্তাহের মধ্যে বাঙলার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষায় পত্রিকা চালাইয়া এই আইনের কবল হইতে আত্মরক্ষা করেন। অস্ত্র আইনের (Arms Act) ফলে "পাশ" ব্যতীত অস্ত্র রাখা ভারতবাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ হয়।

সংবাদপত্র আইন

অস্ত্র আইন

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আফগানিস্থানের আমির শের আলি ইংরাজগণের প্রতি বিমুখ হইয়া রাশিয়ার সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার রাজ-শক্তির দ্রুত প্রসারে ইংরাজ রাজনৈতিকগণ শংকিত হইতেছিলেন, এবং আফগানিস্থান ও রাশিয়ার সন্ধি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর নহে বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা বদ্ধমূল হইল।

আফগানিস্থানের আমিরের সহিত রুষের মিত্রতা

বিলাতের কর্তৃপক্ষের সহিত একমত হইয়া লর্ড লিটন প্রথম হইতেই আফগানিস্থানের দিকে খর-দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, এবং খেলাতের খাঁর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সামরিক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান কোয়েটা নামক স্থান অধিকার করিলেন (১৮৭৬)। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আফগান আমির রাশিয়ার রাজদূতকে অভ্যর্থনা করিয়া এবং ভারতের বড়লাট-প্রেরিত দূতকে অভ্যর্থনা করিতে অস্বীকার করিয়া, রাশিয়ার প্রতি তাঁহার মিত্রতার প্রকাশ্য প্রমাণ দিলেন। অতএব ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিঘোষিত হইল এবং তিন দল বৃটিশ সৈন্য তিন দিক হইতে ঐ দেশের দিকে অগ্রসর হইল। শের আলি রাশিয়া রাজ্যে পলাইয়া গেলেন এবং সেইখানে কিছুদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শের আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁ বৃটিশের সহিত সন্ধি করিয়া যুদ্ধ শেষ করিলেন। এই গণ্ডামুকের সন্ধির সর্তে কাবুলে যাইবার গিরিসংকটগুলি বৃটিশের অধিকারে আসিল এবং স্থির হইল যে, আফগানিস্থানের বৈদেশিক নীতি কাবুলস্থিত ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইবে (১৮৭৯)।

রুষ দূতের সসম্মানে অভ্যর্থনা কিন্তু বৃটিশ দূতের প্রত্যাখ্যান

যুদ্ধ

সন্ধি

এই বন্দোবস্ত অনুসারে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সার্ লুই ক্যাভেক্নরী কাবুলে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি আফগান সৈন্যগণকর্তৃক সদলবলে নিহত হইলেন। সম্ভবত এই ব্যাপারে আমিরেরও কিছু হাত ছিল।

বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধির হত্যা

কালবিলম্ব না করিয়া এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে লর্ড লিটন সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং কাবুল ও কান্দাহার

বৃটিশ সৈন্যকর্তৃক অধিকৃত হইল। এই সময়ে বিলাতে মন্ত্রী-পরিবর্তন হইল এবং ডিজ্‌রেইলির স্থলে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ মন্ত্রী হইয়া ডিজ্‌রেইলীর আফগান নীতি উল্টাইয়া দিলেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন পদত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার স্থানে লর্ড রিপণ বড়লাট হইয়া আসিলেন।

লর্ড লিটনের পদত্যাগ

লর্ড রিপণ। (১৮৮০-১৮৮৪)। কিন্তু অনতিবিলম্বেই মাইবান্দ নামক স্থানে শের আলির পুত্র আয়ুব খাঁ ইংরাজ-সৈন্যকে পরাজিত করিল এবং ইংরাজ-সৈন্য কান্দাহারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল (জুলাই, ১৮৮০)। সংবাদ পাইবামাত্র সেনাপতি রবার্টস্ কাবুল হইতে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং তেইশ দিনে ৩২০ মাইল দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া কান্দাহারের দুঃস্থ সৈন্যদলকে উদ্ধার করিলেন। বৃটিশ সৈন্য কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া আসিল। অবশেষে শের আলির ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান্ আফগানিস্থানের সিংহাসন লাভ করিলেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বহিঃশত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আবদুর রহমানের আফগানিস্থানের সিংহাসন লাভ

লর্ড রিপণের উদার কার্যাবলী। পঞ্চাশ বৎসর বৃটিশ-শাসনের পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ মহীশূরের রাজার হস্তে মহীশূর ফিরাইয়া দিলেন। এই বৎসরই প্রথম আদমসুমারি বা লোকগণনার প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই প্রথা আজও চলিয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেক দশ বৎসর পর পরই লোক গণনা হইয়া থাকে। লর্ড রিপণ তাঁহার পূর্ববর্তী লর্ড লিটনকর্তৃক প্রবর্তিত অবাধ বাণিজ্য-নীতি আরও প্রসারিত করিলেন এবং প্রায় সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। তিনি

মহীশূর প্রত্যর্পণ

আদমসুমারি

রায়তদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বিষয়ক আইনটি তিনি পাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্তীর আমলে উহা পাশ হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র দমন সম্বন্ধীয় আইনটি (Vernacular Press Act) তুলিয়া দিলেন।

দেশীয় সংবাদ-পত্র আইনের বিলোপ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। পরবর্তী তিন বৎসরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self-Government), প্রবর্তন মানসে তিনি কয়েকটি আইন পাশ করেন। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ক্ষমতা এই সকল আইনের বলে বর্ধিত হইল এবং ইহাতে বে-সরকারী সভাপতি বা চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থাও হইল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা করিবার জন্য জিলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড স্থাপিত হইল। এই সকল বোর্ডের সভ্যগণ স্থানীয় জনগণকর্তৃক নির্বাচিত হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হইল। এইরূপে যে সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হইল, উহা পরবর্তীকালের বিস্তৃততর শাসন সংস্কারের অগ্রদূত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ইহার ফল

ইলবার্ট বিল। আইনের চক্ষে ভারতবাসী ও ইউরোপীয়-গণের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়া লর্ড রিপণ ভারতবাসীর প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে বিল পাশ করিতে চেষ্টা করেন, আইনসদস্য মিঃ ইলবার্টের নাম অনুসারে তাহা ইলবার্ট বিল বলিয়া পরিচিত। এই আইনে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে ইউরোপীয়গণের বিচার করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন

বিলের প্রত্যাহার

প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইল যে, গবর্ণমেণ্ট এই বিল প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন।

লর্ড রিপণের পদত্যাগ

লর্ড রিপণের জনপ্রিয়তা। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লর্ড রিপণ পদত্যাগ করিলেন। ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষের শাসনকর্তাগণ ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করিবেন, জনহিতকর অনুষ্ঠান সকল সম্পাদিত করিবেন, এবং ভারতীয় প্রজার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতের শাসন-যন্ত্রের পরিচালনা করিবেন। লর্ড রিপণ এই উদারনীতি সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ভারতবাসীরও তাঁহার প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতির সীমা ছিল না। তাঁহার বিদায়ের প্রাক্কালে তাঁহার প্রতি বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তাহারা সেই প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল। বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহাকে শত শত অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল, এবং সিমলা হইতে বোম্বে পর্যন্ত তাঁহার যাত্রা এক প্রকাণ্ড বিজয়যাত্রার মত মনে হইতে লাগিল। অন্য কোনও বড়লাট ভারতবাসিগণের এমন অকৃত্রিম প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন নাই।

লর্ড রিপণের ভারত-প্রীতি

লর্ড ডাফ্‌রিণ। (১৮৮৪-৮৮ খৃষ্টাব্দ)। লর্ড রিপণের পরবর্তী বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিণ একজন সুযোগ্য ও কর্মকুশল লোক ছিলেন। তিনি আফগানিস্থানের আমিরের সহিত রাওলপিণ্ডিতে সাক্ষাৎ করিয়া আফগানিস্থানের সহিত মিত্রতা-বন্ধন দৃঢ় করিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমিরকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তদুপলক্ষে ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে মহাসমারোহে সুবর্ণ জুবিলীর আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করা হইল। এই উপলক্ষে সমস্ত ভারতময় এক স্বত উচ্ছৃসিত রাজভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইল (১৮৮৭ খৃঃ)। মহারাণীর সুবর্ণ জুবিলী

সিন্ধিয়াকে ঝান্সীর বদলে গোয়ালিয়র ও মোরার এই দুইটি প্রধান দুর্গ প্রদান করিয়া লর্ড ডাফ্‌রিণ তাঁহার অসন্তোষ নিবারণ করিলেন। তিনি বঙ্গ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবের জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন পাশ করিয়া, কৃষকগণের দুঃখ কতকটা দূর করিলেন (১৮৮৫-৮৭ খৃঃ)। সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়র প্রত্যর্পণ প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইল। এই কংগ্রেস ক্রমে ক্রমে ভারতে একটি প্রধান রাজনৈতিক-সমিতিতে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন

তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ। ব্রহ্মরাজ থিব ফরাসীদের সহিত যোগ দিয়া ইংরাজ বণিকগণের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। লর্ড ডাফ্‌রিণ ব্রহ্মরাজের নিকট হইতে কোনও প্রতীকার না পাইয়া ব্রহ্মদেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং অল্লায়াসেই রাজধানী মান্দালয় অধিকার করিলেন (১৮৮৫)। ব্রহ্মরাজ থিব সপরিবারে ভারতে নির্বাসিত হইলেন এবং সমগ্র উত্তর ব্রহ্মদেশ ইংরাজ-রাজের অধিকারে আসিল (১৮৮৬)। এইরূপে তিনটি যুদ্ধে সমগ্র ব্রহ্ম রাজ্য অধিকৃত হইল। ব্রহ্মদেশ অধিকার

লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন (১৮৮৮-১৮৯৪)। বৃদ্ধ বয়সে ভারত শাসনের গুরুভার বহন করিতে না পারিয়া লর্ড ডাফ্‌রিণ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলেন। তিনি মার্কুইস্ অব্ ডাফ্‌রিণ এণ্ড

আভা এই উপাধিতে ভূষিত হইলেন এবং লর্ড ল্যান্সডাউন তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

লর্ড ল্যান্সডাউন আফগানিস্থানের সহিত প্রাচীন বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া চলিলেন। আমিরের বার্ষিক বৃত্তি বার লক্ষ হইতে বাড়াইয়া আঠার লক্ষ টাকা করা হইল এবং বৃটিশ ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখা সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য সার্ মার্টিন ডুরাণ্ড্ বিশেষ দূতরূপে প্রেরিত হইলেন। হুজা ও নাগর নামক দুইটি সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দৃঢ়ীকৃত হইল।

আমিরের বৃত্তি বৃদ্ধি

মণিপুর যুদ্ধ। এই সময় ভারতের পূর্ব সীমান্ত মণিপুরে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া মণিপুর রাজ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ভারত গবর্নমেণ্ট মণিপুরের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে নির্বাসিত করিতে মনস্থ করিলেন, এবং আসামের চীফ্ কমিশনার মিঃ কুইন্‌টন্ যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য মণিপুরে প্রেরিত হইলেন। টিকেন্দ্রজিৎ কিন্তু সহজে বশ মানিল না, এবং দেখা-সাক্ষাতের ছলে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কুইন্‌টন্ এবং তাঁহার কয়েকজন অনুচরকে বন্দী ও হত্যা করিল। অনুচরবর্গসহ ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়া টিকেন্দ্রজিৎ এই ঘৃণিত হত্যাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিল। একটি বালককে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাঁহার নাবালক অবস্থায় একজন ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির হস্তে মণিপুরের শাসনভার অর্পিত হইল।

ইংরাজ কর্মচারীর হত্যা

টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসী

নূতন বন্দোবস্ত

শাসন সংস্কার। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শাসন-পরিষদ্ সম্বন্ধীয় এক আইন হইল। এই আইনের ফলে ব্যবস্থাপক সভার

ক্ষমতা বর্ধিত হইল এবং দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ইহার সভ্য নির্বাচন করিবার অধিকার পাইল। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ গবর্নমেণ্টের আয় ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা, এবং সাধারণ শাসন প্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইলেন। শাসন-পরিষদ্ আইন

সামরিক বিভাগে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তিত হইল। সামরিক সংস্কার প্রাদেশিক সেনাপতির পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা বর্ধিত হইল।

দ্বিতীয় লর্ড এল্‌গিন্ (১৮৯৪-১৮৯৯)। পূর্ববর্তী এক বড়লাট (১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) লর্ড এল্‌গিনের পুত্র দ্বিতীয় লর্ড এল্‌গিন্ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্সডাউনের পরে বড়লাট হইয়া আসিলেন।

সীমান্ত রেখা নির্ণয়। লর্ড এল্‌গিন্ পামির পাহাড়কে বৃটিশ ভারত ও রুষ রাজ্যের মধ্যে সীমারূপে নির্দেশ করিলেন। অতঃপর আফগানিস্থান ও বৃটিশ ভারতের এবং চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখাও নির্দিষ্ট হইল।

সীমান্ত যুদ্ধ। চিত্রলের সিংহাসনের অধিকার লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইলে, পার্বত্যজাতিকর্তৃক তথাকার বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধি অবরুদ্ধ হইলেন। অতএব ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে চিত্রলে এক অভিযান প্রেরিত হইল এবং গোলযোগের প্রবর্তকগণকে শাস্তি দেওয়া হইল। পেশোয়ার হইতে চিত্রল পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত হইল। চিত্রলে গোলযোগ

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিদিগণ বিদ্রোহী হইয়া খাইবার গিরিসংকট বন্ধ করিয়া দিল। তাহাদের বিরুদ্ধে এক বিপুল অভিযান প্রেরিত হইল, এবং এই দুর্দান্ত জাতি বশ্যতা স্বীকার করিল। আফ্রিদি বিদ্রোহ

দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ। প্লেগ নামে পরিচিত যে ভীষণ মহামারি আজিও ভারতে শত শত লোকক্ষয় করিতেছে, তাহা প্রথম ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে দেখা দেয়, এবং দেখিতে দেখিতে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবাসীর দুঃখের বোঝা বাড়াইবার জন্য ইহার অব্যবহিত পরেই ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে প্রধানত বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর দুঃখ মোচন করিতে গবর্নমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কি করিয়া দুর্ভিক্ষ দূর করা যায়, তাহার বিচার করিবার জন্য একটি দুর্ভিক্ষ কমিশনও বসাইয়াছিলেন।

হীরক জুবিলী। এই সকল দৈব দুর্বিপাক এবং অধিকন্তু একটি ভীষণ ভূমিকম্পের সংঘটন সত্ত্বেও, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ষাট বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হইলে, তদুপলক্ষে সমস্ত ভারতময় হীরক জুবিলীর আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। ভারতের সুযোগ্য বড়লাটগণের মধ্যে কার্জন অন্যতম এবং তাঁহার শাসনকালে ভারতে বহু স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বৈদেশিক নীতি। আফগানিস্থানের আমির হবিবুল্লার (আবদুর রহমানের পুত্র) সহিত লর্ড কার্জন মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। পারস্য উপসাগরেও তিনি অন্য বিদেশীয় জাতির বিরুদ্ধে বৃটিশের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আফগানিস্থানের সহিত সম্বন্ধ

১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে এক অভিযান প্রেরিত হইল ; কারণ তিব্বত গবর্নমেণ্ট এক রুষদূতকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিয়া-

ছিল, এবং বৃটিশরাজের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছিল। এই অভিযান তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া, কিছুকাল উহা দখল করিয়া রহিল। কিন্তু এই তিব্বত অভিযানে বিশেষ কোনও ফল লাভ হইল না। তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য স্বীকৃত হইল এবং বৃটিশগণ সামান্য ক্ষতিপূরণ মাত্র পাইলেন।

তিব্বত অভিযান

উহার ফল

এই সময়ে ভারতীয় সৈন্যগণ বৃটিশের পক্ষ হইয়া চীনে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়ও যুদ্ধ করিয়াছিল।

দেশীয় রাজ্যসমূহ। কার্জন নিজামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কায়েমী মিয়াদে অর্থাৎ চিরকালের জন্য বেরার প্রদেশ বৃটিশের হস্তে ছাড়িয়া দিতে সম্মত করাইলেন। কার্জন অভিজাত সম্প্রদায়কে লইয়া ইম্পিরিয়েল ক্যাডেট্ কোর নামক এক সৈন্যদল গঠন করিলেন। এই সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণ বৃটিশের সমর-বিভাগে কাজ করিবার সুযোগ পাইলেন।

বেরার ইংরাজের হস্তগত

ইম্পিরিয়েল ক্যাডেট্ কোর

আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা। কার্জনের পরিশ্রম করিবার এমন আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, তিনি স্বয়ং সকল বিভাগের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি নূতন এক বাণিজ্য বিভাগের সৃষ্টি করেন, এবং পুলিশ বিভাগের নানারূপ পরিবর্তন সাধন করেন।

শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতি। শিক্ষা-বিভাগ বিশেষ ভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নূতন এক আইন প্রণয়ন করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠন প্রণালীর পরিবর্তন করিলেন। এই নূতন বিধানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা বর্ধিত হইল; এই কারণে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই

১৯০৪ সনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন

নূতন আইন প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। লর্ড কার্জন নিম্নপ্রাথমিক এবং ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধেও নূতন বিধান প্রণয়ন করেন।

বঙ্গবিভাগ। কিন্তু বঙ্গবিভাগই লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে দেশময় দারুণ বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তখন বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এক প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। জনসাধারণের ঘোরতর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এই প্রকাণ্ড প্রদেশকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে দেশময় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। গবর্নমেণ্ট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য কঠোর নীতির প্রয়োগ করিলেন। ফলে, গবর্নমেণ্টের কর্মচারিগণকে হত্যা করিবার জন্য দেশময় গুপ্ত-সমিতির সৃষ্টি হইল। কয়েক বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্রমশ সমস্ত ভারতে এই গুপ্ত-সমিতি ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে জনসাধারণের অপ্রিয় এক শাসন-বিধানের ফলে সমগ্র ভারতে অপ্রীতিকর এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাপারসমূহ ঘটিয়া উঠিতে লাগিল। এই নূতন আন্দোলনের এক প্রধান লক্ষণ ছিল,—বৃটিশের এবং বৃটিশ-সম্পর্কিত সমস্ত জিনিষের প্রতি তীব্র ঘৃণার ভাব। সমস্ত দেশ এই ভাবে প্রণোদিত হওয়ায়, দেশময় বৃটিশ পণ্য বর্জনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়া গেল, এবং এই চেষ্টার ফলে দেশীয় বাণিজ্যের কিছু কিছু শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল।

প্রাচীন কীর্তিচিহ্নের রক্ষা। এদেশের লোক লর্ড কার্জনের প্রতি বিশেষ বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু এদেশের প্রাচীন কীর্তির রক্ষাকল্পে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি

সর্বতোভাবে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। অতি প্রাচীন সভ্যতার ফলে, এদেশে বহু প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এগুলি সর্বসময়ে উপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়াছে বলা যায় না, বরং সময় সময় ইচ্ছাপূর্বক অনেকে উহাদের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। লর্ড কার্জন এই সকল প্রাচীন কীর্তি রক্ষার জন্য এক আইন প্রণয়ন করেন, এবং প্রাচীন কীর্তির উপযুক্ত যত্ন করিবার জন্য ও নূতন নূতন কীর্তিচিহ্ন মৃত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কার করিবার জন্য প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৃষ্টি করেন। এই প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৃষ্টি চিরকাল লর্ড কার্জনের অন্তঃকরণের মহত্ত্বের সাক্ষ্য দিবে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাও লর্ড কার্জনের এই শ্রেণীর আর একটি মহৎ প্রচেষ্টা।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সৃষ্টি

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা

সীমান্ত নীতি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্দান্ত পার্বত্য জাতি সকল লর্ড কার্জনের আমলে বড় উপদ্রব সৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং মসুদ্ জাতির বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরিত হইল। সীমান্ত রক্ষার জন্য কার্জন এক সৈন্যদল গঠন করিলেন, এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে নূতন এক প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন। পঞ্জাব প্রদেশস্থ সিন্ধুনদের পশ্চিম-দিকের জেলাগুলি লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রদেশ গঠিত হইল, এবং ভারত গবর্নমেণ্টের অধীন একজন চীফ্ কমিশনারের হস্তে এই প্রদেশের শাসনভার প্রদত্ত হইল। এইরূপে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্বত্য জাতিগুলির সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপার পঞ্জাব গবর্নমেণ্টের হাত হইতে ভারত গবর্নমেণ্টের হাতে আসিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সৃষ্টি

দুর্ভিক্ষ দমন নীতি। ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। লর্ড কার্জন অশেষ উদ্যমের সহিত

দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং ১৯০১ সনে এক দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করিলেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে তিনি নানাবিধ বিধানের প্রবর্তন করিলেন, এবং কৃষির সুবিধার জন্য পয়ঃপ্রণালী খননের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলেন। পঞ্জাবের কুসীদ ব্যবসায়ী মহাজনগণ যাহাতে গরিব প্রজাগণের সমস্ত জমি কিনিয়া লইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভূমিহস্তান্তর আইন নামে এক আইন পাশ করিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমন। ১৯০১ সনের ২২শে জানুয়ারি তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরলোক গমন করিলেন। এই দারুণ সংবাদে সমস্ত ভারতময় হাহাকার পড়িয়া গেল, এবং সর্বত্র শোক-সভার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। মহারাণীর স্মৃতিরক্ষার জন্য লর্ড কার্জন একটি উপযুক্ত স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের সংকল্প করিলেন, এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায় এই সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য আনন্দ সহকারে অর্থদান করিলেন। এই সংকল্পের ফলেই কলিকাতার ময়দানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল নামক বিরাট সৌধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি লর্ড কার্জন দিল্লীতে এক প্রকাণ্ড দরবারের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং ঐ দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র সপ্তম এডওআর্ড ভারত-সম্রাট্ বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

সপ্তম এডওআর্ড ভারত-সম্রাট্

লর্ড কার্জনের পদত্যাগ। ১৯০৪ সনে লর্ড কার্জনের কার্যকাল শেষ হইলে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকর্তৃক উহা আরও দুই বৎসরের জন্য বর্ধিত হয়। কিন্তু সেই দুই বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই তিনি পদত্যাগ করিলেন। ভারতের সর্বোচ্চ শাসন-

পরিষদে প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে ভারত-সচিবের সহিত মতভেদ তাঁহার পদত্যাগের কারণ।

দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো (১৯০৫-১৯১০)। লর্ড মিণ্টো নামধারী পূর্ববর্তী বড়লাটের (১৮০৭-১৩ খৃঃ) বংশধর ২য় লর্ড মিণ্টো, ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জনের পরে বড়লাট হইয়া আসিলেন। লর্ড কার্জনের নীতির ফলে দেশে যে বিপ্লব-সমিতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বড়লাটের বিষম চিন্তার ও উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল এবং ঐগুলিকে দমন করিবার জন্য তিনি বিবিধ কঠোর বিধানের প্রবর্তন করিলেন। অন্যান্য বিধানের মধ্যে একটি বিধানের ফল হইল এই যে, বঙ্গের কয়েকজন বিখ্যাত জন-নায়ক বিনা বিচারে নির্বাসিত হইলেন।

মিণ্টোর দমননীতি

শাসন-প্রণালীর সংস্কার। এই সময়ে উদারনৈতিক রাজমন্ত্রী লর্ড মর্লী বিলাতে ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অনিচ্ছার সহিত মিণ্টোর দমননীতির সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতশাসন-পদ্ধতির সংস্কারেও তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ফলে ভারতশাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর অধিকার কিয়ৎপরিমাণে বাড়িয়া গেল।

মর্লী-মিণ্টো সংস্কার

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসন-পরিষদ্ বিধিমতে প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির মোট সভ্যের সংখ্যা এবং বে-সরকারী সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। প্রাদেশিক ও বড়লাটের শাসন পরিষদে ভারতবাসী সদস্য নিযুক্ত হইল, এবং ভারত-সচিবের পরিষদেও ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করা হইল।

ভারতীয়-পরিষদ আইন

সম্রাট্ সপ্তম এডওআর্ডের মৃত্যু। ১৯১০ সনে সম্রাট্ সপ্তম এডওআর্ড পরলোকগমন করিলেন। ভারতময় তাঁহার

জন্য শোকের বন্যা বহিয়া গেল। পঞ্চম জর্জ পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট্ হইলেন এবং ১৯১১ সনে ভারতে তাঁহার অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হইল। ১৯০৫ সনে প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ রূপে তিনি একবার ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

পঞ্চম জর্জ ভারতসম্রাট্

দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিং (১৯১০-১৯১৫)। পূর্বতন এক বড়লাট লর্ড হার্ডিং-এর (১৮৪৪-৪৮ খৃঃ) বংশধর দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিং ১৯১০ সনে বড়লাট হইয়া আসিলেন। ভারতে বিপ্লব চেষ্টা পূর্ববৎ চলিতেছিল; অবশেষে বিপ্লববাদিগণ বড়লাটকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করিল। দিল্লীর রাস্তায় বড়লাটের গাড়ীতে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বডলাটের পশ্চাৎস্থিত একটি অনুচর মারা গেল এবং বড়লাট নিজেও আহত হইলেন।

বড়লাটকে হত্যার চেষ্টা

লর্ড হার্ডিং কিন্তু এমন ভয়ংকর ঘটনায়ও বিচলিত হইলেন না, এবং অধিকতর কঠোর নীতির প্রয়োগদ্বারা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আরও সংকটজনক করিয়া তুলিলেন না। বরং সাহস সহকারে তিনি রোগের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, বঙ্গভঙ্গ রহিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সম্রাটের ভারতে আগমন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী মেরী ভারতে আগমন করায় দেশময় রাজভক্তির উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। মহাসমারোহে দিল্লীতে এক দরবারের অনুষ্ঠান হইল এবং সেই দরবারে সম্রাট্ দুইটি বড় বিষয়ের ঘোষণা করিলেন। প্রথম, বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়, কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা। বঙ্গের বিভিন্ন অংশ পুনরায় যুক্ত হইল। আসাম লইয়া একটি এবং বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া আর একটি নূতন

বঙ্গভঙ্গের পরিবর্তন

রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত

প্রদেশ গঠিত হইল। যুক্তবঙ্গ "প্রেসিডেন্সি" আখ্যা পাইল এবং একজন গবর্নরের উপর উহার শাসনভার অর্পিত হইল। মাদ্রাজের গবর্নর লর্ড কারমাইকেল বঙ্গের প্রথম গবর্নর নিযুক্ত হইলেন।

গবর্নরের শাসনাধীনে বঙ্গদেশ

জগদ্ব্যাপী মহাযুদ্ধ। লর্ড হার্ডিং-এর শাসনকালের প্রধান ঘটনা ১৯১৪ সনে জগদ্ব্যাপী মহাযুদ্ধের সংঘটন। এই বৎসরে ৪ঠা অগষ্ট তারিখে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। উভয় পক্ষই বুঝিল যে, এইবার জীবন-মরণের সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় সৈন্যগণ এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশের পক্ষে অনেক যুদ্ধ করিল; বহুস্থানে তাহারা শত্রুর ভীষণ আক্রমণ বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়া শতে শতে প্রাণ বিসর্জন দিল। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট তাহাদের আত্মবিসর্জনের উপযুক্ত সম্মান করিলেন। যখন যুদ্ধ শেষ হইল এবং বৃটিশের জয় হইল, তখন সন্ধিস্থাপন-সভায় এবং "লিগ অব্ নেশন্‌স্" বা আন্তর্জাতিক মহাপরিষদে ভারতবর্ষ প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইল।

মহাযুদ্ধে ভারতীয়গণের কার্য

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড (১৯১৬-১৯২০)। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের শাসনকাল ভারতে শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মহাযুদ্ধে ভারতবাসী অকাতরে ধন ও জন দিয়া বৃটিশের সাহায্য করায়, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ভারতবাসীকে অনেক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে ভারতে আগমন করিলেন। ভারতে কিরূপে ক্রমশ স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা

শাসন-সংস্কার

যায়, সেই বিষয়ে বড়লাটের সহিত একযোগে তিনি এক রিপোর্ট দাখিল করিলেন। ১৯১৯ সনে এই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই "ভারত শাসন বিধি" নামক নূতন এক আইন প্রণীত হইল। এই আইনের নির্ধারিত শাসন-প্রণালীই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই বিধানের মূল কথা কয়টি নিম্নে দেওয়া গেল।

লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্ব্লি

ভারত গবর্নমেণ্ট। বড়লাট ও তাঁহার শাসন-পরিষদ এবং লেজিস্‌লেটিভ্‌ অ্যাসেম্ব্লি ও কাউন্সিল অব্‌ ষ্টেট্‌ নামে পরিচিত দুইটি ব্যবস্থাপক সভা লইয়া ভারত গবর্নমেণ্ট গঠিত হইল। শাসন-পরিষদে তিনজন ভারতীয় সভ্য ছিলেন; উঁহাদের মধ্যে দুইজন বে-সরকারি। দুইটি ব্যবস্থাপক সভাতেই বে-সরকারি সভ্যের সংখ্যা বেশি এবং লেজিস্‌লেটিভ্‌ অ্যাসেম্ব্লির অধিকাংশ সভ্য জনগণকর্তৃক নির্বাচিত হইল।

প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট। প্রত্যেক প্রদেশই একজন গবর্নরের শাসনাধীন করা হইল এবং প্রত্যেক প্রদেশেই একটি ব্যবস্থাপক সভাও প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্যে শতকরা ৭০ জন সভ্য জনগণকর্তৃক নির্বাচিত হইত। গবর্নরের একটি শাসন-পরিষদ্‌ও ছিল। দুই হইতে চারি জন পর্যন্ত সভ্য লইয়া এই পরিষদ্‌ গঠিত হইত। এই পরিষদ, গবর্নর এবং দুই বা তিন জন মন্ত্রী লইয়া প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট গঠিত হইত। শাসন-পরিষদের সভ্যদের অর্ধেক ভারতীয় এবং মন্ত্রিগণ সমস্তই ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে গবর্নর কর্তৃক মনোনীত হইতেন। গবর্নমেণ্টের বিভাগগুলিকে দুই ভাগ করা হইয়াছিল। কতকগুলিকে বলিত

"রক্ষিত" (Reserved), কতগুলির আখ্যা ছিল "হস্তান্তরিত" (Transferred)। পুলিশ, বিচার, পয়ঃপ্রণালী, সাধারণ শাসন-বিভাগ ইত্যাদি রক্ষিত বিভাগগুলি শাসন-পরিষদের সভ্যগণকর্তৃক পরিচালিত হইত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, আবগারী-বিভাগ, পূর্ত-বিভাগ ইত্যাদি "হস্তান্তরিত" বিভাগগুলি মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইত।

রক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগ

অর্থ নৈতিক সংস্কার। এই নূতন ভারত শাসন বিধিদ্বারা গুরুতর অর্থ নৈতিক সংস্কারও সাধিত হইয়াছে। পূর্বে ভারতের সর্বপ্রকার রাজস্ব ভারত গবর্নমেণ্টের তহবিলে যাইয়া জমা হইত, এবং ভারত গবর্নমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে অর্থ বণ্টন করিয়া দিত। এই বিধানে নানারকম অসুবিধা হইত। প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টগুলির আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায়, এ বণ্টন প্রায়ই সন্তোষজনক হইত না ; এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টগুলি আয় বৃদ্ধি বা ব্যয় সংকোচের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিত না।

পুরাতন নিয়ম

নূতন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বাজেট্ ও ভারত গবর্নমেণ্টের বাজেট্ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রস্তুত হইত। রাজস্বের কতক কতক অংশ যথা, ভূমির রাজস্ব, আবগারী-বিভাগের আয়, ষ্ট্যাম্পের আয়, ইত্যাদি প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইন্‌কাম্ ট্যাক্স বা আয়করের আয়, বাণিজ্য-শুল্কের আয় ইত্যাদি ভারত গবর্নমেণ্টের তহবিলে যাইয়া জমা হইত। প্রত্যেক প্রদেশকে আবার ভারত গবর্নমেণ্টের ব্যয় পরিচালনার্থ স্বীয় রাজস্বের একাংশ ভারত গবর্নমেণ্টকে দিতে হইত এবং আয়ের অবশিষ্ট অংশ হইতে নিজের সমস্ত খরচ চালাইতে হইত।

প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের পৃথক্ বাজেট্

আবশ্যক হইলে প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টগুলি নূতন ট্যাক্স ধার্য করিতে পারিত।

ভারত গবর্নমেণ্টের বাজেট

সমর-বিভাগ, ডাক-বিভাগ, রেলওয়ে-বিভাগ ইত্যাদি যে সমুদয় বিভাগের কার্য নিখিল ভারতের সহিত সংসৃষ্ট, তাহার ব্যয় ভারত গবর্নমেণ্টের জন্য রক্ষিত বিশেষ বিশেষ রাজস্ব এবং প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টকর্তৃক ভারত গবর্নমেণ্টকে প্রদত্ত অর্থ হইতে সংকুলান করা হইত। ভারত গবর্নমেণ্টও দরকার হইলে নূতন ট্যাক্স বসাইতে পারিতেন। এইরূপে প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই ব্যয়সংকোচ এবং আয়বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইত।

রায়পুরের লর্ড সিংহ। বিলাতের কর্তৃপক্ষের মনে ভারতশাসন সম্বন্ধে এই সময়ে কিরূপ উদারভাবের প্রেরণা আসিয়াছিল, একজন বাঙালি ভদ্রলোকের জীবন-কথায় তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়। পরলোকগত স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান ব্যারিষ্টার ছিলেন। পরে

বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগ

তিনি ক্রমে ক্রমে অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল, বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য এবং বঙ্গের গবর্নরের শাসন-পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হন। ইহার পরে তিনি বিলাতের ভারত-সচিবের সহকারী পদে নিযুক্ত হন, এবং লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার বাসগ্রামের নাম অনুসারে তাঁহার আখ্যা হয় রায়পুরের ব্যারণ সিংহ। সর্বশেষে তাঁহাকে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গবর্নর করা হয়। এইরূপে লর্ড সিংহের জীবনকাহিনী হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয়গণ এখন সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদ পর্যন্ত পাইবার আশা করিতে পারেন।

রাওল্যাট আইন এবং ভারতীয়গণের অসন্তোষ। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বায়ত্তশাসনের নূতন নূতন অধিকার পাইয়া ভারতবাসিগণের যতদূর সন্তোষলাভ করা উচিত ছিল, তাহারা তাহা লাভ করে নাই। ইহার প্রধান কারণ লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের শাসনকালে রাওল্যাট আইন নামে পরিচিত এক দমন-নীতিমূলক আইনের প্রবর্তন। দেশপূজ্য জননায়ক মহাত্মা গান্ধীর নায়কতায় দেশময় এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগিয়া উঠে। স্থানে স্থানে, বিশেষত পঞ্জাবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়া যায়। গবর্নমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে অমৃতসর নগরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে জনসাধারণের এক সভা আহূত হয়, এবং ইংরাজ সৈন্যগণ গুলিবর্ষণে এই সভা ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহাতে অনেক লোক মারা পড়ে। এই সকল ব্যাপারে দেশবাসী বহু ব্যক্তি গবর্নমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হয় এবং নূতন স্বায়ত্তশাসনের অধিকারগুলি অসার ও অসম্পূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া, তাহারা উহাদের উপর বিরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের মধ্যে যাহারা চরমপন্থী তাহারা অসহযোগী নাম ধারণ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নূতন ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশ করিতে অস্বীকৃত হয়। যাহারা একটু নরমপন্থী, তাহারা স্বরাজ্যদল নাম গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইল উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গবর্নমেণ্টকে প্রতি পদে বাধা প্রদানপূর্বক দেশশাসন বিষয়ে আরও বিস্তৃততর অধিকার প্রদান করিতে বৃটিশ গবর্নমেণ্টকে বাধ্য করা। এই দলের নায়ক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯২৫ সনের ১৬ই জুন তিনি সমস্ত দেশের লোককে কাঁদাইয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার

দমন-নীতি

মহাত্মা গান্ধী

অসহযোগ আন্দোলন

স্বরাজ্যদল

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কলিকাতার রাস্তায় যেরূপ বিরাট জনতা হইয়াছিল, সেরূপ এদেশে কখনও হয় নাই। অন্য কোন দেশেও অনুরূপ ব্যাপার কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

তাঁহার মৃত্যুতে বিরাট শোকযাত্রা

ডিউক্ অব্ কনটের ভারতে আগমন। নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিবার জন্য ডিউক্ অব্ কনট্ এদেশে আগমন করেন। তিনি অতীতের দোষ ক্রটী ভুলিয়া গিয়া সানন্দে নবীন কর্তব্যভার মাথায় তুলিয়া লইতে প্রাণস্পর্শী ভাষায় ভারতবাসি-গণকে আহ্বান করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কারের উদ্দেশ্যে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড এক কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার্ মাইকেল স্যাড্‌লার এবং উহার সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ সদস্য ছিলেন পরলোকগত স্বনামধন্য স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই কমিশন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমস্ত দিক আলোচনা করিয়া বিস্তৃত এক রিপোর্ট গবর্নমেণ্টে দাখিল করে। উহার অনুমোদিত ব্যবস্থাসমূহ ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্দেশ্য করিয়া এই কমিশনের গঠন হইয়াছিল, সেখানে এই কমিশনের ব্যবস্থামত বিশেষ কোন কার্যই আজও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

স্যার্ মাইকেল স্যাড্‌লার

স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় আফগান যুদ্ধ। আমির আবদুর্ রহমানের পুত্র আমির হবিবুল্লা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়াই চলিতেন। ১৯১৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন এবং তাঁহার পুত্র আমানুল্লা আফগানিস্থানের সিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবত রুষদিগের সহিত ষড়যন্ত্র নিবন্ধন

আমির আমানুল্লা

আমির আমানুল্লা ইংরাজদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন, এবং একদল আফগান সৈন্য ১৯১৯ সনের মে মাসে সীমান্ত লংঘন করিয়া বৃটিশ রাজ্যে লুঠতরাজ করে। ফলে আফগানদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সৌভাগ্যক্রমে ইহা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। রাওলপিণ্ডির সন্ধিতে (অগষ্ট, ১৯১৯) উহার অবসান হয়। এই সন্ধিতে এবং ১৯২১ সনের ২২শে নভেম্বর তারিখে নূতন এক সন্ধিপত্রে দুই রাজ্যের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ আরও সুনির্দিষ্ট। হইল। এই সন্ধিদ্বারা বৃটিশ গবর্নমেণ্ট আফগানিস্থানকে অন্তর্নীতি ও বহির্নীতি উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। লণ্ডনে আফগান রাজদূত সসম্মানে অভ্যর্থনা পাইলেন এবং তথায় আফগান রাজপ্রতিনিধির স্থায়ী আসন স্থাপিত হইল। ভারত গবর্নমেণ্ট আফগান গবর্নমেণ্টকে বৎসর বৎসর যে অর্থসাহায্য করিতেন, আফগান সরকার তাহার উপর দাবি ছাড়িয়া দিলেন। বিনিময়ে ভারত সরকার আফগান সরকারের নানারকম সুবিধা করিয়া দিলেন। ঐ সকল সুবিধার মধ্যে একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, আফগান সরকার ভারতের বন্দরের মধ্য দিয়া বিনা শুল্কে জিনিষপত্র আমদানি করিতে পারিবেন, এই রকম ব্যবস্থা হইল।

রাওলপিণ্ডির সন্ধি

লর্ড রেডিং (১৯২১-২৬)। ১৯২১ সনে লর্ড চেম্‌স্‌-ফোর্ডের পর লর্ড রেডিং ভারতে বড়লাট হইয়া আসেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পরে প্রিন্স্‌ অব্‌ ওয়েল্‌স্‌ ভারতে আগমন করেন। মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ডে এবং লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করায় প্রথম প্রথম রেডিংএর শাসন জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু পরে মহাত্মাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং লবণ-শুল্কও কমাইয়া

প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের ভারতে আগমন

উদার ব্যবস্থা প্রণয়ন

দেওয়া হয়। অন্য দিকে লর্ড রেডিংএর শাসনকালে কতকগুলি উদার ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। রাওলাট্ আইন ইত্যাদি দমন-নীতিমূলক কয়েকটি আইন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধিও এমন ভাবে সংশোধিত হইয়াছে যে, আইনের চক্ষে ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে যে প্রভেদ বর্তমান ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত ব্যবস্থাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের আমল হইতে রাজনৈতিক চিন্তা-প্রণালীর বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এ দেশীয় কলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর যে শুল্ক অন্যায়রূপে এতদিন আদায় হইয়া আসিতেছিল, লর্ড রেডিং তাহা রহিত করিয়া ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করেন, এবং এ দেশের বস্ত্রবয়ন শিল্পের উন্নতি সাধন করেন।

লর্ড আরউইন্। (১৯২৬-৩১)। ১৯২৬ সনে এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে লর্ড আরউইন্ ভারতের বড লাট হইয়া আসেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের শাসন সম্বন্ধে যে নূতন বিধানের প্রবর্তন হইয়াছিল, কার্যত তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া তাহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পূর্বক ভারতবাসীকে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে আরও অধিকার দেওয়া যাইতে পারে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য পার্ল্যামেণ্ট মহাসভা এক কমিশন নিযুক্ত করেন। স্যার জন সাইমন এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে এই কমিশন 'সাইমন কমিশন' নামে অভিহিত হয়। কোন ভারতবাসীকে এই কমিশনের সভ্য মনোনীত না করায়, এদেশের অনেকে এই কমিশনের প্রতি বিরূপ হইয়া ইহার সহিত সর্বপ্রকার সংশ্রব বর্জন করেন। ১৯২৮ ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার এই

সাইমন কমিশন

কমিশন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া, ১৯৩০ সনের জুন মাসে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন।

এই রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া ভারত শাসন সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবার জন্য লণ্ডনে "গোলটেবিল বৈঠকের" (Round Table Conference) অধিবেশন হয়। ইহাতে ভারতীয় সভ্যও আমন্ত্রিত হন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পক্ষীয় ভারতবাসিগণ এই বৈঠক বর্জন করিয়া "আইন ভঙ্গ আন্দোলন" (Civil Disobedience Movement) প্রবর্তিত করায়, দেশময় অশান্তি ও নানা উপদ্রবের সৃষ্টি হয়। লর্ড আরউইন্ মহাত্মা গান্ধীর সহিত আপোষ করিয়া, এই গোল-যোগের মীমাংসা করেন।

গোলটেবিল বৈঠক

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব অধিপতি আমির আমানুল্লা ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারত-বাসী মাত্রেই তাঁহাকে সাদরে ও মহাসমারোহ সহকারে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ১৯২৯ সনে আফগানিস্থানের বিদ্রোহের ফলে তিনি সিংহাসনচ্যুত ও নির্বাসিত হন। এই সংবাদে সমুদয় ভারতবাসী তাঁহার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিল। বিদ্রোহের ফলে নাদির খান্ আফগানিস্থানের রাজা হন। কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্ট আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং নাদির খানকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

আফগান বিদ্রোহ

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে এরোপ্লেনের সাহায্যে রীতিমত ডাক চলাচলের ব্যবস্থা আরউইনের শাসনকালের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

নূতন ভারত-শাসন বিধি

লর্ড উইলিংডন। ১৯৩১ সনে লর্ড উইলিংডন ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। ইহার অনতিকাল পরেই গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই বৈঠকে যোগদান করেন। লর্ড উইলিংডনের শাসন-কালেই গোলটেবিল বৈঠকের কার্য শেষ হয় এবং ভারতবর্ষে নূতন শাসন-প্রণালী প্রবর্তনের জন্য নূতন আইন প্রণীত হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এই নূতন আইন বিলাতের পার্ল্যামেণ্ট সভায় পাশ হইয়াছে। ১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে এই নূতন বিধান আংশিক ভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই নূতন বিধির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

লর্ড উইলিংডনের শাসনকালে ভারতবাসিগণের সামরিক শিক্ষার নিমিত্ত দেরাদুন সহরে একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীকে সৈন্য বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইতেছে। যাহাতে ক্রমশ অধিক সংখ্যক ভারতবাসী সৈনিক কর্মচারীর পদ লাভ করিতে পারে ভারত গবর্নমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পুনরায় "আইন ভঙ্গ আন্দোলন" প্রবর্তিত হয়। কিন্তু বড়লাট উইলিংডন দৃঢ়তার সহিত তাহা দমন করেন। ফলে কংগ্রেস এই আন্দোলন রহিত করিয়া লেজিস্‌লেটিভ্ অ্যাসেম্ব্লিতে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে। ১৮৮৫ সালে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ১৯৩৫ সনের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ভারতের সর্বত্র কংগ্রেসের "সুবর্ণ জয়ন্তী" (Golden Jubilee) উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯৩৩ সনের ৮ই নভেম্বর কাবুলের আমির নাদির শাহ আততায়ীর গুলিতে নিহত হইলে তাঁহার পুত্র শাহ মুহম্মদ জাহির খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সহিত কাবুলের মিত্রতা অক্ষুণ্ণ আছে।

১৯৩৫ সনের মে মাসে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের রাজত্বের পচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ভারতে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র মহাসমারোহ সহকারে "রজত জুবিলী" (Silver Jubilee) উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অষ্টম এড্‌ওআর্ড ও ষষ্ঠ জর্জ—জুবিলী উৎসবের পর বৎসর, ১৯৩৬ সনের ২০শে জানুয়ারি, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ পরলোক গমন করেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'অষ্টম এড্‌ওআর্ড' নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত মতের অনৈক্য হওয়ায় ঐ বৎসর ১০ই ডিসেম্বর তিনি স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন। পরদিন তাঁহার ত্যাগপত্র পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা '**ষষ্ঠ জর্জ**' নাম ধারণ করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।

লর্ড লিন্‌লিথগো। ১৯৩৬ সনে লর্ড লিন্‌লিথগো ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়াছেন। তিনি 'কৃষিকমিশনে'র সভাপতি-রূপে পূর্বে একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দরিদ্র প্রজাসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি ইতিমধ্যেই নানারূপ ব্যবস্থা করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।

নবম অধ্যায়

১৯৩৫ সনের নূতন ভারত শাসন বিধি

১। ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ ও দেশীয় করদ ও মিত্র রাজন্যবর্গ-শাসিত বিভিন্ন রাজ্য মিলিয়া এক বিরাট রাষ্ট্রসংঘ (Federation) প্রতিষ্ঠা করাই এই নূতন বিধির প্রধান লক্ষ্য। এই রাষ্ট্রসংঘের নাম হইবে "ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘ" (Federation of India)। তবে এই সংঘে যোগ দেওয়া না দেওয়া দেশীয় রাজগণের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জোর করিয়া কাহাকেও এই রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

মহামহিম ভারতসম্রাটের নামে গভর্নর জেনারেল অনধিক দশজন মন্ত্রীর (Minister) সাহায্যে এই রাষ্ট্রসংঘ শাসন করিবেন। তবে বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, খৃষ্টান ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শ না লইয়াই কাজ করিতে পারিবেন, এবং এবিষয়ে সাহায্য করার জন্য তিনি অনধিক তিনজন সচিব (Counsellor) নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার উপর বিশেষ দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে, এবং এই সকল বিষয়ে আবশ্যক হইলে তিনি নিজের বিবেচনা অনুসারেই কাজ করিতে পারিবেন। রাজ্যের গুরুতর শান্তিভঙ্গের বা উপদ্রবের আশংকা নিবারণ, আর্থিক বিষয়ে আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থা ও বাহিরে সুনাম ও প্রতিপত্তি রক্ষা, সংখ্যা-লঘিষ্ঠ (Minority) সম্প্রদায়ের ন্যায্য

স্বার্থ-সংরক্ষণ প্রভৃতি এই বিশিষ্ট দায়িত্বভারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আইন প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রসংঘের দুইটি ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। ইহাদের নাম কাউন্‌সিল অফ্ স্টেট এবং হাউস্ অফ্ অ্যাসেম্‌ব্লি (অথবা ফেডার‍্যাল অ্যাসেম্‌ব্লি)। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ১৫৬ এবং দেশীয় রাজ্যের অনধিক ১০৪ জন প্রতিনিধি লইয়া কাউন্‌সিল অফ্ স্টেট গঠিত হইবে। ফেডার‍্যাল অ্যাসেম্‌ব্লিতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ২৫০ এবং দেশীয় রাজ্যের অনধিক ১২৫ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। কাউন্‌সিল অফ্ স্টেটের ৬ জন সভ্য গভর্নর জেনারেল মনোনীত করিবেন। উক্ত দুই ব্যবস্থাপক সভার অন্যান্য সভ্যগণ হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইউরোপীয় প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ দেশীয় রাজগণ কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

২। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গভর্নর মন্ত্রি পরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য নির্বাহ করিবেন। গভর্নর জেনারেলের ন্যায় প্রাদেশিক গভর্নরের উপরও কতকগুলি বিষয়ে বিশিষ্ট দায়িত্বভার অর্পিত হইয়াছে, এবং এইগুলি সম্বন্ধে তিনি নিজের বিবেচনা অনুসারেই কাজ করিতে পারিবেন। গুরুতর শান্তিভঙ্গের বা উপদ্রবের আশংকা নিবারণ, সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বার্থ-সংরক্ষণ প্রভৃতি এই বিষয়গুলির অন্তর্গত।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নাম লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লি। মাদ্রাজ, বম্বে, বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং আসাম প্রদেশে একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থাপক সভা হইবে। ইহার নাম লেজিস্লেটিভ কাউন্‌সিল।

লেজিস্লেটিভ্ অ্যাসেম্ব্লির সভ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন, তবে জমিদার, বণিক সম্প্রদায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দ্বারাও কয়েকজন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের অল্প কয়েকজন সভ্য গভর্নর কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং অবশিষ্ট সভ্যগণ বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। কেবল বাঙলা ও বিহার প্রদেশে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের বহুসংখ্যক সভ্য লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্লির সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

সিন্ধু ও উড়িষ্যা দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ ও এডেন ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের বহির্ভূত হইয়াছে।

৩। দেশ শাসন ও আইন প্রণয়ন ব্যাপারে কোন্ কোন্ বিষয় রাষ্ট্রসংঘের এবং কোন্ কোন্ বিষয় প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন তাহার সুনির্দিষ্ট বিভাগ করা হইয়াছে। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়েও এইরূপে নির্দিষ্ট শ্রেণীভাগ করা হইয়াছে। ঐ সমুদয় বিষয়ে দেশীয় রাজ্যের সহিত রাষ্ট্রসংঘের সম্বন্ধও নির্দিষ্ট ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

৪। গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত সাতজন সদস্য লইয়া ফেডারাল রেলওয়ে অথরিটি (Federal Railway Authority) নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্গত যাবতীয় রেলওয়ে সংক্রান্ত কার্য নির্বাহের ভার এই সমিতির উপর অর্পিত হইবে।

৫। রাষ্ট্রসংঘ, প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট, ও দেশীয় রাজ্য, এই তিন পক্ষের, অথবা ইহাদের যে কোন দুই পক্ষের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা নিষ্পত্তির জন্য একটি উচ্চ আদালত

স্থাপিত হইবে। ইহার নাম হইবে ফেডারাল কোর্ট (Federal Court)। ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্য অনধিক ছয়জন বিচারপতি থাকিবেন। কোন কোন বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ও দেশীয় রাজ্যের হাইকোর্ট যে বিচার করিবে উক্ত ফেডারাল কোর্টে তাহার আপিল হইতে পারিবে। আবার ফেডারাল কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিলে আপিল করা চলিবে।

৬। রাষ্ট্রসংঘের জন্য একটি এবং প্রতি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের জন্য একটি পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশন গঠিত হইবে। শাসন সংক্রান্ত উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদনকারিগণের মধ্যে যে সমুদয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লওয়া হয় এই কমিশন সেই সমুদয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবে। সাধারণভাবে কর্মচারী নিয়োগের নিয়ম, কি প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন পদে লোক নিযুক্ত করা হইবে এবং তাহাদের উন্নতি ও বদলি করা হইবে, এবং এই নিয়োগ, উন্নতি ও বদলির জন্য প্রার্থিগণের উপযুক্ততা সম্বন্ধে গবর্নমেণ্ট এই কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

৭। বিলাতে ভারতবর্ষের জন্য সেক্রেটারি অফ্ স্টেটের যে পদ আছে তাহা থাকিবে, কিন্তু ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে যে সমিতি আছে তাহা উঠিয়া যাইবে। ইহার পরিবর্তে সেক্রেটারি অফ্ স্টেট্ অন্যূন তিন ও অনধিক ছয়জন সচিব (Counsellor) নিযুক্ত করিবেন। সেক্রেটারি অফ্ স্টেট্ ও তাঁহার সচিবদের বেতন এবং তাঁহার ডিপার্টমেণ্টের অন্যান্য ব্যয়ভার সমস্তই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বহন করিবেন।

যে সমুদয় বিষয়ে গবর্নর জেনারেল মন্ত্রিগণের পরামর্শ না লইয়া কেবল নিজের মত বা বিবেচনা অনুসারে কাজ করেন সাধারণত কেবল সেই সমুদয় বিষয়েই গবর্নর জেনারেল প্রত্যক্ষ-ভাবে সেক্রেটারি অফ্ স্টেটের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু পরোক্ষভাবে গবর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গবর্নরগণের উপর সেক্রেটারি অফ্ স্টেটের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কারণ গবর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গবর্নরকে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে (Instrument of Instructions) কাজ করিতে হয়। এই নির্দিষ্ট নিয়মগুলি সেক্রেটারি অফ্ স্টেট প্রণয়ন করেন এবং বিলাতের পার্ল্যামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ভারতসম্রাটের আদেশরূপে গবর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গবর্নরের নিকট প্রেরিত হয়।

৮। এই নূতন ভারত শাসন বিধিতে প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট সম্বন্ধে যে নূতন নিয়মাবলী প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা ১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু যতদিন মোট দেশীয় রাজ্যের লোক সংখ্যার অর্ধেক লোক আছে এই পরিমাণ দেশীয় রাজ্য রাষ্ট্রসংঘে যোগ দিতে স্বীকার না করে ততদিন পর্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘ প্রবর্তিত হইবে না। তবে ফেডার‍্যাল কোর্ট, পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশন প্রভৃতি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়

উপসংহার

১। বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষ

ইংরাজী ভাষার প্রচলনে পাশ্চাত্য ভাবের প্রসার। দেড়শত বৎসর ইংরাজের শাসনে দেশে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার প্রচলন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবের প্রসারই ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ইহার ফল। এই পাশ্চাত্য ভাবের প্রবর্তনে ভারতবর্ষে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদিন ভারতবাসীরা বহির্জগতের বিশেষ কোন সংবাদই রাখিত না। এখন ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বিশ্বজগতের চিন্তার ধারা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবাসিগণ উন্নতিশীল জগতের নূতন নূতন ভাবসমূহের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিতেছে। মধ্যযুগে ভারতবাসীর ধারণা ছিল যে, তাহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং এই নিমিত্ত তাহারা অন্য জাতির সহিত মিশিতে ঘৃণা বোধ করিত। এই সংকীর্ণ অনুদার ভাবই যে ভারতবাসীর সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল, সুপণ্ডিত মুসলমান লেখক আল্‌বেরুণী তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দ্রুতগতিতে সে সমুদয় ভাবের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। হিন্দুরাজত্বের শ্রেষ্ঠযুগে যে উদারভাব হিন্দু সমাজে বিরাজ করিত, আবার তাহার

উদার ভাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

পুনরাবির্ভাবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূরীভূত হইয়াছে, অবশিষ্টগুলিও যে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে তাহারও চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বিশেষত জাতিভেদরূপ যে দুর্লংঘ্য প্রাচীর ভারতবাসীকে খাঁই খাঁই করিয়া তাহার একতা সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটাইতেছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা স্থাপন

ভারতে জাতীয়তার উৎপত্তি। ভারতে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ভাষা পরস্পরের নিকট দুর্বোধ্য হওয়ায় তাহারা যে একদেশের ও একজাতির অন্তর্গত, এই ধারণা তাহাদের মধ্যে পূর্বে জাগিয়া উঠে নাই। ইংরাজী ভাষার প্রচলনে পরস্পরের ভাব-বিনিময় সম্ভবপর হওয়ায়, এই একজাতীয়ত্ববোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একই প্রতাপশালী রাজার অধীনে বাস করাও এই একত্ববোধের সহায়তা করিয়াছে। জাতীয়তার ও দেশাত্মবোধের ভাব পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, পৃথিবীর আর কোথাও তদ্রূপ দেখা যায় না। ইংরাজী ভাষার প্রচলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবগুলিও ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ইহার ফলে ভারতে এক নবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান যুগের ভারত-ইতিহাসের ইহাই সবচেয়ে বড় কথা।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চা

ভারতবাসীর মানসিক উন্নতি। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও মনীষিগণের প্রভাবে ভারতীয় সাহিত্যও এক নূতন শক্তি অর্জন করিয়াছে। প্রাচীন যুগে পদার্থবিজ্ঞানের চর্চায় ভারতবাসী তেমন উন্নতি করিতে পারে নাই; এখন পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞানের চর্চা দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে এবং বড় বড় পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ এবং রাসায়নিকের আবির্ভাব সম্ভবপর

হইয়াছে। দেশের অতীত ইতিহাসের জ্ঞানের উপরই দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুপ্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর। পাশ্চাত্য জ্ঞান সেই অতীতের প্রতিও ভারতবাসীর আন্তরিক নিষ্ঠা ও প্রকৃত আগ্রহ জাগাইতে সমর্থ হইয়াছে। সর্ববিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার এখন জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, চিত্রশালা এবং এশিয়াটিক সোসাইটি, সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠায় দেশে দিন দিনই উচ্চবিদ্যার প্রচার ও প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতীয় ছাত্রগণ ক্রমশ অধিকতর সংখ্যায় ইউরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি মহাদেশে যাইয়া বিদ্যা অর্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে দেশে লোকশিক্ষা প্রসারিত হইতেছে, এবং স্বরাজের বিবিধ অধিকার লাভ করায় স্বায়ত্তশাসনে ভারতবাসিগণের অভিজ্ঞতা বাড়িয়া যাইতেছে।

অতীতের প্রতি শ্রদ্ধার জাগরণ

বিদেশ গমন

মুদ্রাযন্ত্র

বৈষয়িক উন্নতি। ইংরাজ আমলে ভারতবাসীর বৈষয়িক উন্নতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তনে যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং অল্প মাশুলে পত্র প্রেরণ করিতে পারায়ও এ বিষয়ে কম সুবিধা হয় নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয়, বিশেষত মারীভয় নিবারক, পাশ্চাত্য উত্তম উত্তম বিধানসমূহ দেশে প্রবর্তিত হইয়া দেশের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে।

যাতায়াতের সহজ বন্দোবস্ত

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা

শান্তি ও সমৃদ্ধি। দেশে শান্তিস্থাপন হইলে এবং দেশবাসীর ধন-প্রাণ নিরাপদ থাকিলেই দেশে জ্ঞানোন্নতি, ধন-বৃদ্ধি স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সম্ভবপর হয়। বহুযুগের অরাজকতা ও

অশান্তির পরে ইংরাজ-আমলে দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ফলে সর্ববিষয়ে উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রবল রণতরী ও সৈন্যদলের সহায়তা

বৈদেশিক আক্রমণের নিবৃত্তি। বৈদেশিক আক্রমণ-স্রোত সম্পূর্ণ প্রতিরুদ্ধ করিয়া, ইংরাজ ভারতের মহোপকার সাধিত করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিমের গিরিসংকট কয়টি পরাক্রান্ত সৈন্যগণকর্তৃক আধুনিক সমর-বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াগুলির সাহায্যে সর্বদা সুরক্ষিত হইতেছে। ভারতসমুদ্রে বৃটিশের অজেয় রণতরী সর্বদা বিচরণ করিতেছে। যুগ যুগ ধরিয়া ভারত বৈদেশিক আক্রমণে ক্লিষ্ট হইতেছিল। যতদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন আর ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের ভয় নাই। এই উজ্জ্বল চিত্রের একমাত্র কলংক এই যে, এই ভারত-রক্ষা ব্যাপারে ভারতবাসীর দায়িত্ব ও কর্মভার অতি অল্পই। ভবিষ্যতে এই ত্রুটি সংশোধন করিবেন বলিয়া গবর্নমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এবং সৈন্য-বিভাগের উচ্চতর পদসমূহে ধীরে ধীরে ভারতবাসিগণকে গ্রহণ করিতেছেন।

সমর বিভাগে ভারতবাসীর নিয়োগ

দারিদ্র্য-সমস্যা। দুঃখের বিষয় এই সর্বাঙ্গীন মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতির আনন্দজনক বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি নিরানন্দের কথাও বলিতে হয়। ভারতবাসিগণের ভয়ংকর দারিদ্র্যই এই নিরানন্দের কথা এবং এই দারিদ্র্যই ভারতের প্রধান সমস্যা। বৃটিশ আমলের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারত ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে এই অবস্থার এমনই পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, ভারতের প্রজা আজ পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম। দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় ভারতে পূর্বে কমই দেখা দিত, কিন্তু এখন যেন উহা দেশের নিত্যসহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের ঘোর দারিদ্র্য

ইহার কারণ ও প্রতীকার। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বেশি দূরে যাইতে হয় না। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং কৃষিই ভারতবাসীর একমাত্র উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই ইউরোপের বাণিজ্যপরায়ণ জাতি-সমূহ ভারতের ধন শুষিয়া লইতেছে। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি না হইলে, কেবল মাত্র দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিয়া বা স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করিয়া, ভারতবাসীর দুর্দশা দূর করা যাইবে না।

২। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা

বহুজাতির মিলনক্ষেত্র ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে ইংরাজের আবির্ভাব ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত যোগসূত্রে সংবদ্ধ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতাসম্পন্ন জাতিসমূহ ভারতে আগমন করিয়া বসবাস করিয়াছে। আর্যগণের আগমনের পূর্বে যে সকল জাতি এদেশে আগমন করিয়াছিল, এই পুস্তকের প্রারম্ভে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে যবন, পারদ, শক, কুষাণ, হুন, গুর্জর, আরব, পারসিক, তুরস্ক, আফগান এবং মুঘলগণ এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। ইউরোপীয়গণ আসিয়াছে সকলের শেষে। তাহাদের মধ্যে বৃটিশ জাতিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য; কিন্তু এই দেশে ফরাসি, ওলন্দাজ এবং পর্তুগীজও কিছু কিছু আছে। ভারতবর্ষ এই সমস্ত জাতিরই সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহাদের কোন

বিভিন্ন জাতির মাতৃভূমি ভারতবর্ষ

জাতিই বলিতে পারে না, যে, ভারতবর্ষ একা তাহাদেরই দেশ। এই কথাটির ব্যাপক অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

বৃটিশ সাম্রাজ্য। কিন্তু কেবলমাত্র বৃটিশের আগমন নহে, এদেশে তাহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাও ভারতের ইতিহাসের বিবর্তন নীতির ফল মাত্র। সুদূর প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পরস্পর বিরোধী দুইটি ভাবের ক্রমান্বয় আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। একবার দেখিতে পাই, ভারতের সমগ্র অথবা অধিকাংশ ভাগ লইয়া এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার পরেই আবার দেখি, এই সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও তাহার ফলে স্বাধীন খণ্ডরাজ্যসমূহের উদ্ভব।

প্রাচীন সাম্রাজ্যসমূহ

এই খণ্ডরাজ্যগুলি পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার ফলে ইহারই মধ্যে একটি অন্যগুলিকে পরাভূত করিয়া পুনরায় এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তারপর আবার সাম্রাজ্যের পতন ও পূর্বোক্ত শ্রেণীর খণ্ডরাজ্যের অভ্যুদয়—এইরূপে একটির পর আর একটির উদ্ভব ও বিলয় হইতে থাকে। মহাভারতের যুগে ভারত এইরূপ খণ্ডরাজ্যসমূহে বিভক্ত ছিল, কিন্তু কৃষ্ণের মন্ত্রণা ও অর্জুনের বাহুবলে এই বিচ্ছিন্ন ভারতে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর এই সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে ভারত আবার খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক যুগেও এই রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায় না। নন্দ ও মৌর্য আমলে মগধ সাম্রাজ্যের ও তৎপরবর্তী কুষাণ, গুপ্ত, হর্ষবর্ধন, পাল, প্রতীহার এবং তথাকথিত পাঠান ও মুঘলসাম্রাজ্যের ইতিহাস স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত নীতি যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত

হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পতনের পরে ভারত খণ্ডরাজ্যসমূহে বিভক্ত ছিল। এই সমুদয় খণ্ডরাজ্যের ভিত্তির উপর ঐ সকল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, আবার ঐ সকল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলেই এই সমুদয় খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব। দাক্ষিণাত্যেও যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই অন্ধ্র, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল, বিজয়নগর, বাহ্‌মনী ও মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই সমুদয় সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন একই শৃংখলে বাঁধা। যতদূর জানিতে পারা যায়, এই শৃংখলের প্রথম গ্রন্থি কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডবসাম্রাজ্য এবং শেষ গ্রন্থি ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত ভারতসাম্রাজ্য। সুতরাং ইহা বলিতে হইবে, যে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতেতিহাসের বিবর্তন-নীতিরই ফল। কিন্তু ইহা আশা করা অন্যায় নহে, যে, ভারতে আজ যে একত্ব ও জাতীয়তার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে ভারতবর্ষ আর কখনও, অন্তত অদূর ভবিষ্যতে, খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে না। এই আশার প্রধান ভিত্তি এই, যে, স্থান ও কাল যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ টেলিগ্রাফ, এরোপ্লেন ও রেলওয়ের কৃপায় তাহা এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধাই এইরূপে চিরকালের জন্য দূরীভূত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে মগধ প্রভৃতি খণ্ডরাজ্যের দুই সীমান্ত পরস্পর হইতে যত দূরে ছিল, আজ যাতায়াত ও সংবাদ প্রেরণের দিক্‌ দিয়া দেখিলে হিমালয় ও কুমারিকা অন্তরীপের মধ্যে ব্যবধান তাহা অপেক্ষা বেশি নহে। অতএব ঐ সকল খণ্ডরাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজনৈতিক বন্ধন যত দৃঢ় ছিল, ভারত-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যেও

বৃটিশ সাম্রাজ্য

ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা

রাজনৈতিক বন্ধন তাহার মতই বা তাহা অপেক্ষাও দৃঢ় হইবে বলিয়া আশা করিতে পারা যায়। বৃটিশ শাসনের মঙ্গলময় প্রভাবে আমাদের জাতীয় আশা-আকাংক্ষা অবিলম্বে পূর্ণ হইয়া উঠুক, ভারতবাসীমাত্রেরই এই প্রার্থনা।

পরিশিষ্ট

ক

হিন্দু-যুগের বিখ্যাত রাজাগণের নাম এবং তাঁহাদের সিংহাসনারোহণের সময়

(আঃ = আনুমানিক)

আঃ	খৃষ্টপূর্ব	৫৩০	বিম্বিসার প্রসেনজিৎ
আঃ	”	৫০০	অজাতশত্রু
আঃ	”	৩৫০	মহাপদ্ম নন্দ
আঃ	”	৩২১	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
আঃ	”	২৯৮	বিন্দুসার
আঃ	”	২৭৩	অশোক
আঃ	”	১৮৪	পুষ্যমিত্র সুঙ্গ
আঃ	”	৭২	বাসুদেব কান্ব
আঃ	খৃষ্টাব্দ	৭৮	কনিষ্ক (কুষাণ)
আঃ	”	১০৬	গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী
	”	৩২০	চন্দ্রগুপ্ত (গুপ্তসম্রাট্)
আঃ	”	৩৪০	সমুদ্রগুপ্ত
আঃ	”	৩৭৫	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য)
	”	৪১৩	কুমারগুপ্ত
	”	৪৫৫	স্কন্দগুপ্ত
আঃ	”	৫০০	তোরমান
আঃ	”	৫২০	যশোধর্মন্
আঃ	”	৬০০	শশাঙ্ক

	খৃষ্টাব্দ	৬০৬	হর্ষবর্ধন
	”	৬০৮	দ্বিতীয় পুলকেশী
আঃ	”	৭০০	যশোবর্মন্
	”	৭২৪	ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়
আঃ	”	৭৭৫	ধ্রুব (রাষ্ট্রকূট)
আঃ	”	৭৮০	ধর্মপাল
আঃ	”	৭৯৩	তৃতীয় গোবিন্দ
আঃ	”	৮১৫	দেবপাল
আঃ	”	৮৩৬	ভোজ (গুর্জর-প্রতীহার)
আঃ	”	৮৯০	মহেন্দ্রপাল (ঐ)
আঃ	”	৯৫০	ধঙ্গ (চন্দেল্ল)
	”	৯৮৫	রাজরাজ (চোল)
	”	৯৯৭	সুলতান মামুদ
	”	১০১২	রাজেন্দ্র চোল
আঃ	”	১০১৮	ভোজ (পরমার)
	”	১০৪১	কর্ণ (কলচুরি)
	”	১০৭৬	অনন্তবর্মন্ চোড়গঙ্গ
	”	১০৭৬	দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (চালুক্য)
আঃ	”	১১০০	বিজয়সেন
আঃ	”	১১৫৯	বল্লালসেন
	”	১১৭০	জয়চ্চন্দ্র (গাহড়বাল)
আঃ	”	১১৭৫	পৃথ্বীরাজ
আঃ	”	১১৭৮	লক্ষ্মণসেন
	”	১২১০	সিংঘন

খ

মুসলমান রাজবংশসমূহ (সিংহাসনারোহণের তারিখ সহ)

১। দাস রাজবংশ

(১) কুতবুদ্দিন (১২০৬)

(২) আরাম (১২১০)   (৩) ইলতুৎমিস্ (১২১১) = কন্যা

(৪) রুকনুদ্দিন (১২৩৬)   (৫) রাজিয়া (১২৩৬)   (৬) বাহ্রাম (১২৪০)   (৮) নসিরুদ্দিন = কন্যা (১২৪৬)

(৭) মাসুদ (১২৪২)

(৯) ঘিয়াসুদ্দিন বল্বন্ (১২৬৬)

বঘ্রা খাঁ

(১০) কায়কোবাদ (১২৮৬)

২। খিলজী বংশ

(১) জালালুদ্দিন খিলজী (১২৯০)
(২) আলাউদ্দিন খিলজী (জালালের ভ্রাতুষ্পুত্র) (১২৯৬)
(৩) আলাউদ্দিনের শিশুপুত্র (৩৫ দিন)
(৪) কুতবুদ্দিন মবারক শাহ্ (আলাউদ্দিনের পুত্র (১৩১৬)
(৫) খসরু (অনধিকারী) (১৩২০)

৩। তুঘলক বংশ

(১) ঘিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০)
(২) মুহম্মদ তুঘ্লক (ঘিয়াসের পুত্র) (১৩২৫)
(৩) ফিরোজ শাহ তুঘলক (মুহম্মদের জ্ঞাতি ভ্রাতা) (১৩৫১)
(ইহার পর কয়েকজন নামমাত্র রাজা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন)

৪। লোদী বংশ

(১) বাহলুল লোদী (১৪৫০)
(২) সিকন্দর লোদী (বাহলুলের পুত্র) (১৪৮৯)
(৩) ইব্রাহিম লোদী (সিকন্দরের পুত্র) (১৫১৭)

৫। মুঘল বংশ

- (১) বাবর (১৫২৬)
  - (২) হুমায়ুন (১৫৩০)
    - (৩) আকবর (১৫৫৬)
      - (৪) জাহাঙ্গীর (সেলিম) (১৬০৫)
        - খসরু
        - পারভিজ
        - (৫) শাহ্ জাহান (১৬২৮)
          - দারা
          - সুজা
          - (৬) ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮)
            - মুহম্মদ
            - (৭) বাহাদুর শাহ্ (১ম) বা প্রথম শাহ্ আলম (১৭০৭)
              - (৮) জাহন্দর শাহ্ (১৭১২)
                - (১৫) দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪)
                  - (১৬) দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯)
                    - (১৭) দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬)
                      - (১৮) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (১৮৩৭-১৮৫৮) (সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিংহাসন চ্যুত)
              - আজিম উস্-সান্
                - (৯) ফরুখ্ সিয়র (১৭১৩)
              - রফি-উস্-সান্
                - (১৩ক) মুহম্মদ ইব্রাহিম (১৭২০)
                - (১২) রফিউদ্দৌলা বা দ্বিতীয় শাহজাহান ১৭১৯
                - (১০) রফিউদ্ দারাজৎ (১৭১৯)
              - জাহান শাহ্
                - (১৩) মুহম্মদ শাহ্ (১৭১৯)
                  - (১৪) আহম্মদ্ শাহ্ (১৭৪৮)
            - আজাম
            - আকবর
              - (১১) নেকুসিয়র (১৭১৯)
            - কামবক্স
          - মুরাদ
        - শারীরয়
      - মুরাদ
      - দানিয়েল
    - মির্জ্জাহাকিম
  - কামরান্
  - হিন্দাল
  - আস্কারি

গ

পেশোয়া বংশ

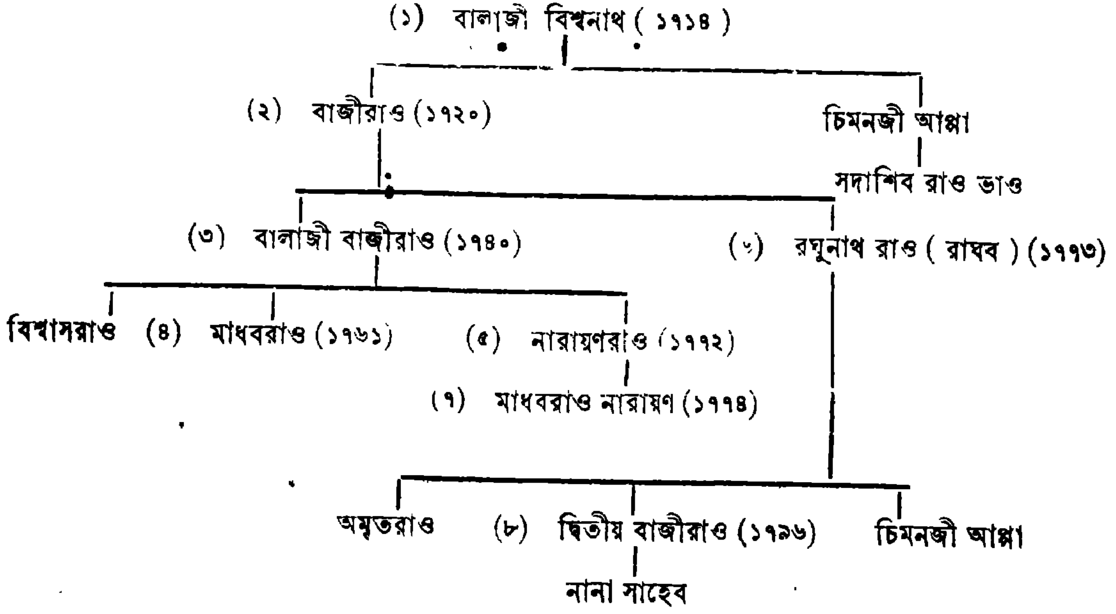
(১) বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৪)
(২) বাজীরাও (১৭২০)
চিমনজী আপ্পা
সদাশিব রাও ভাও
(৩) বালাজী বাজীরাও (১৭৪০)
(৬) রঘুনাথ রাও (রাঘব) (১৭৭৩)
বিশ্বাসরাও
(৪) মাধবরাও (১৭৬১)
(৫) নারায়ণরাও (১৭৭২)
(৭) মাধবরাও নারায়ণ (১৭৭৪)
অমৃতরাও
(৮) দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৬)
চিমনজী আপ্পা
নানা সাহেব

গবর্নর জেনারেল ও ভাইস্‌রয়্‌গণ

(তারিখ সহ)

(ছোট অক্ষরের নামগুলি অস্থায়ী বুঝিতে হইবে)

১। বাঙলার গবর্নর জেনারেলগণ (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে নিযুক্ত)

খৃষ্টাব্দ

১৭৭৪ ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌

১৭৮৫ সার্‌ জন ম্যাক্‌ফার্‌সন

১৭৮৬ আর্ল (মার্কুইস্‌) কর্ন্‌ওআলিস্‌

১৭৯৩ সার্‌ জন্‌ শোর (লর্ড টেইন্‌মাউথ)

১৭৯৮ সার্‌ এলিউর্ড ক্লার্ক

১৭৯৮ মার্কুইস্‌ ওয়েলেস্‌লী

১৮০৫ মার্কুইস্‌ কর্ন্‌ওআলিস্‌ (২য় বার)

১৮০৫ সার্‌ জর্জ বার্লো

১৮০৭ আর্ল অব্‌ মিণ্টো (প্রথম)

১৮১৩ মার্কুইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংস্‌

১৮২৩ জন্‌ অ্যাডাম

১৮২৩ ব্যারণ্‌(আর্ল) আমহার্ষ্ট

১৮২৮ উইলিয়ম বাটারওআর্থ বেইলি

১৮২৮ লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্‌ডিস্‌-বেণ্টিঙ্ক

২। ভারতের গবর্নর জেনারেলগণ (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে নিযুক্ত)

১৮৩৩ লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্‌ডিস্‌-বেণ্টিঙ্ক

১৮৩৫ সার চার্লস (লর্ড) মেট্‌কাফ্‌

খৃষ্টাব্দ

১৮৩৬ ব্যারণ (আর্ল অব্) অক্‌ল্যাণ্ড

১৮৪২ ব্যারণ (আর্ল অব্) এলেন্‌বরা

১৮৪৪ সার্ হেন্‌রি (ভায়কাউণ্ট) হার্ডিং

১৮৪৮ আর্ল (মার্কুইস্ অব্) ডালহৌসী

১৮৫৬ ভায়কাউণ্ট (আর্ল) ক্যানিং

৩। গবর্নর জেনারেল ও ভাইস্‌রয়্‌গণ (মহারাণীর ঘোষণা-পত্র অনুসারে নিযুক্ত)

১৮৫৮ আর্ল ক্যানিং

১৮৬২ আর্ল অব্ এল্‌গিন্ (প্রথম)

১৮৬৩ সার্ রবার্ট নেপিয়ার

১৮৬৩ সার উইলিয়ম ডেনিসন্

১৮৬৪ সার্ জন্ (লর্ড) লরেন্স

১৮৬৯ আর্ল অব্ মেয়ো

১৮৭২ সার্ জন্ ষ্ট্র্যাচী

১৮৭২ লর্ড নেপিয়র অব মার্চিস্টুউন্

১৮৭২ ব্যারণ (আর্ল অব্) নর্থব্রুক্

১৮৭৬ ব্যারণ (আর্ল অব্) লিটন

১৮৮০ মার্কুইস্ অব্ রিপণ

১৮৮৪ আর্ল অব্ ডাফরিণ (মার্কুইস্ অব্ ডাফরিণ অ্যাণ্ড আভা)

১৮৮৮ মার্কুইস্ অব্ ল্যান্সডাউন্

১৮৯৪ আর্ল অব্ এল্‌গিন্ (দ্বিতীয়)

১৮৯৯ ব্যারণ (আর্ল) কার্জন অব্ কেডেলষ্টন্

১৯০৪ লর্ড অ্যাম্প্‌থিল

১৯০৪ ব্যারণ (আর্ল) কার্জন অব্ কেডেলষ্টন্ (পুনর্নিযুক্ত)

খৃষ্টাব্দ	
১৯০৫	আর্ল অব্ মিণ্টো (দ্বিতীয়)
১৯১০	ব্যারণ হার্ডিং অব্ পেন্‌সার্ষ্ট
১৯১৬	ব্যারণ চেম্‌স্‌ফোর্ড
১৯২১	লর্ড রেডিং
১৯২৬	লর্ড আরউইন্
১৯২৯	লর্ড গোসেন (লর্ড আরউইনের বিদায়কালে অস্থায়ী)
১৯২৯	লর্ড আরউইন্
১৯৩১	লর্ড উইলিংডন্
১৯৩৪	সার জর্জ্জ ষ্টানলী (লর্ড উইলিংডনের বিদায়কালে অস্থায়ী)
১৯৩৪	লর্ড উইলিংডন
১৯৩৬	লর্ড লিন্‌লিথগো